প্রথম পরিচ্ছেদ।

রোগীর পার্শ্বে।

"যোগেন!

"যোগী!

"যোগা!"

"যাই, দাদা।"

"আয়। চা যে ঠাণ্ডা হইয়া গেল!"

কলিকাতায় একটি অনতিবৃহৎ অট্টালিকা। মধ্যে প্রাঙ্গণ;—প্রাঙ্গণমধ্যে একটি ক্ষুদ্র ফোয়ারা; ফোয়ারার নিম্নভাগে জলাধারে কতকগুলি পুষ্ট লোহিত ও শ্বেত মৎস্য হরিতাভ জলে ডুবিতেছে, ভাসিতেছে, বুদ্বুদ ছাড়িতেছে। সেটিকে বেষ্টিত করিয়া ক্ষুদ্রাকৃতি তালজাতীয় বৃক্ষ। তাহার পর বৃত্তাকার পথ, লোহিত সুরকি ঢালা;—পথের দুই পার্শ্বে ত্রিভুজাকৃতি ইষ্টকের সীমা। সেই বৃত্ত হইতে চারিদিকে চারিটি সরল পথ চারি প্রান্তে প্রস্তরের টালি-বাঁধান রোয়াকের কূলে আসিয়া লাগিয়াছে। চারি কোণে চারিটি থাম; পশ্চিম দিকের দুইটি আইভি-লতায় আবৃত, পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণেরটির গাত্রে মার্শালনীল গোলাপের লতা—স্নানাগারের সাবানজলে তাহার অঙ্গে কুসুমশ্রী বিকশিত, পূর্ব্বোত্তর কোণের

টির গাত্রে ফেনাঙ্গা কেবল উঠিতেছে। তিন দিকের গৃহ দ্বিতল, কেবল দক্ষিণদিকে ত্রিতল। গৃহের পূর্ব্বের অংশে দ্বিতল বৈঠকখানা কক্ষে একজন প্রৌঢ় পুরুষ পেয়ালায় চা ঢালিতে ঢালিতে কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে ডাকিতে ছিলেন। কক্ষ চার মৃদু-গন্ধপূর্ণ। পুরুষের বয়স চল্লিশ বৎসর; বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম; মুখে প্রফুল্ল ভাব; গুম্ফ কিছু বৃহৎ; মুখে তিন চারি দিনের গজান শ্মশ্রু বর্ত্তমান। তিনি ভ্রাতাকে ডাকিতেছিলেন; স্বর স্নেহার্দ্র।

একজন যুবক পশ্চিম দিকে শয়ন-কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া উত্তর দিকের বারান্দা দিয়া আসিলেন। তাঁহার বয়স ত্রিশ বৎসর হইবে; বর্ণ প্রায় গৌর। নিশায় নিদ্রার পরও মস্তকে সুবিন্যস্ত কেশ সম্পূর্ণ স্থানচ্যুত হয় নাই, সেটি দীর্ঘ-কালের অভ্যাসের ফল। শ্মশ্রু কর্ত্তিত,—গণ্ডে অতি হ্রস্ব, তন্নিম্নে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ। মস্তকের কেশ সম্মুখে ও পশ্চাতে দশআনা-ছয়আনা করিয়া ছাঁটা। বেশ অতি শুভ্র; সৌখিন। পদে কার্পেটের চটি—স্ত্রীর বুনা। মুখে বর্ম্মা চুরুট ছিল। বৈঠকখানায় প্রবেশ-দ্বারে তিনি সেটিকে মেজেয় নিক্ষেপ করিলেন। কপোতকর্ব্বুর ভস্মরাশি ছড়াইয়া পড়িল; ভস্মমুক্ত বহ্নি দীপ্ত হইয়া উঠিল।

কনিষ্ঠকে দেখিয়া সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আজ যে এখনও স্নান হয় নাই?"

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কাল রাত্রে নিমন্ত্রণ খাইয়া ফিরিতে বিলম্ব হইয়াছিল। এই উঠিতেছি।"

সুরেন্দ্রনাথ বারান্দায় যাইয়া ডাকিলেন, "ক-ই, বাবারা ক-ই ?"

দুইটি মধুর বালক-কণ্ঠে উত্তর আসিল, "যাই, জ্যাঠা-মহাশয়।"

পরক্ষণেই দুইটি কৃতপ্রাতঃস্নান গৌরকান্তি বালক দ্রুতপদে কক্ষে প্রবেশ করিল। জ্যেষ্ঠের বয়স সাত, কনিষ্ঠের পাঁচ। তাহাদের চঞ্চল চক্ষে প্রতিভাদীপ্তি, কুঞ্চিত কেশ মধ্য হইতে বিভক্ত। জ্যেষ্ঠতাত উভয়কে বক্ষে তুলিয়া লইলেন ও উভয়ের মুখচুম্বন করিলেন। তিনি কনিষ্ঠ বালককে বলিলেন, "বাবা, তুমি গরম জামা পর নাই কেন? এখন সকালে সন্ধ্যায় ঠাণ্ডা লাগে।"

বালক আবদারের স্বরে বলিল, "বড় ঘাম হয়। জ্যেঠা ম'শায় আমি গরম জামা পরিব না।"

"তাহা হইলে আমি রাগ করিব। যাও, বাবা, জামা পরিয়া আইস।"

বালক আর দ্বিরুক্তি করিল না; জামা পরিতে গেল। অপত্যহীন জ্যেষ্ঠতাত যে কোন কারণে তাহাদের উপর ক্রুদ্ধ হইতে পারেন, এ সম্ভাবনার কথাও বালকদিগের মনে হইত না। কিন্তু তিনি যাহা করিতে বলেন, বালকগণ তাহাই

করে,—সে স্নেহের ফল। গত শীতকালে বালকের নিউমোনিয়া হইয়াছিল। সেই হইতে তাহার স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হইয়াছে; তাহার স্বভাবতঃ গৌরবর্ণ ত্বকে কেমন যেন স্বচ্ছাভা দেখা যাইতেছে; সামান্ত ঠাণ্ডায় তাহার কাশি হয়। এই সকল কারণে চিকিৎসকগণ তাহাকে সর্ব্বদা সাবধানে রাখিতে উপদেশ দিয়াছেন। তাহাকে লইয়া জ্যেষ্ঠতাত সর্ব্বদাই চিন্তিত; তাহার সামান্য অসুখে তিনি বিচলিত হইয়া পড়েন।

চা-পান শেষ হইলে জ্যেষ্ঠ সুরেন্দ্রনাথ কনিষ্ঠকে বলিলেন, "যোগী, শাশুড়ী ঠাকুরাণী আসিয়াছেন।"

কনিষ্ঠ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আসিয়াছেন?"

"হাঁ। চল্, তাঁহাকে দেখিয়া আসি।"

"আমি যাইব?"

জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের গ্রীবার উপর দক্ষিণ করতল সংস্থাপিত করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "কেন; তোর যাইতে লজ্জা করে? চল্. যাই। ত্রিতলে আছেন ত?"

"হাঁ, ত্রিতলেই থাকিবার কথা।"

এসকল বিষয়ের ভার যোগেন্দ্রনাথের উপরেই ছিল। গৃহের সকল কার্য্য তাঁহার হুকুম মত সম্পন্ন হইত। পরিবারের মধ্যে যে হুকুম চালাইতে জানে ও হুকুম চালায়, ক্রমে হুকুম চালাইবার অধিকারও তাহারই একচেটিয়া হইয়া উঠে। অনেক স্থলেই দেখা যায়, জনকের বা জ্যেষ্ঠের

স্নেহশিথিল-হস্তচ্যুত শাসন-দণ্ড ক্ষমতা-প্রিয় পুত্রের বা কনিষ্ঠের করায়ত্ত হয়।

সুরেন্দ্রনাথ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র মোহিনীমোহনকে বলিলেন, "বাবা, তোমার জ্যেঠাইমাকে বল, আমরা যাইতেছি।"

মোহিনীমোহন চলিয়া গেল এবং অল্পক্ষণ পরেই ত্রিতল হইতে ডাকিল, "জ্যেঠা মহাশয়!"

"যাই, বাবা", বলিয়া সুরেন্দ্রনাথ উঠিলেন।

দুই ভ্রাতা ত্রিতলে আসিলেন; সুরেন্দ্রনাথ অগ্রে, যোগেন্দ্রনাথ পশ্চাতে।

তাঁহারা আসিতেছেন জানিয়া রোগিণী মস্তকে কাপড় টানিয়া দিলেন। তাঁহার উভয় কন্যাই তখন তাঁহার নিকটে ছিলেন। তিনি কনিষ্ঠাকে বলিলেন, "নলিনী, জামাইকে প্রণাম কর।"

সুরেন্দ্রনাথ কক্ষদ্বারে আসিতেই বিদ্যুৎ-পুঞ্জ-সম-প্রভা সুন্দরী যুবতী আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। তিনি বুঝিলেন, যুবতী তাঁহার শ্যালিকা। তিনি কুশল প্রশ্ন করিলেন। অর্দ্ধাবগুণ্ঠন কেহ যুবতী ক্ষিতি-তল-বিনিহিত-নয়না হইয়া দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধ নেক নখে বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের নখ খুঁটিতে খুঁটিতে অতি ; এ উত্তর প্রদান করিলেন ও পরক্ষণেই মন্থর গমনে পার্শ্বে দিয়া কক্ষ পরিত্যাগ করিলেন।

তখন দাদার পশ্চাৎ হইতে যোগেন্দ্রনাথ অন্য দ্বারপথে পলায়নপরা একজন যুবতীকে লক্ষ্য করিতেছিলেন। তাঁহার

প্রেমের জয়।

ওষ্ঠাধরে অতি মৃদু হাস্য ফুটিয়া উঠিতেছিল। সে যুবতী তাঁহার পত্নী, শৈলবালা।

সুরেন্দ্রনাথ ও যোগেন্দ্রনাথ রোগিণীকে প্রণাম করিলেন। তাঁহারা কক্ষ হইতে সম্মুখস্থ, মুক্ত ছাদে আসিলে সুরেন্দ্রনাথের পত্নী কুমুদিনী মাতার শয্যাপার্শ্ব হইতে সেখানে আসিলেন। ভ্রাতৃদ্বয় তাঁহার নিকট রোগের অবস্থা অবগত হইলেন। তিনজনে চিকিৎসা-সম্বন্ধে পরামর্শ করিলেন। কোন্ কবিরাজ ডাকা হইবে, কখন ডাকা হইবে, রোগিণীকে কিরূপ পথ্য দিতে পারিলে ভাল হয়—ইত্যাদি কথার পর দুই ভ্রাতা দ্বিতলে আসিলেন।

দ্বিতলে আসিয়া জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠকে বলিলেন, "যোগী, তবে তুই সব করিস্। আজ আমার আফিসে কাজ বেশি; সকাল সকাল যাইতে হইবে; ফিরিতেও বিলম্ব হইবে।"

কনিষ্ঠ উত্তর করিলেন, "সে হইবে। বৌদিদি ও আমি আবশ্যক হয়, করিব।"

[illegible]রেন্দ্রনাথের পিতা স্বোপার্জ্জিত যে সম্পত্তি ও অর্থ [illegible] গিয়াছিলেন, তাহাতে পুত্রদিগের পক্ষে চাকরী না [illegible]গ্রহেরও ক্ষতি ছিলনা। কিন্তু যে প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া [illegible] সঞ্চয় করে, সে আলস্য সহিতে পারে না; যে মধু-মক্ষিকার মত শ্রমশীল, সঞ্চয়শীল, সে বিকশিত ফুলবনে প্রভাত রৌদ্রোৎফুল্ল প্রজাপতির ক্রীড়া দেখিতে ভালবাসে না।

তাহার নিকট নিষ্ফল শ্রম ত্যাজ্য, আলস্য ঘৃণিত। তাই প্রায়ই দেখা যায়, যে বংশপতি ভবিষ্যৎ বংশধরদিগের জন্য অর্থ সঞ্চয় করিয়া যায়েন ও অজাত উত্তরাধিকারিগণকে বিলাসে নষ্ট হইবার অবকাশ দেন—তাঁহার কৃপণ আখ্যা থাকে; আর যে সকল বংশধর তাঁহার কষ্টলব্ধ অর্থ বিলাসে, ব্যসনে ব্যয়িত করেন, তাঁহাদের প্রশংসা হয়, তাঁহারা মুক্তহস্ত। সুরেন্দ্রনাথের পিতা স্বয়ং কোন বড় ব্যবসাদারের কারবারে টাকা দিয়া পুত্রকে অংশী ও কর্ম্মচারী করিয়া দিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ সেই অভ্যাসই বহল রাখিয়াছেন; পিতার শ্রাদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্ম ত্যাগ করেন নাই। এ পনের বৎসর কাল তিনি নিয়মমত আফিস করিতেছেন।

পিতার যখন মৃত্যু হয়, যোগেন্দ্রনাথ তখনও ছাত্র। দাদার উপর তাঁহার ভার পড়িয়াছিল। অতিরিক্ত স্নেহশীল জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের আরাম-বিধানে যত মনোযোগী ছিলেন, তাঁহাকে কাজের লোক করিতে তত ব্যস্ত ছিলেন না। কেহ সে কথা বলিলে তিনি উত্তর করিতেন, "পয়সা ত বাবা অনেক উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন, আমিও যথাসাধ্য করিতেছি; এ সবই ত যোগীর। ও আরামে থাকে, আনন্দে দিন কাটায়, ইহাতেই আমার সুখ। ও লেখাপড়া ভালবাসে তাহাই লইয়া থাকুক।" স্কুল কলেজ ছাড়িয়া যোগেন্দ্রনাথ পুস্তকের সঙ্গ ছাড়েন নাই। তাঁহার পুস্তকের সখটা ক্রমে অতিরিক্ত অধিক

হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এমন কি, পত্নী শৈলবালা এক একদিন কৌতুক করিয়া বলিতেন, "এক দিন তোমার পুস্তকগুলা পুড়াইয়া দিব! তোমার যে ভালবাসা আমার প্রাপ্য, তাহা উহারাই দখল করিয়া বসিতেছে। উহারা আমার সপত্নী।"

দাদার শিক্ষাগুণে যোগেন্দ্রনাথের চরিত্রের কতকগুলি অংশ পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালী তাঁহার চরিত্রের সব বিশেষত্ব দূর করিয়া তাঁহাকে সাধারণ ছাত্রের ছাঁচে গড়িবার চেষ্টা করিয়া বিফল-মনোরথ হইয়াছিল। যে দিক্ হইতে বায়ু ও আলোক আইসে, বৃক্ষের সেই দিকেই যেমন কুসুমপল্লবশ্রী বিকশিত হয়, তেমনই যে দিকে জ্যেষ্ঠের স্নেহশিক্ষার প্রভাব ছিল, কনিষ্ঠের চরিত্রের সেইদিকই পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল—তাঁহার চরিত্রে স্বাতন্ত্র্য, নীতিপ্রিয়তা ও জ্ঞান পিপাসা প্রবল হইয়াছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সুন্দরী।

কলিকাতায় আসিবার দুই দিন পরেই রোগিণীর অবস্থা অত্যন্ত মন্দ হইয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধ কবিরাজ বলিলেন, "ধনাশা ও প্রাণাশা কাহারও যায় না। তবু সত্য কথা বলা ভাল। অন্যাবস্থার আর পাঁচদিন বিলম্ব আছে। রোগিণী এই পাঁচদিনের অধিক টিকিবেন না। যদি অভিপ্রেত হয়, চান্দ্রায়ণাদি করাইতে পারেন। আর সময় নাই।"

কবিরাজ বলিবার অনেক পূর্ব্বেই রোগিণী তাহা বুঝিয়াছিলেন, তিনি কয়দিন হইতেই চান্দ্রায়ণ করিবার জন্য জিদ করিতেছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা, তিনি স্বয়ং সব করিবেন। কবিরাজ বলিলেন, শরীরে সহিবে না। শেষে জননীর অনুমতি লইয়া নলিনী চান্দ্রায়ণ করিল।

যোগেন্দ্রনাথ জিদ করিয়া একজন ডাক্তার আনাইলেন। ডাক্তার বিজ্ঞ, প্রবীণ। তিনি অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, "বলেন, ঔষধ দিতে পারি। কিন্তু যখন জীবনের কোন আশাই নাই, তখন জোর করিয়া ঔষধ খাওয়ান অনাবশ্যক—এ সময় আর ধর্ম্মবিশ্বাসে বাধা দিবেন না।"

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "বলুন, কুসংস্কার।"

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, "এক হিসাবে দেখিলে, ধর্ম্ম মাত্রই কুসংস্কার। তবে বিশ্বাসটা অবজ্ঞার নহে। আপনি যাহাকে ধর্ম্ম বলেন, তাহা আপনার নিকট যেমন প্রিয়, আর একজনের নিকট আবার তাঁহার ধর্ম্ম তেমনই প্রিয়। জগতে ধর্ম্মও অনেক, বিশ্বাসও বহুবিধ—কোনটাই অবজ্ঞার নহে। একেশ্বরবাদী বলেন, একাধিক দেবতার কল্পনা অসম্ভব; আবার হিন্দুর নিকট শুনিবেন, একের কল্পনা যদি অসম্ভব না হয়, দশেরই বা হইবে কেন? সে তর্কের কথা থাক। রোগিণীকে এখন আর তর্ক করিয়া বুঝান যেমন অসম্ভব, তেমনই অনাবশ্যক।"

রোগিণীর জীবনীশক্তি ক্রমেই ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল। সুরেন্দ্রনাথ ছুটি লইলেন। সর্ব্বদাই মৃত্যুর আশঙ্কা, কাজেই দিবারাত্র রোগীর শয্যাপার্শ্বে থাকিতে হয়। নলিনী যোগেন্দ্রনাথের সম্মুখে আসিত না। রজনীর একার্দ্ধে যোগেন্দ্রনাথ ও তাঁহার ভ্রাতৃজায়া, অপরার্দ্ধে সুরেন্দ্রনাথ ও নলিনী রোগ-শয্যাপার্শ্বে থাকিতেন। নলিনী প্রায় আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছিল। রোগ শয্যাপার্শ্বে রাত্রি জাগিবার সময় সুরেন্দ্রনাথ একখানা পুস্তক পাঠ করিতেন। অনেক সময় তিনি নির্ব্বাপিত-কলরব গভীর নিশায় উষ্ণদীর্ঘশ্বাস-স্পর্শে চমকিয়া চাহিয়া দেখিতেন, নলিনী এক দৃষ্টে জননীর শীর্ণ পাণ্ডুর মুখপানে চাহিয়া আছে। সে এমনই চিন্তাকুলা যে, অবগুণ্ঠন সরিয়া গিয়াছে, তাহা জানিতেও পারে নাই। তাহার শুভ্র কপোলে দুই এক

গুচ্ছ রুক্ষ কেশ পড়িয়া আছে; দীপালোকে তাহার সজল নয়ন প্রভাত-রবিকরে শিশির-পূর্ণ কুসুমের শ্রী ধারণ করিয়াছে। সেই অশ্রুবিপ্লুত-নেত্রাকে তখন বিষাদের মূর্ত্তি বলিয়া মনে হইত। সত্য সত্যই সে এমন আত্মবিস্মৃতা হইয়াছিল যে, সময় সময় রোগিনীর দেহে তাপ-পরীক্ষা-কালে—যদি জননীর অঙ্গ শীতল দেখে, এই আশঙ্কায় তাহার হৃদয় বেগে আঘাত করিতে থাকিত; তখন ব্যস্ততায় সুরেন্দ্রনাথের করে কর-স্পর্শ হইলেও সে হাত সরাইয়া লইতে ভুলিয়া যাইত।

অমাবস্যার দিন জ্বর একটু প্রবল হইল। চিকিৎসকের আদেশ মত জ্বর-ত্যাগ-কালে রোগিণীর করতলে ও পদতলে শুঁট-চূর্ণ ঘসা হইল। সে দিনও কাটিল দেখিয়া নলিনীর মনে আবার ক্ষীণ আশা দেখা দিল। আশাহীন হইয়া কে থাকিতে পারে? অভাগিনী কিছুতেই বুঝিতে চাহিল না যে, দিনান্তের পশ্চিম-দিগন্তরঞ্জী বিচিত্র বর্ণমালা যেমন মুহূর্ত্তমধ্যে রজনীর তিমির-সাগরে বিলীন হইয়া যায়, তাহার ক্ষীণ আশাও তেমনই হৃদয়-তটে ফুটিতে ফুটিতে নিঃশেষ হইয়া যাইবে।

পরদিন প্রভাত হইতে রোগিণী যেন অর্দ্ধতন্দ্রাবস্থায় রহিলেন। মধ্যে মধ্যে দুই একটি অসংলগ্ন বাক্যও বাহির হইতে লাগিল; তাহার মধ্যে বহুবর্ষ পূর্ব্বে মৃতা দুই ভগিনীর নাম ও 'ধাই' শব্দ স্পষ্ট শুনা গেল। তাঁহার চক্ষের সম্মুখে মর জগতের দৃশ্য যতই অপসৃত হইতেছিল, অমর জগতের দৃশ্য ততই পরি-

স্ফুট হইয়া উঠিতেছিল কি না, তাহা কে বলিবে? মৃত্যুর অন্ধকার যবনিকার অন্তরালবর্ত্তী দৃশ্য জীবিতের পক্ষে অদৃশ্য; কিন্তু যাহার জীবনতরী মৃত্যুর সাগরে ভাসিয়াছে, সে কি পরপারবর্ত্তিগণের আহ্বান শুনিতে পায়? তাহার নয়ন সমক্ষে কি পরলোকের দৃশ্য ফুটিয়া উঠে? কে বলিবে?

সেই দিন অপরাহ্নে রোগিণী সহসা নয়ন মেলিলেন। নির্ব্বাণের পূর্ব্বে জীবন-দীপ-শিখা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি ধীরে ধীরে দক্ষিণ কর তুলিয়া জ্যেষ্ঠা কন্যার মস্তকে রাখিলেন, বলিলেন, "মা, চিরসুখিনী হও। নলিনীর ভার তোমার।" কুমুদিনীর নয়ন জলপূর্ণ হইল। নলিনী ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। জননী তাহার দিকে হস্ত লইলেন। সে সযত্নে হস্তখানি লইয়া আপনার মস্তকে রাখিল। এ স্নেহ-স্পর্শ-লাভ হয়ত জীবনে আর ঘটিবে না ভাবিয়া তাহার অশ্রুধারা দ্বিগুণ বহিল। এ চিন্তা কি দুঃখের! জননী বলিলেন, "মা কাঁদিয়া কি করিবে? যাহারা কাছছাড়া হইলে বুঝি মুহূর্ত্তও জীবন থাকিবে না বোধ হয়, তাহাদের ছাড়িয়াও থাকিতে হয়। ধর্ম্মে মতি রাখিও; দেবতাকে ভুলিও না—" তাহার পরই তিনি একটি অসংলগ্ন কথা কহিলেন। নলিনী ডাকিল, "মা!" রোগিণী আবার একটি অসংলগ্ন কথা কহিলেন। সে চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে নিতান্ত অনিচ্ছায় আপনার মস্তক হইতে জননীর হস্ত নামাইয়া রাখিল।

সেই দিন নিশাশেষে রোগিণীর শেষ শ্বাস বাহির হইয়া গেল। নলিনী জননীর শবদেহ জড়াইয়া বুকফাটা বেদনায় কাঁদিতে লাগিল। তাহার পক্ষে এ শোক কেবল জননীবিয়োগ-দুঃখ নহে। সংসারে সে জননী ব্যতীত আর কাহাকেও জানিত না; সুখে, দুঃখে, বিপদে, সম্পদে সে কেবল জননীকেই চিনিত। নির্ঝর-মুক্ত বারিরাশি যখন উপলব্যথিতগতি শত শীর্ণ স্রোতে বেণী বিনাইয়া প্রবাহিত হয়, তখন তাহার গভীরতা থাকে না। কিন্তু সেই শত স্রোতঃ যখন এক গর্ভে মিলিত হইয়া বিপুল-তোয়া, বীচিবিক্ষোভ-বিহ্বলা তরঙ্গিণীতে পরিণত হয়, তখন তাহার গভীরতা বৃদ্ধি পায়;—অভাগিনীর জননীর প্রতি ভালবাসাও সেইরূপ হইয়াছিল,—তাহার হৃদয়ের রুদ্ধ স্নেহশক্তি শতপথে প্রবাহিত হইতে না হইতে একত্র মিশিয়া গভীর হইয়াছিল। তাহার হৃদয়ে জনক-জননী-ভক্তি, পতিপ্রেম, অপত্যস্নেহ, এ সকলই, অন্য অবলম্বনের অভাবে, কেবল জননীকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছিল। আজ মৃত্যু তাহাকে সেই একমাত্র অব-লম্বনচ্যুতা করিল, তাই তাহার হৃদয় অননুভূতপূর্ব্ব বেদনায় ক্লিষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। তাই তাহার একাধারে-সর্ব্বস্বরূপিণী জননীর মৃত্যুতে এই অকাল-সুখ-স্বাদ-বিরহিতার পক্ষে জগৎ যেন অন্ধ-কার হইয়া গেল। আজ অতীত জীবনের শত কথা তাহার মনে পড়িতে লাগিল। শোকে পূর্ব্বস্মৃতি সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে।

* * * *

স্থির হইল, চতুর্থীতে সমারোহ করা হইবে না, যাঁহারা নিতান্ত আত্মীয় বা ঘনিষ্ঠ কেবল তাঁহাদিগকেই নিমন্ত্রণ করা হইবে। বৃদ্ধ সরকার দপ্তর হইতে নিমন্ত্রণের ফর্দ্দ বাহির করিয়া যোগেন্দ্রনাথকে দিল—তিনি নাম বাছিবেন। কিন্তু ঠিক সেই কাযটাই যোগেন্দ্রনাথের পক্ষে অসম্ভব। তিনি যে নামই দেখেন, সেই নামই কাটিতে একটা না একটা বাধা উপস্থিত হয়। ইনি ঘনিষ্ঠ, উঁহার কন্যার বিবাহে সে দিন নিমন্ত্রণ খাইয়া আসিয়াছি, বাণীবাবুর বাড়ী সর্ব্বদা যাতায়াত হইয়া উঠে না, এবার বলা ভাল, পূর্ণ বাবুর বাড়ী না বলিলে তিনি দেখা হইলেই ঠাট্টা করিবেন—ইত্যাদি সহস্র ওজুহাতে প্রায় কোন নামই কাটা হইল না। শেষে যখন তিনি দেখিলেন, সর্ব্বসমেত গুটি পাঁচ নাম বাদ পড়িয়াছে, তখন বিরক্ত হইয়া ভাবিলেন, যখন শতকরা নিরনব্বইটিই থাকিল, তখন আর একটা বাদ দিয়া কি হইবে? সবই থাকুক। সরকারকে বলিয়া দিলেন, "ফর্দ্দ যেমন আছে, তেমনই থাকুক।" বৃদ্ধ সরকার আপনার মনে হাসিল,—"ছোটবাবুকে আমি বিশেষ চিনি। তাঁহার নিমন্ত্রণে এক মণ দ্রব্যের আয়োজন করিতে বলিলে দেড় মণ লাগে। ফর্দ্দছাঁটা তাঁহার কার্য্য নহে।"

কাযেই বিরুদ্ধ সঙ্কল্প সত্ত্বেও ক্রিয়ায় সমারোহ হইল। সে দিন সুরেন্দ্রনাথের গৃহ নিমন্ত্রিতাগণের অলঙ্কারশিঞ্জনে ও কণ্ঠস্বরে গুঞ্জনমুখর মধুচক্রবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল, এবং তাঁহাদিগের

বিচিত্রবর্ণ-বসন-সৌন্দর্য্যে প্রভাত-রবিকর-পানোৎফুল্ল প্রজাপতি-সঙ্কুল বিকশিত ফুলবনের শোভা ধারণ করিল। গাড়ী ভাড়ার পয়সা গণিতে গণিতে সরকারের হাত ও উপরনীচে করিতে করিতে শৈলবালার পা ব্যথা হইয়া গেল। প্রৌঢ়াগণ কুমুদিনীকে সান্ত্বনা দিতে প্রয়াস পাইলেন; যুবতীরা কেহ কেহ এক এক স্থানে একত্র হইয়া পতিচর্চ্চা হইতে উপন্যাসচর্চ্চা পর্য্যন্ত নানা চর্চ্চা করিতে লাগিলেন, কেহ কেহ বা নিমন্ত্রিতাদিগের মধ্যে কেহ কোন অদৃষ্টপূর্ব্ব নূতন বেশ বা ভূষণ পরিধান করিয়াছেন কি না, দেখিবার জন্য চারি দিকে সাগ্রহ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; বালিকারা বারান্দায় ঝুঁকিয়া রাস্তার জনতা দেখিতে লাগিল।

নলিনী নবাগতা। তাহাকে দেখিয়া ও তাহার পরিচয় পাইয়া সকলেই দুঃখ দেখাইয়া বলিলেন, "আহা, এমন রূপ; এমন অদৃষ্ট!"

অপরাহ্ণ হইতে আগতাগণ গৃহে ফিরিতে আরম্ভ করিলেন। মহিলাদিগের আসাও যেমন সময়-সাধ্য যাওয়াও তেমনই সময়-সাপেক্ষ। 'তবে উঠি' বলিতে, গাড়ী ডাকাইতে, ঝির দ্রব্যাদি গোছাইয়া লইতে, যাইতে যাইতে ফিরিয়া দুইবার কথা কহিতে, বিলম্ব হইয়া যায়; তখন হয়ত সঙ্গের ছোট ছেলে বিরক্ত হয়, শেষে তাহাকে দুই একটা চড় দিয়া গৃহিণী সত্য সত্যই উঠেন। তাঁহাদের সব যাইতে রাত্রি হইয়া গেল। নলিনী সমস্ত দিন

তাঁহাদের তত্ত্বাবধানে অসাধারণ শ্রম করিয়াছিল। এতক্ষণে সে নিষ্কৃতি পাইয়া স্নানাগারে প্রবেশ করিল।

সেই দিন রাত্রিকালে তাহার নিঃসঙ্গ শয়নকক্ষে শয্যায় শয়ন করিয়া নলিনী সেই কথা মনে করিল, "আহা, এমন রূপ এমন অদৃষ্ট!" তাহাকে সকলে কৃপার পাত্র বিবেচনা করিয়াছে! সে যে রূপসী, এ কথা সে শৈশব হইতেই গ্রামের মহিলাদের মুখে শুনিয়া আসিয়াছে। তাঁহাদের কথায় সে অভ্যস্তা হইয়া পড়িয়াছিল; সে কথায় তাহার আর কিছু মনে হইত না। কিন্তু যাঁহারা পল্লীগ্রামের ছায়াবহুল, পত্র-মর্ম্মর-মুখর বিটপিশ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী পথে গৃহ হইতে গৃহান্তরে গমন কল্পনাও করিতে পারেন না; কলসকক্ষে নদীতে যাইয়া জল আনয়ন যাঁহারা দাসীর কার্য্য মনে করেন; যাঁহারা রন্ধনশালার ভার পাচকের হস্তে দিয়া নিশ্চিন্ত; যাঁহারা বেশভূষা দেখানই নিমন্ত্রণরক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য মনে করেন, এবং নিমন্ত্রণ সভায় এক প্রকার অলঙ্কার উন্মোচিত করিয়া অন্য প্রকার অলঙ্কার পরিধান করেন; যাঁহারা শিশুসন্তান সঙ্গে লইয়া নিমন্ত্রণে আসা লজ্জাকর বলিয়া ঘৃণায় মুখ ফিরান, তাঁহারা? তাঁহারা ত সেই পল্লীগ্রামের পরিচিতাদিগের অপেক্ষা অনেক উচ্চে। তাঁহারাও তাহাকে সুন্দরী দেখিয়াছেন! সত্যই কি সে এমন সুন্দরী?

নলিনী ধীরে ধীরে শয্যাত্যাগ করিল; দীপটি লইয়া কক্ষ-প্রাচীরে বিলম্বিত দর্পণ-সম্মুখে দাঁড়াইল। সে মুগ্ধনেত্রে দর্পণে

আপনি আপনার প্রতিবিম্ব দেখিল। অবেণীবদ্ধ কুঞ্চিত কেশজাল সুন্দর; নয়ন—শোভন; নাসিকা—সুগঠিত; ওষ্ঠাধর—রক্তাভ; গণ্ড—পূর্ণ। অযত্নবিন্যস্ত বেশে ভ্রমরকৃষ্ণ-কেশজালপরিবেষ্টিত শুভ্র বাম স্কন্ধ দেখা যাইতেছে; যেন ঘনকৃষ্ণ মেঘমালার মধ্য হইতে পরিপূর্ণ চন্দ্রমণ্ডল সমুদিত হইতেছে। নলিনী দেখিল, সে সুন্দরী। নলিনীর চক্ষে জল আসিল; সে দর্পণে দেখিল, যেন পদ্মপর্ণে প্রভাতশিশির শোভা পাইতেছে। তাহার পর দুই বিন্দু অশ্রু আঁখিতট হইতে আসিতে যেন মুহূর্ত্ত স্থির হইয়া দাঁড়াইল; তাহার পর বাহির হইয়া আসিয়া গড়াইয়া দেহের বসনে পড়িয়া মিশাইয়া গেল।

নলিনী দীপ রাখিয়া আসিয়া শয্যায় শয়ন করিল; ভাবিল, অদৃষ্টের সহিত তাহার বিরোধ কেন? কোন্ পাপে সে ঐহিকের সর্ব্বসুখ বঞ্চিতা?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিষাদিতা।

চতুর্থীর পর দিন কুমুদিনী যোগেন্দ্রনাথকে বলিলেন, "ঠাকুরপো, নলিনীর কি হইবে?"

যোগেন্দ্রনাথ একখানা পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন। তিনি মুখ না তুলিয়া বলিলেন, "কেন?"

"তুমি ত জান শ্বশুরকুলে তাহার স্থান নাই। এখন পিতৃগৃহেও অভিভাবকের অভাব হইল।"

"আমি সে কথা বলিতেছি না। অমি বলিতেছি, এ কথা আবার আমাকে জিজ্ঞাসা করা কেন? তিনি এখানেই থাকিবেন।"

যোগেন্দ্রনাথ যে এই উত্তর দিবেন, কুমুদিনী তাহা জানিতেন।

নলিনী ভগিনীর সংসারভুক্তা হইল।

দুই ভগিনীর নামে যেমন, রূপে ও প্রকৃতিতেও তেমনই প্রভেদ ছিল। প্রকৃতি উভয়কেই একটি বাঞ্ছিত বস্তু দিয়াছিলেন, রূপ। দুই ভগিনীই রূপবতী। কিন্তু দুই জনের রূপ দুই প্রকারের। সৌন্দর্য্যের একটা সীমারেখা আছে,; সেই রেখায় তাহার সম্পূর্ণ বিকাশ; সে রেখা অতিক্রম করিলে বা তাহার পশ্চাতে থাকিলে সে রূপে যেন পূর্ণতার অভাব হয়। নলিনীর

সৌন্দর্য্য সেই বিকাশ-রেখায় আসিয়া পূর্ণ বিকশিত হইয়াছিল। তাহাকে দেখিলে অসামান্যা রূপসী বলিয়া বোধ হয়। কুমুদিনীও রূপসী; কিন্তু তাঁহাকে দেখিলে রূপসী বলিয়া বোধ হইবার বহুপূর্ব্বে তাঁহার সৌন্দর্য্যের স্নিগ্ধ-গম্ভীর শ্রীর অনুভূতিতে হৃদয় পূর্ণ হইয়া যায়। উভয়ের প্রকৃতিতেও ঠিক এইরূপ প্রভেদ। কনিষ্ঠা সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতিকা, জ্যেষ্ঠা ফলভারাবনতা, ছায়াদাত্রী ব্রততী; কনিষ্ঠা শরতের রবিকরোজ্জ্বল অম্বরে ক্রীড়া-চঞ্চল শুভ্র অভ্র, জ্যেষ্ঠা পরার্থে সর্ব্বস্ব-বিসর্জ্জনোন্মুখ জলভার-কাতর বর্ষার মেঘ, কনিষ্ঠা দীপ্ত দামিনী, জ্যেষ্ঠা স্নিগ্ধচন্দ্রা-লোক; কনিষ্ঠা সযত্নরক্ষিত-উপবন-প্রহ্লাদিনী বাপী, জ্যেষ্ঠা জীবন দায়িনী, বিস্তীর্ণা স্রোতস্বতী; কনিষ্ঠা গর্ব্বরাগরক্ত গোলাপ, জ্যেষ্ঠা প্রভাত-শিশির-সিক্তা, পল্লবান্তরালবর্ত্তিনী যূথিকা; কনিষ্ঠা রবিকরদীপ্ত মধ্যাহ্ন, জ্যেষ্ঠা শুকতারা-সমুজ্জ্বল-ললাট সন্ধ্যা।

কুমুদিনীর প্রকৃতি ঢিলা বলিলেই ঠিক ভাবটি ব্যক্ত হয়। সংসারে কেবল একটি বিষয় ব্যতীত আর কিছুতেই তিনি সযত্ন মনোযোগ দিতে চাহিতেন না। কেবল যোগেন্দ্রনাথের সন্তানদিগের লালন-পালন বিষয়ে তিনি মুহূর্ত্তের জন্য ঔদাসীন থাকিতে পারিতেন না। একদিন কি কারণে বিরক্ত হইয়া শৈলবালা মধ্যম পুত্র যোগিনীমোহনকে একটি সামান্য চপেটা-ঘাত করিয়াছিলেন। তাহাতে বন্ধ্যা জ্যেঠাইমার চক্ষের পাতা ভিজিয়া আসিয়াছিল। তিনি বেদনাচঞ্চল হৃদয়ে শৈলবালাকে

তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন, "ভগবান্ তোমাকে সন্তান দিয়াছেন বলিয়া উহাদের অযত্ন করিও না। জগতে কত অভাগিনী কত কাঁদিয়াও ত কোলে শিশু পায় না।" সেই দিন হইতে দেবরের সন্তানদিগের সকল ভার তিনি লইয়াছেন। শৈলবালার ছেলেরা জ্যেঠাইমার কোলেই মানুষ হয়। জননীর কাছে তিরস্কৃত হইলে তাহারা জ্যেঠাইমার কোলে বসিয়া নালিশ করে; জ্যেঠাইমা মাকে তিরস্কার করেন। তখন তাহারা জ্যেঠাই মার গলা জড়াইয়া বলে, "জ্যেঠাইমা, আমরা কেন তোমার ছেলে হই নাই?" তাহাদের সেই প্রশ্নে বন্ধ্যা জ্যেঠাই-মার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া আইসে। তিনি সন্তানলাভ সুখ-বঞ্চিতা। সন্তানের ক্ষুদ্র করের স্পর্শলাভের জন্য তিনি কি না দিতে সম্মত? দেবরের পুত্রদিগকে লইয়া তিনি সে দুঃখ ভুলিয়াছিলেন।

কুমুদিনী যেমন ঢিলা ছিলেন, নলিনী তেমনই গোছাল ছিল। সে বিশৃঙ্খলা সহিতে পারিত না। সে শ্রম করিতে ভালবাসিত; সব কায আপনার হাতে না করিলে তাহার তৃপ্তি হইত না। সে প্রায়ই কুমুদিনীকে বলিত, "দিদি, তুমি বড় অগোছাল। ছোটদিদি (শৈলবালা) না থাকিলে উহারা বুঝিতে পারিত না, বাড়ীতে মানুষ থাকে কি জানোয়ার থাকে।" কুমুদিনী হাসিয়া বলিতেন, "আমরা বুড়া হাড়া হইয়াছি, এখন গঙ্গামুখো পা—এখনও কি আর তোদের মত শক্ত আছি?

তোরা দুই ভগিনী সংসার কর। আমার এখন দেবতার নাম করিবার কথা।” শুনিয়া নলিনীও হাসিত, শৈলবালাও হাসিত।

নলিনী ইচ্ছা করিয়া সংসারের সব কায করিত। ক্রমে সংসারের সব কাযের ভার তাহারই হাতে আসিল। সুরেন্দ্র-নাথের খাবার গোছান হইতে ভাঁড়ার দেওয়া পর্য্যন্ত সে-ই সব করিত। কুমুদিনী তাহার হাতে সব ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। কেবল যোগেন্দ্রনাথের ছেলেদের ভার তিনি আপনি রাখিলেন।

ছেলেরাও জ্যেঠাইমা ছাড়া আর কাহারও কাছে ঘেঁসিত না। তাহাদের আদর আবদার সবই জ্যেঠাইমার কাছে। ক্রমে এমনই দাঁড়াইয়া ছিল যে, মার কাছে কিছু চাহিতে তাহা-দের লজ্জা করিত। জ্যেঠাইমা নহিলে যেমন ছেলেদের চলিত না, ছেলেরা নহিলে তেমনই জ্যেঠাইমা থাকিতে পারিতেন না। নলিনীর আদর, মার গোপন তিরস্কার ও জ্যেঠাইমার প্রবোধ এ সকল সত্ত্বেও ছেলেরা নলিনীর বশ হইল না। নলিনী তাহাদের কত আদর করে, তবুও তাহারা তাহার কাছে যায় না, ইহাতে শৈল বড় লজ্জিতা হইত; গোপনে ছেলেদের তিরস্কার করিত। “মাসীমার কাছে যাইতে হয়, নহিলে মাসী মা বড় দুঃখ করিবেন—”ইত্যাদি অনেক কথায় জ্যেষ্ঠ মোহিনী-মোহন সময় সময় নলিনীর কাছে যাইত; কিন্তু মধ্যম

প্রেমের জয়।

যোগিনীমোহন কিছুতেই বাগ মানিল না। একদিন মার কাছে তিরস্কৃত হইয়া সে আসিয়া জ্যেঠাইমার কোল দখল করিয়া তাঁহার বুকে মুখ লুকাইয়া অনেক কাঁদিল। জ্যেঠাইমা অনেক করিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করার পর সে বলিল, "আমি মাসীমার কাছে যাই না বলিয়া মা আমাকে বকিয়াছেন।" তাহার পর অশ্রুসজল বড় বড় চক্ষে তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিল, "জ্যেঠাইমা, আমি তোমার কাছে থাকিব। আর কাহারও কাছে যাইব না।" জ্যেঠাইমা আদর করিয়া বলিলেন, "এই জন্য কান্না? তোমার কাহারও কাছে যাইতে হইবে না।" তিনি শৈলবালাকে বলিলেন, "বোকা মেয়ে, বকিয়া ছেলেদের কাঁদাইয়া কি শাসন করিতে হয়?" শৈলবালা বড় লজ্জা পাইল, মনে মনে যোগিনীমোহনের উপর বড় রাগ করিল, নলিনীকে বলিল, "দেখিলে? দিদি আদর দিয়াই ওগুলাকে মাটী করিলেন। ঢের ছেলে দেখিয়াছি, কিন্তু এমন দুষ্ট ছেলেও আর দেখি নাই। আমার নামে আবার নালিশ করা হইয়াছে?"

নলিনীর সহিত অতি অল্প দিনেই শৈলবালার বিশেষ মিশামিশি হইয়া দাঁড়াইল—কারণ, উভয়ে সমবয়সী। সমবয়সী নহিলে মিশামিশি ঘনিষ্ঠ হয় না—বয়সের অন্তরায় অতিক্রম করা সহজ নহে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে চিত্তবৃত্তির পরিবর্ত্তন হয়, আবার সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জগতেরও অনেক পরিবর্ত্তন ঘটে। যে আচারের কল্পনায় বৃদ্ধা শিহরিয়া উঠেন, যুবতীর তাহাতে

সামান্য একটু লজ্জা মাত্র। এই সকল কারণে বয়সের অনৈক্যে মানসিক মিলন-সম্ভাবনা অল্প হইয়া পড়ে। তাই তরুণী ভার্য্যা লইয়া বৃদ্ধ স্বামীর যেমন বিপদ, বৃদ্ধ পতিকে লইয়া তরুণীর তেমনই বিপদ। বৃদ্ধা নহিলে বৃদ্ধের মর্য্যাদা কেহ বুঝে না; যুবক নহিলে কেহ যুবতীর আদর করিতে জানে না। নলিনী সংসারের শত কায করিত,—আর অবসর পাইলেই ভাবিত। তাহা আর কেহ লক্ষ্য না করিলেও শৈলবালা লক্ষ্য করিত। সে দুই এক-বার নলিনীকে জিজ্ঞাসাও করিয়াছিল, "তুমি এত কি ভাব?" নলিনী চেষ্টাসাপেক্ষ হাসি হাসিয়া বলিত, "কৈ? ভাবি আবার কি?" কিন্তু শৈল কয়দিনই দেখিয়াছে, সে সহসা এ প্রশ্ন করিলে নলিনী যেন ভাবগোপনের চেষ্টা করে; সে চমকিয়া উঠে, তাহার মুখ মুহূর্ত্তের জন্য অপসৃত-রবিরশ্মি গগনের মত পাণ্ডুর হইয়া যায়। শৈল দুই একবার ভাবিয়াছে, "ইহার কারণ কি?" শেষে আপনা আপনি বলিয়াছে, "দূর হউক ছাই, তাহাতে আমার কি?" কিন্তু স্থির করিয়াছে, সুবিধামত যোগেন্দ্রনাথকে এ কথাটা বলিবে। যে কথাই হউক, স্বামীকে না বলিয়া কি থাকা যায়?

বাস্তবিক নলিনী ভাবিত। গৃহকর্ম্মের মধ্যে অবসর পাইলে, একা থাকিলে, নিশায় শয্যায় শয়ন করিয়া—নলিনী ভাবিত। জননীর চতুর্থীর দিন সে ভাবিয়াছিল, অদৃষ্টের সহিত তাহার বিরোধ কেন? কোন্ পাপে সে ঐহিকের সর্ব্বসুখবঞ্চিতা? সে

দিন যে চিন্তার অঙ্কুর মাত্র তাহার হৃদয়ে দেখা দিতেছিল, ক্রমে তাহা শাখাপল্লবপুষ্টা বিষবল্লরীতে পরিণত হইতেছিল,—আপনার বিতত শত শাখা-প্রশাখায় তাহার হৃদয় বেষ্টিত করিতেছিল।

আজ তাহার জননী আর নাই। তাহার সম্মুখ হইতে আত্মত্যাগের সে উচ্চ আদর্শ আজ অপসৃত। জননীর জীবনে কেবল স্বার্থত্যাগ, কেবল আত্মত্যাগ। সে আর সে আদর্শ সম্মুখে পায় না। দুশ্চিন্তায় যাঁহার কাছে হৃদয়ের ভার নামাইয়া, স্নেহ-প্রণোদিত সদুপদেশ পাইত, আজ আর তিনি নাই। যিনি তাহার দুঃখে, তাহার বেদনায় তাহার সঙ্গে আন্তরিক দুঃখে ও আন্তরিক বেদনায় কাঁদিতেন, তিনি আজ মৃতা। তিনি তাহার সুখে সুখী, তাহার দুঃখে দুঃখী, তাঁহার উপদেশ পালন করা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু তিনি আজ কোথায়—কোন দূরে? কতবার দুশ্চিন্তা-তাড়িতা হইয়া সে কাঁদিয়া ডাকিয়াছে, "মা আমার, আজ তুমি কোথায়? আমি অসহায়া, আমি সন্দেহ-শঙ্কিতা।" কিন্তু সে উত্তর পায় নাই। মরণের রাজ্য হইতে তাহার মরকর্ণে কোন উত্তর আইসে নাই। প্রথম প্রথম সে মনে করিত, জননীর স্নেহনেত্র ধ্রুবতারার মত তাহার দিকে চাহিয়া আছে; তিনি জীবনেও যেমন মরণেও তেমনই তাহার হিতচিন্তা করিতেছেন। কিন্তু শোক চিরদিন রহে না। শোকের সঙ্গে সঙ্গে এ চিন্তাও দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। যে অমৃত-প্রস্রবণে, স্নেহধারায় সে মর্ত্তে স্বর্গের স্বাদ পাইত, সে প্রস্রবণধারা বিশুষ্ক।

নলিনী আপনা আপনি ভাবিত, স্বামীর সোহাগ, সন্তানের মুখচুম্বন—কি দোষে তাহার ভাগ্যে এ সকল সুখ লাভ হয় নাই? সে শৈলবালার বর্ষমাত্র-বয়স্ক কোলের ছেলেকে দেখিত, —দেখিত আর ভাবিত, সে কেন অমনই একটি নিতান্ত অসহায় জীবকে আপনার বক্ষের শোণিতে বর্দ্ধিত করিয়া আপনার তপ্তবক্ষঃ শীতল করিতে পারে না? কোন্ পাপে সে সে অধিকার-বঞ্চিতা? তাহার বোধ হইত, যেন তাহার জীবন তপ্ত মরু; তাহাতে স্বচ্ছ-সলিলোদ্গারী প্রস্রবণ নাই, স্নিগ্ধছায়াবর্ষী বনস্পতির অঙ্গাবলম্বিনী হরিৎপত্রস্তুকুলা লতিকা নাই, শাখিশাখাসীন বিহগের কলকূজন নাই,—জীবনের লেশমাত্র নাই। অপরের জীবন-উপবনে যে শোভাময়—সৌরভময় কুসুম বিকসিত হয়, তাহার জীবন-মরুর অনল-শ্বাসে তাহা বিশুষ্ক হইয়া যায়। সে শৈলবালার কথা ভাবিত,—আপনার কথা ভাবিত,—কিছুই স্থির বুঝিতে পারিত না;—কেবল ভাবিত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

প্রেম।

রাত্রি কালে শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া শৈলবালা দেখিল, একখানা আরাম-কেদারায় শয়ন করিয়া পাঠ করিতে করিতে যোগেন্দ্রনাথ ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন; পুস্তকখানি বক্ষের উপর খোলা রহিয়াছে। দেখিয়া শৈলের বড় অভিমান হইল। সে ধীরে ধীরে আসিয়া শয্যায় বসিল। আসল কথাটা এই যে, সে দিন মধ্যাহ্নে শৈল স্বামীকে বলিয়া রাখিয়াছিল, তাহার একটা বড় আবশ্যক কথা আছে, রাত্রিতে তাহা বলিবে। তাহার কথা-টার গুরুত্ব সম্বন্ধে অনেকের সন্দেহ থাকিতে পারে, কিন্তু স্বামী যে সেটা না শুনিয়াই নিদ্রিত হইয়াছেন—এ বড় কষ্ট। দরিদ্রের অভাবই তাহার নিশ্চিন্ততার কারণ; যাহার কিছু নাই, সে কি হারাইবার আশঙ্কা করিবে? কিন্তু যাহার সম্পদ আছে, তাহার হারাইবার ভয়ও আছে। যাহার সম্পদ যত অধিক, তাহার সেই সম্পদ হারাইবার আশঙ্কাও তত অধিক। যে রমণী স্বামীর কাছে যত ভালবাসা পায়, তাহার সেই ভালবাসা হারাইবার আশঙ্কাও তত অধিক হয়। শৈল স্বামীর নিকট অত্যধিক ভালবাসা পাইয়াছিল, তাই কথায় কথায় তাহার রজ্জুতে সর্পভ্রম হইত; স্বামীর সামান্য ত্রুটিকে সে উপেক্ষা মনে করিয়া প্রেম হারাইবার

আশঙ্কায় ব্যথিতা হইত; সে প্রণয় যেন তাহার জীবন, বুঝি প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়।

শৈল স্বামীর উপর রাগ করিয়া আসিয়া বসিল বটে, কিন্তু সে রাগ অধিকক্ষণ সেইরূপই থাকিল না। স্বামীর উপর রাগ করিয়াছে বলিয়া সে কি স্বামীকে অযত্ন করিবে? শৈল উঠিয়া আলোটা মৃদুতেজা করিয়া দিল; তাহার পর স্বামীর বক্ষের উপর হইতে পুস্তকখানা লইয়া বন্ধ করিয়া টেব্‌লের উপর রাখিল। তাহার পর ফিরিবার সময়—স্বামীর উপর যতই কেন রাগ থাকুক না—স্বামীর মুখচুম্বন করিল। যোগেন্দ্রনাথ পড়িতে পড়িতে ঘুমাইয়াছিলেন, নিদ্রা তেমন গাঢ় হয় নাই, অধরস্পর্শে তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। শৈলবালার ইচ্ছা ছিল, স্বামীর মুখচুম্বন করিয়া যাইয়া ঘুমাইবে। তাহা হইল না—তখনও স্বামীর ওষ্ঠাধরে তাহার ওষ্ঠাধর মিলিত। সে সামলাইয়া বলিল, "তবুও ভাল যে, ঘুম ভাঙ্গিল।"

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তবুও ভাল যে, এতক্ষণে তুমি শুভাগমন করিলে!"

সত্যসত্যই নলিনীর সহিত গল্প করিতে করিতে শৈলবালার আসিতে বিলম্ব হইয়াছিল। সে বলিল, "আমার একটা বড় কাযের কথা আছে।"

"বল, শুনি"—বলিয়া যোগেন্দ্রনাথ আসিয়া শয্যায় উপবেশন করিলেন। শৈল স্বামীর পার্শ্বে বসিল।

প্রেমের জয়।

শৈলবালার কাযের কথাটা এই যে, মাঘ মাসের মধ্যভাগে তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহ, সেইজন্য তাহার জননী তাহাকে এই অগ্রহায়ণ মাসেই লইয়া যাইতে চাহেন। তাঁহার ইচ্ছা, শৈল যাইয়া মাস দুই তাঁহার কাছে থাকে। তিনি অল্পদিন পূর্ব্বে গঙ্গাস্নানোপলক্ষে কলিকাতায় ভাসুর পুত্র রমেশচন্দ্রের গৃহে আসিয়াছিলেন। তখন তাঁহার সহিত শৈলের দেখা হইয়াছিল, কাযেই স্বামীকে ছাড়িয়া সুদীর্ঘ প্রবাসে তাহার কোনই আকর্ষণ ছিল না। সে এখন পিত্রালয়-গমনে অসম্মতা। এই বিষয়ে স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ করাই আজ তাহার "কাযের কথা।"

সব কথা শুনিয়া যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কিন্তু রমেশ আজ আমাকে জিজ্ঞাসা করায় আমি যে বলিয়াছি, তুমি যাইবে।"

রমেশ শৈলবালার জ্যেষ্ঠতাতপুত্র;—যোগেন্দ্রনাথের সতীর্থ। লোকে কথায় বলে, ক্ষণে অক্ষণে দেখা। রমেশের সহিত যোগেন্দ্রনাথের বোধ হয় 'ক্ষণে' দেখা। নহিলে কি এমন বন্ধুত্ব হয়? বন্ধুত্ব যেমন দুর্ল্লভ, তেমনই মহার্হ। বাল্যেই শৈশবসহচরদিগের সহিত ঘনিষ্ঠতার শেষ। যৌবনে বৃত্তিবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাল্যসখাদের ছাড়াছাড়ি। তাহার পর সংসারে প্রবেশ করিয়া নূতন অবস্থায়—নূতন ব্যবস্থায় মানুষ নূতন পরিচয় সংস্থাপন করে। শেষে চল্লিশোর্দ্ধে কেবল কাযের খাতিরে দুই চারি জনের সঙ্গে আন্তরিকতাহীন ঘনিষ্ঠতা মাত্র থাকে। শৈশবে, বাল্যে, যৌবনে;—ক্রীড়াক্ষেত্রে, বিদ্যালয়ে, প্রবাসে;—কত জনের সহিত পরিচয়

হইয়াছে। আজ তাহারা কে কোথায়? আজ ঘনিষ্ঠতা দূরে থাকুক, তাহাদিগকে দেখিলেও আর চিনিতে পারা যায় না। বিদ্যালয়ে রমেশের সহিত যোগেন্দ্রনাথের যে পরিচয়ের সূত্রপাত, সংসারে ক্রমে তাহার গাঢ়তা বর্দ্ধিত হইয়াছে। কলেজে, সহাধ্যায়ীরা তাহাদিগকে বিদ্রূপ করিয়া মাণিকজোড় বলিত। তখন প্রায় প্রতিদিন অপরাহ্নে দুইজনে একসঙ্গে ভ্রমণে বাহির হইত; যে দিন দূরে যাওয়া ঘটিত না, সে দিন দুইজনে যোগেন্দ্রনাথের গৃহের সম্মুখে রাজপথে এক মোড় হইতে অপর মোড় পর্য্যন্ত যাতায়াত করিত, আর গল্প করিত। তাহার পর যখন রাজপথে দিনের আলোক নিবিয়া আসিত, সন্ধ্যার ধূসর অঞ্চল ধীরে ধীরে পাষাণ নগরীর উপর স্নিগ্ধ শান্তির মত ব্যাপ্ত হইয়া পড়িত, দিনান্তে শ্রমক্লিষ্ট, কর্ম্মচারী ম্লানমুখে গৃহে ফিরিত, তখন রমেশ গৃহে ফিরিয়া যাইত। সে আজ অনেক দিনের কথা। এফ. এ. পরীক্ষার পর রমেশ ডাক্তারী পড়িতে যায়। আজ পাঁচ বৎসর তিনি ডাক্তার হইয়াছেন। এখন আর দুইজনে নিত্য সাক্ষাৎ হয় না, কিন্তু দুই তিন দিনে একবার দেখা না হইলে উভয়েই যেন হাঁপাইয়া উঠেন।

শৈলবালার পিত্রালয় পল্লীগ্রামে। তাহার জ্যেষ্ঠতাত (রমেশের পিতা) কলিকাতায় ওকালতী করিতেন। শৈলের পিতা কাহারও পীড়া, গ্রামে মারীভয় ইত্যাদি কারণে সময় সময় সপরিবারে ভ্রাতার বাসায় আসিয়া থাকিতেন। শৈল বিবাহযোগ্য-বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে জ্যেষ্ঠতাত তাহাকে কলিকাতায় আনিয়া

রাখিয়াছিলেন। পল্লীগ্রামের ছেলেরা বিদ্যাশিক্ষা-ব্যপদেশে কলিকাতায় আইসে; কলিকাতা ছেলের আড়গোড়া। সুতরাং ভদ্রসমাজের বিবাহব্যাপার ক্রমে কলিকাতাতেই নিষ্পন্ন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। পল্লীগ্রামে ঘটক সম্প্রদায় প্রায় নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। এখন পল্লীবাসীদের পক্ষেও রাজধানীতে বিবাহব্যাপার নিষ্পন্ন করা সুবিধা-জনক। বিবাহের পূর্ব্ব হইতেই যোগেন্দ্রনাথ শৈলবালাকে জানিতেন। হয়ত পতিপত্নীর প্রেমের প্রগাঢ়তার তাহাও একটি কারণ—পূর্ব্ব-পরিচয়ের সহিত ভাল-বাসার সংমিশ্রণ প্রেমের বাসন্ত লাবণ্য।

শৈল বলিল, "তুমি বুঝি আগেই সেজদাকে বলিয়াছ?"

যোগেন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন, "হাঁ। সে আজ আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল।"

"তা তুমি আগেই বলিতে গেলে কেন?"

"যাহা বলিয়াছি, তাহার এখন আর উপায় নাই।"

শৈল অভিমানভরে বলিল, "আমি এখন যাইব না।"

"কিন্তু সে কি ভাবিবে?"

"সে যাহাই হউক; আমি যাইব না।"

"তবে তুমি আমাকে অপদস্থ করিবে?" বলিয়া উঠিয়া যোগেন্দ্রনাথ ভ্রুকুটিকুটিলমুখে কক্ষ-মধ্যে পাদচারণ করিতে লাগিলেন।

শৈল বুঝিল, সে অন্যায় করিয়াছে। কোন কোন রমণী

আপনার প্রেমৌষধিদানে সে বেদনা দূর করিবে বলিয়াই ইচ্ছা করিয়া স্বামীর হৃদয়ে ব্যথা দেয়। যে স্থলে স্বামী সত্যে ব্যথা পায়েন, সে স্থলে সেরূপ আচরণে পদে পদে বিপদের আশঙ্কা। শৈল সেরূপ নহে। স্বামীর প্রেম তাহার হৃদয়ে অক্ষয় যৌবন দান করিয়াছিল; তাই সে যৌবনসুলভ-চাপল্যচালিতা হইত। সে আপনার অন্যায় বুঝিয়া আপনি দুঃখিতা হইল। কিন্তু দোষের পর স্ত্রী কখনও মুখ ফুটিয়া স্বামীর কাছে ক্ষমা চাহিতে পারে না, স্বামী অযাচিত হইয়া স্ত্রীকে ক্ষমা করে। পুরুষ-সাগরের সহিত ও রমণী নদীর সহিত উপমেয়। নদী সঙ্কীর্ণা, অল্পে চঞ্চল হইয়া উঠে; তাহার বীচি-বিক্ষোভ-চঞ্চল মূর্ত্তিও মনোরম। সাগর উদার—অল্পে চঞ্চল হয় না; কিন্তু তাহার চাঞ্চল্য বড় ভীষণ; সে প্রলয়তাণ্ডব ধ্বংস সহচর। নদী আপন আবেগে চঞ্চল হইয়া উঠে; আত্মহারা, উজানবাহিনী হয়। সাগরের চাঞ্চল্য তাহার অতলস্পর্শী হয় না; সে সফেন চাঞ্চল্যে তাহার গাম্ভীর্য্যচ্যুতি ঘটে না; অধিকন্তু সে উদারহৃদয় ক্ষমা-শীল; সে বক্ষে কি নদীর কখনও স্থানাভাব হয়? অভিমানের পর স্বামী স্ত্রীকে ক্ষমা করে নাই, স্নেহাধিক্যে আশ্রিতার চাপল্য ভুলিয়া তাহাকে স্নেহ-সম্ভাষণ করে নাই—এমন কখনও শুনিয়াছ কি? কিছুক্ষণ কক্ষমধ্যে পাদচারণ করিয়া যোগেন্দ্রনাথ সস্নেহে পত্নীর পৃষ্ঠে কর স্থাপন করিয়া বলিলেন, "এখন কি করা যাইবে?"

এইবার অশ্রুর প্রবাহে শৈলবালার অভিমানের বালির বাঁধ ভাসিয়া গেল। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া স্বামীর বুকে মুখ গুঁজিয়া বলিল, "তুমি যাইতে বল যাইব। কিন্তু আমি তোমাকে ছাড়িয়া অতদিন থাকিতে পারিব না।"

যোগেন্দ্রনাথ সযত্নে পত্নীকে বামবাহু বেষ্টনবদ্ধ করিয়া দক্ষিণ হস্তে তাহার মুখ তুলিয়া ধীরে ধীরে তাহাতে চুম্বন দান করিলেন, যেন ভয়, পাছে সে ব্যথা পায়, যেন সে কুসুমকোমলা কঠিন স্পর্শে ম্লান হইয়া যাইবে। সবলের প্রেম স্নেহসেচনসিক্ত।

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কি করা যায়?"

শৈল উত্তর দিল, "তুমি মত দিলেই হয়।"

"তাহা হইলে কি করিবে?"

তুমি যদি পাঠাও, সে অন্য কথা। নহিলে দিদি কিছুতেই আমাকে এখন যাইতে দিবেন না। তিনি এতদিন ছেলেদের ছাড়িয়া থাকিতে পারিবেন না, সে আমি বিশেষ জানি। তিনি কি তাহাদের চক্ষের অন্তরাল করিতে চাহেন? তাহাদিগকে আমার কাছে রাখিয়াও তাঁহার বিশ্বাস হয় না।"

"আচ্ছা তাহাই হইবে। আমি সে কথা ভাবি নাই।"

"আমি না হয় মাঘ মাসের প্রথমে যাইব। যদি সকলে নিতান্ত বলেন, মাসের শেষে আসিব। মোহিনীকে এখানে রাখিয়া যাইব। ছেলেরা একজন কাছে না থাকিলে দিদির বড় কষ্ট হইবে!"

যোগেন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, "আর তাঁহার কাছছাড়া হইলেই তাহাদের অযত্ন হইবে।"

শৈল বলিল, "তুমি আমাকে বিদ্রূপ করিতেছ; কিন্তু কথাটা সম্পূর্ণ সত্য। আমি মা হইলে কি হয়; আমি কখনও তাহাদিগকে দিদির মত যত্ন করিতে পারি না। তাহাদের পদে কণ্টক বিঁধিলে যেন দিদির বুকে ব্যথা বাজে।"

"দাদারও তেমনই। উহারা নহিলে আহার হয় না; উহারা নহিলে বেড়ান হয় না; উহারা নহিলে চলে না।"

"আর দিদির স্নেহ কি কেবল ছেলেদের উপর? আমার ভগিনী থাকিলে তাহারাও আমাকে দিদির মত ভালবাসিতে পারিত না। মানুষ অনেক দেখিয়াছি, কিন্তু এমন স্নেহশীলা আর দেখি নাই। মানুষের এত গুণ হয় না।"

"রাত্রি হইল ঘুমাও"—বলিয়া যোগেন্দ্রনাথ পত্নীর মুখচুম্বন করিলেন। দুই বাহু দিয়া পতির গ্রীবা বেষ্টন করিয়া শৈল আবেগবিহ্বল চুম্বনে স্বামীর মুখ প্লাবিত করিয়া দিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পরিবর্ত্তন।

নলিনী আসিয়াই ভগিনীর সংসারে শৃঙ্খলা-শ্রী সংস্থাপিত করিল। সে বিশৃঙ্খলা সহিতে পারিত না, জানিত সামান্য যত্নে, সামান্য চেষ্টায়, সামান্য শ্রমে গৃহ সুন্দর হয়, কার্য্যের সুবিধা হয়, অধিবাসীদিগের অসুবিধা নিরাকৃত হয়। যে গৃহে আবশ্যকের সময় সম্ভব হইতে অসম্ভব সকল স্থানে অনুসন্ধান করিয়া আবশ্যক দ্রব্যটি পাওয়া যায় না, কার্য্যের সময় একটা না একটা কিছুর অভাবে বিলম্ব হয়,—সে গৃহে বাস অনন্ত অসুখের কারণ। সে গৃহে শৃঙ্খলার সঙ্গে সঙ্গে সৌন্দর্য্য, আনন্দ ও আরাম—তিনেরই অভাব ঘটে। বিশৃঙ্খল সংসারে বাস করিয়া শিশুরা ক্রমে সৌন্দর্য্যজ্ঞান হারায়; তাহাদের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য-প্রিয়তা নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে, তাহারা নানা বিষয়ে বিরক্ত হইতে আরম্ভ হয়; শেষে হৃদয়ের সৌন্দর্য্যও অনেকটা হারায়। অথচ সামান্য চেষ্টায় সংসারে শৃঙ্খলা সংস্থাপিত হয়। গৃহিণীর গৃহিণীপনা থাকিলে সবই সহজে হয়। শৃঙ্খলা অসাধ্য-সাধন নহে। গৃহিণীপনাতেই গৃহিণীর গৌরব; তাহাই তাঁহার বিশেষ অধিকার।

সে পরিবর্ত্তন যোগেন্দ্রনাথ সহজে বুঝিতে পারিলেন না। তিনি স্বয়ং বাল্যকাল হইতেই শৃঙ্খলা ও পরিচ্ছন্নতা-প্রিয় ছিলেন; আপনার দ্রব্যগুলি আপনি সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিতেন। ভৃত্যদিগের প্রতি আদেশ ছিল, তাহারা যেন তাঁহার বিনানুমতিতে তাঁহার আপনার ব্যবহারের দ্রব্যাদিতে হাত না দেয়। তাহারা সাজাইতে যাইলেই সব বিশৃঙ্খল করে। প্রভুর কোন্ দ্রব্যটি কোথায় রক্ষিত হইলে তাঁহার সুবিধা হইবে, তাহা ভৃত্য কেমন করিয়া বুঝিবে? ভৃত্যের হস্তে ভার দিয়া থাকা বড় যন্ত্রণা। বেতনভুকের কার্য্যে আন্তরিক যত্ন থাকে না। শৈল আপনি গোছাল। তাহার পতিপ্রেম তাহার হৃদয় পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল; তাহার প্রেম-পিপাসা পতির প্রেম-প্রাপ্তিতে কেবল বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তাই সে স্বামীর অস্তিত্বে আপনার স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন দিয়াছিল। সে স্বামীর সুখবিধানই জীবনের সর্ব্ব-প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করিত। সে স্বামীর সুখ দুঃখ, সুবিধা অসুবিধাকে আপনার সুখ দুঃখ, সুবিধা অসুবিধা করিয়া লইয়াছিল; এমন কি আপনার রুচিকেও স্বামীর রুচির অনুবর্ত্তিনী করিয়া তুলিতেছিল। স্বামীর শৃঙ্খলা ও পরিচ্ছন্নতা-প্রিয়তায় তাহার শৃঙ্খলা ও পরিচ্ছন্নতাপ্রিয়তা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। পূর্ণিমার চন্দ্র যেমন ধীরে ধীরে দিবসের আলোক-দান-ভার গ্রহণ করে, সেও তেমনই ধীরে ধীরে স্বামীর দ্রব্যাদির ভার লইয়াছিল। ক্রমে স্বামীর

জয়।

দ্রব্যাদি সেই ঝাড়িত, গুছাইত, সাজাইত। সহস্র কাযের মধ্যেও সে কাযে অবহেলা করিত না। প্রথম প্রথম যোগেন্দ্রনাথ এক একদিন বলিতেন, "তোমার আর ওসব করিতে হইবে না। তুমি কষ্ট করিও না।" পত্নীর শ্রম ও শৃঙ্খলার নামে বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা—দুই বিষয়ের চিন্তাতেই তিনি ব্যস্ত হইয়া উঠিতেন। শৈল উত্তর দিত, "কেন, আমি কি তোমার এতই পর যে আমাকে তোমার কায করিতে নাই? আমার শক্তি অল্প। যতটুকু সাধ্য তোমার কায করিব তাহাতে রাগ করিও না।" যোগেন্দ্রনাথ নিরুত্তর হইতেন। বাস্তবিক শৈল এমন যত্নে স্বামীর সুবিধা অসুবিধা লক্ষ্য করিয়াছিল যে, যোগেন্দ্রনাথ বিস্মিত হইতেন। তাঁহার যে দ্রব্যটি যে স্থানে রাখিলে সুবিধা হয়, যেটি তিনি যে স্থানে রাখিতে ভালবাসেন—সেটি সেই স্থানেই থাকে। ক্রমে আপনার সম্পূর্ণ ভার পত্নীর হস্তে দিয়া তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতেন। জানিতেন, একজন তাঁহার আপনার অপেক্ষাও তাঁহাকে যত্ন করে; জানিতেন, তাঁহার সামান্য অসুবিধায় একজন বেদনা অনুভব করে; জানিতেন, একজন তাঁহার সামান্য সুখের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। ইহা জানাতে যে অপরিসীম সুখ, তাহা যিনি স্বয়ং অনুভব না করিয়াছেন, তিনি বুঝিতে পারিবেন না। শৈলবালার প্রেমে যোগেন্দ্রনাথের পক্ষে সেই দুর্লভ সুধামৃত অতি সুলভ হইয়াছিল।

গৃহে নূতন শৃঙ্খলাশ্রী যোগেন্দ্রনাথ শীঘ্র বুঝিতে পারিলেন

না। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের তাহা অনুভব করিতে বিলম্ব হইল না। কুমুদিনী কোন কালেই গোছাল ছিলেন না। সে জন্য প্রধানতঃ তিনি স্বয়ং দায়ী হইলেও তাঁহার পিতামহী, শ্বশুর ও স্বামীও অনেকটা দায়ী ছিলেন। তিনি পিতামাতার প্রথম সন্তান। তিনি যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন তাঁহার জননীর বয়স বিংশ-সীমা অতিক্রম করিয়াছিল,—লোকে বলিত, তিনি বন্ধ্যা। একমাত্র পুত্রবধূর সন্তান না হওয়ায় শাশুড়ী বড়ই দুঃখিতা ছিলেন। সেই সময় কুমুদিনীর জন্ম হয়। "এতদিনে আঁধার ঘর আলো হইল" বলিয়া পিতামহী সূতিকা-গৃহেই পৌত্রীকে অঙ্কে তুলিয়া লইয়াছিলেন। সেই দিন হইতে বালিকাকে কেহ কিছু বলিতে পারিত না। পিতামহী তাহাকে নয়নের অন্তরাল করিতে পারিতেন না। কাযেই পিতামহীর অতিরিক্ত আদরে পিত্রালয়ে তাঁহার কায শিখা হয় নাই। তিনি কায করিতে যাইয়া শ্রান্ত হইলে পিতামহীর চক্ষে জল আসিত।

স্বামীর ঘর করিতে আসিয়াও কুমুদিনীর কায শিখিবার সুবিধা হয় নাই—তাহার জন্য দায়ী তাঁহার শ্বশুর। শ্বশুর নহিলে বধূর আদর হয় না। কিন্তু এক্ষেত্রে আদরের কিছু আতিশয্য ঘটিয়াছিল। শ্বশুরের কন্যা ছিল না; দুই পুত্র মাত্র। পিতা পুত্রকে যতই ভালবাসুন, আদর দিতে সাহস করেন না; বরং ভবিষ্যৎ ভাবিয়া অনেক সময় তাঁহাকে কঠোর হইতে

হয়। কত পিতা পুত্রের মঙ্গল কামনায় তাহাকে শাসন করিয়া আপনি নয়ন-জলে ভাসিয়াছেন। অথচ সন্তানকে আদর দিবার ইচ্ছা নিতান্ত স্বাভাবিক—সেই ইচ্ছা সকলেরই হৃদয়ে অন্তঃসলিলা ফল্গুর বারির মত প্রবাহিত। যিনি বাহিরে যত কমঠ-কঠোরই হউন না কেন, কোন্ পিতা সত্য করিয়া বলিতে পারেন, তিনি সন্তানকে দেখিয়া তাহাকে আদর করিতে ইচ্ছুক হয়েন না? কন্যাকে ভালবাসায় ভবিষ্যচিন্তার বিভীষিকা নাই। কুমুদিনী শ্বশুরের এই স্নেহ পাইয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের পিতা পুত্রবধূকে অতিরিক্ত স্নেহ করিতেন। পত্নীর উপর আদেশ ছিল, তিনি যেন কোনও কারণে বধূকে তিরস্কার না করেন। কোন দিন কোন কারণে বধূর মুখ মলিন দেখিলে তিনি পত্নীকে তিরস্কার করিতেন। তিনি ক্রোধপরায়ণ ও গম্ভীর-স্বভাব ছিলেন, কাযেই তাঁহার পত্নী কখনও তাঁহার আদেশের অবহেলা করিতে সাহস করিতেন না। পুত্রবধূর জন্য দ্রব্যাদি আপনি দেখিয়া না কিনিলে তাঁহার তৃপ্তি হইত না। তাঁহার তিরস্কার সত্ত্বেও যখন সুরেন্দ্রনাথ গাড়ীতে স্ত্রীকে লইয়া বেড়াইতে যাইতে সম্মত হইলেন না, তখন তিনি স্বয়ং পুত্রদ্বয় ও পুত্রবধূকে গাড়ীতে লইয়া কোনদিন আলিপুরে পশুশালায়, কোনদিন "মিউজিয়মে", কোনদিন "বটানিকাল গার্ডেন" দেখিতে, কোন দিন বা গঙ্গাতীরে বেড়াইতে যাইতেন। এ অবস্থায় কুমুদিনীর পক্ষে সৌখিন কায ব্যতীত সংসারের কায শিখা হয় নাই।

তাহার পর শ্বশুরের ও মাসাধিক কাল যাইতে না যাইতে শাশুড়ীর মৃত্যু হইল। তখন গৃহে সুরেন্দ্রনাথ কর্ত্তা, কুমুদিনী গৃহিণী। সুরেন্দ্রনাথ স্বয়ং কোন কালেই বিশেষ গোছাল ছিলেন না, কাযেই তিনি চেষ্টা করিয়া স্ত্রীকে গোছাল করিয়া তুলেন নাই। কুমুদিনীর পতিপ্রেম যে কোন রূপে ক্ষুণ্ণ ছিল তাহা নহে, বরং তাহা প্রেম হইতে ভক্তির সীমায় উঠিয়াছিল। তিনি স্বামীর কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে ভরসা করিতেন না। পতির প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি প্রেমের এক রূপ। কুমুদিনীর চরিত্রে প্রেমের সেই রূপ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। চির-যৌবনবেগময় হৃদয়ে প্রেমের আর এক রূপ পরিস্ফুট হয়। সে প্রেমে রমণী স্বামীর সকল তুচ্ছ কার্য্যও আপনার করিয়া লইতে চাহে; স্বামীর সর্ব্ববিষয়ে অংশ না পাইলে পত্নীর তৃপ্তি হয় না। শৈলবালার হৃদয়ে প্রেমের সেইরূপের বিকাশ।

ভৃত্য হরিদাসই সুরেন্দ্রনাথের সকল দ্রব্যাদির হেপাজাত করিত। আফিসে যাইবার সময় তাঁহাকে প্রায়ই চাপকানের বোতামের জন্য বা নূতন মোজার জন্য অপেক্ষা করিতে হইত; এক একদিন দুই একটা বোতাম-বিহীন চাপকানে বা ছিন্নতল মোজা পরিয়াই যাইতে হইত। সুরেন্দ্রনাথ ক্রমে তাহাতেই অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন; ইহাতে তাঁহার বিরক্তিমাত্র হইত না। তাঁহার চরিত্রে ক্রোধ স্বভাবতঃই অতি অল্প ছিল। নলিনী সুরেন্দ্রনাথের এসব অসুবিধা লক্ষ্য করিয়াছিল। এবিষয়

লইয়া সে দিদিকে দুই একবার তিরস্কারও করিয়াছিল। কুমুদিনী বলিতেন, "তুই পারিস্—সব কর্। আমি আর এ বুড়া বয়সে তোদের মত খাটিতে পারি না। কৈ—উনি ত কোনদিন অসুবিধার কথা বলেন নাই!" নলিনী বলিত, "তিনি বলেন না; কিন্তু তুমি কি দেখিতে পাও না? পাছে তোমার কষ্ট হয়, তাই তিনি স্পষ্ট করিয়া বলেন না। সেই জন্যইত তোমার দেখিয়া বুঝা উচিত। কুমুদিনী বলিতেন, "তুই কথার ভট্‌চাজ্জি। তোর সঙ্গে কথায় কে পারিবে?" তাহার পর হাসিয়া বলিলেন, "তুই ত দেখিলে পারিস।" একদিন নলিনী বলিল, "আচ্ছা; তাহাই হইবে।"

সেই দিন হইতে নলিনী সুরেন্দ্রনাথের দ্রব্যাদির ভার লইল। সে আবশ্যক দ্রব্য গুলি ব্যবহারোপযোগী করিয়া গুছাইয়া রাখিত; কোন দ্রব্য আনিবার প্রয়োজন হইলে পূর্ব্বাহ্নে হরিদাসকে দিয়া যোগেন্দ্রনাথকে সংবাদ দিত। সংসারের কায তাঁহার নির্দ্দেশ মতে সম্পন্ন হইত। তিনি দ্রব্য আনাইয়া দিতেন। কাযেই প্রয়োজনের সময় সুরেন্দ্রনাথ আর আবশ্যক দ্রব্যের অভাব বুঝিতে পারিতেন না।

সহসা এই পরিবর্ত্তনে সুরেন্দ্রনাথ প্রথমে বিস্মিত হইলেন; তাহার পর জানিলেন, নলিনীই গৃহে শৃঙ্খলা-শ্রী সংস্থাপিত করিয়াছে।

সুরেন্দ্রনাথ পূর্ব্বে পত্নীর নিকট বহুবারই নলিনীর শ্রমশীলতা ও

শৃঙ্খলাপ্রিয়তার প্রশংসা শুনিয়াছিলেন। এখন তিনি তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলেন—সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি মনে মনে সেই অসহায়া, দুরদৃষ্টা যুবতীর বিশেষ প্রশংসা করিলেন। হাসিয়া পত্নীকে বলিলেন, "তুমি যাহা বলিয়াছিলে, তাহা সত্য বটে। নলিনী আমার জিনিসপত্র এমন গুছাইয়া রাখিতেছে যে, প্রয়োজনের সময় ঠিক দ্রব্যটির অভাবে বিলম্ব করিয়া অবসর লাভ করিতে পাই না।"

ভগিনীর প্রশংসা শুনিয়া কুমুদিনী হর্ষোৎফুল্লা হইলেন; বলিলেন, "নলিনীর ক্ষমতা দেখিয়া আমি বিস্মিতা হইতেছি। এখন সংসারের সব কাযই সে করে; আর সবই ভাল হয়।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ছায়া।

অগ্রহায়ণের শেষে একদিন সুরেন্দ্রনাথ নিয়মিত সময়ের পূর্ব্বে আফিস হইতে বাড়ী আসিলেন। অসময়ে সোপানে জ্যেষ্ঠের পদধ্বনি শুনিয়া যোগেন্দ্রনাথ হরিদাসকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাদা আসিয়াছেন ?" ভৃত্য বলিল, "আজ্ঞা হাঁ। আসিয়া শুইয়াছেন।"

যোগেন্দ্রনাথ একখানা পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন; পুস্তকখানি রাখিয়া জ্যেষ্ঠের নিকট উপস্থিত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাদা, অসুখ করিয়াছে ?"

সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "হাঁ। মাথায় বড় যন্ত্রণা হইতেছে।"

করতলে জ্যেষ্ঠের কপাল স্পর্শ করিয়া যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "গা যে খুব গরম! তাপ লইয়া দেখি।" তিনি যাইয়া তাপমান যন্ত্র আনিলেন; তাপ লইয়া বলিলেন, "তাপ যে ১০৪ ডিগ্রি।"

সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "হইবে। আমার গত আট বৎসর জ্বর হয় নাই;—একটু অধিক হইবার সম্ভাবনা। ব্যস্ত হইবার কোন কারণ নাই।"

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমি রমেশকে ডাকিয়া পাঠাই।"

"আজ থাক্। দেখা যাউক কি হয়।"

"সে হইবে না।" বলিয়া যোগেন্দ্রনাথ কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

অল্পক্ষণ পরেই দ্বারবান পত্র লইয়া রমেশচন্দ্রের নিকট গমন করিল।

পত্র পাঠাইয়া দিয়া যোগেন্দ্রনাথ জ্যেষ্ঠের নিকটে আসিয়া বসিলেন। তাঁহার একটা বিশেষত্ব ছিল, তিনি আপনার অসুস্থতার প্রতি যেরূপ অমনোযোগী, গৃহে আর কাহারও পীড়ায় তেমনই অতিরিক্ত অধিক বিচলিত হইয়া পড়েন।

সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন "তুই কেন ব্যস্ত হইতেছিস্? আপনার কাযে যা।"

যোগেন্দ্রনাথ দাদার কাছেই বসিয়া রহিলেন।

এক ঘণ্টা যাইতে না যাইতেই রমেশচন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া যোগেন্দ্রনাথের বসিবার ঘরে প্রবেশ করিলেন; সে কক্ষে কাহাকেও না দেখিয়া ডাকিলেন, "যোগেন।" সুরেন্দ্রনাথের কক্ষ হইতে যোগেন্দ্রনাথ ডাকিলেন, "রমেশ, আমি দাদার ঘরে। এখানে আইস।"

রমেশচন্দ্র সুরেন্দ্রনাথের কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তিনি যোগেন্দ্রনাথের সমবয়সী; কিন্তু তাঁহাকে বয়সের পরিমাণে বৃদ্ধ দেখায়। ইহার মধ্যেই কপালে দুই একটি রেখা দেখা

দিয়াছে; মস্তকের দুই পার্শ্বে দুই চারিটি পক্ক কেশও লক্ষিত হয়। বর্ণ গৌর—হস্তে ও মুখে তাম্রাভ। দেহ দীর্ঘাকার; বরং কৃশ বলিলে গঠনের বর্ণনা অনেকটা ঠিক হয়। শ্মশ্রু মুণ্ডিত; চক্ষে চসমা। মুখে বিষাদচ্ছায়া। রমেশচন্দ্র দীনদুঃখীর সহায় ও বন্ধু। রমেশচন্দ্র ধনীর গৃহে রোগী দেখিতে যাইবার পূর্ব্বে অসহায় দুঃখীর গৃহে গমন করেন। দরিদ্রের নিকট দর্শনী গ্রহণ করেন না, বরং অনেক সময় ঔষধ ও পথ্যের জন্য অর্থ-সাহায্য দান করেন। প্রভাতে তাঁহার গৃহে বহু দরিদ্র রোগী ব্যবস্থা লইতে আসিয়া থাকে। তিনি সযত্নে তাহাদিগের চিকিৎসা করেন, একখানি খাতায় তাহাদিগের নাম ও ঠিকানা লিখিয়া রাখেন; খাতাখানি তাঁহার অস্ত্রাদির ব্যাগে থাকে। একদিন এক জন দুঃস্থ রোগী ব্যবস্থা লইতে না আসিলে রমেশচন্দ্র মনে করেন, বুঝি সে পীড়াতিশয্যে আসিতে পারে নাই; তিনি স্বয়ং তাহার গৃহে যাইয়া উপস্থিত হয়েন। কাযেই তাঁহার নাম শুনিলে দুঃখী দরিদ্র সজল নয়নে তাঁহার জন্য দেবতার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করে। দুঃখী জননী তাঁহার সাহায্যে মৃত্যুমুখগত পুত্রকে ফিরিয়া পাইয়া দেবতার উদ্দেশে বলে, "ঠাকুর, বাবুর ভাল কর।"

কিন্তু আশীর্ব্বচন যে সকল সময়ে সার্থক হয়, এমন নহে। সদনুষ্ঠানে যে আত্মতৃপ্তি ব্যতীত আরও কিছু পাওয়া যায়—জগতে সাধারণতঃ চাক্ষুষ প্রত্যয়ে তাহার প্রমাণ দুর্লভ। যোগেন্দ্রনাথ

বিশ্বাস করিতেন না যে, রমেশচন্দ্র সুখী। কেন, তাহাও তিনি কতকটা জানিতেন। কিন্তু বন্ধুদ্বয়ের মধ্যে সে কথা আলোচিত হইত না। ঊনিশ বৎসর বয়সে রমেশচন্দ্র এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মেডিকেল কলেজে গমন করেন। সেই সময়েই তাঁহার বিবাহ হয়। রমেশচন্দ্রের মাতা পাকা গৃহিণী ছিলেন। তিনি বলিতেন, "হয় সমানে সমানে কায করিব, নহেত আমার অপেক্ষা দরিদ্রের ঘরে কায করিব। ধনীর সহিত কাযে সুখ হইবে না।" রমেশচন্দ্রেরও সেই মত ছিল। কিন্তু তাঁহার পিতা কলিকাতায় ধনীর ঘরে কুটুম্বিতা করার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারেন নাই। তিনি কলিকাতার সমাজে মিশিয়া "পাড়া-গেঁয়ে" নাম মুছিয়া সেই পরিচিত সমাজের অঙ্গীভূত হইবার আশায় সকলের অমত সত্ত্বেও ধনীর ঘরে পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন।

সাধারণতঃ বিবাহের পর দিনকতক যুবক পত্নীর চিন্তাতে বিভোর থাকে। তখন সুযোগ পাইলেই বন্ধু-বান্ধবদিগের সহিত পত্নীর কথা বলিতে না পারিলে তাহার তৃপ্তি হয় না। তখন সে বাস্তব জগৎ ত্যাগ করিয়া কল্পনালোকে বাস করে; মায়াপুরের মন্দারগন্ধী-অমৃতপান-বিভোর হইয়া থাকে। তাহার সে অবস্থা লুকাইয়া রাখা অসম্ভব। কুসুম কি আপনার বক্ষের সৌরভ গোপন রাখিতে পারে? কিন্তু যোগেন্দ্রনাথ রমেশচন্দ্রে ইহার বিপরীত লক্ষ্য করিয়াছিলেন। বিবাহের পর হইতেই

প্রেমের জয়।

রমেশচন্দ্র বিষাদপ্রবণ ও চিন্তান্বিত হইতে লাগিলেন; অল্পদিনে অকালগাম্ভীর্য্য তাঁহার প্রকৃতি-সহচর হইয়া দাঁড়াইল। রমেশ-চন্দ্র সে বিষয়ে বন্ধুকে কিছু বলেন নাই; কাযেই যোগেন্দ্রনাথও সে কথার আলোচনা করেন নাই।

এই ভাবে তিন বৎসর কাটিল। রমেশচন্দ্রের প্রফুল্ল মুখে বিষাদচ্ছায়া স্থায়ী হইয়া দাঁড়াইল। তৃতীয় বর্ষে রমেশচন্দ্র বার্ষিক পরীক্ষায় সফল হইতে পারিলেন না। পর বৎসর পরীক্ষার অব্য-বহিত পূর্ব্বে রমেশচন্দ্র পীড়িত হইয়া অনেকদিন কষ্ট পাইলেন। বড় দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "এবার পরীক্ষা দিও না।" মা বলিলেন, "তোর শরীর বড়, না পড়া বড়? এবার আর পড়িস্ না।" রমেশচন্দ্র কোন উত্তর দিলেন না। একদিন সন্ধ্যার পর বন্ধুর গৃহে যাইয়া যোগেন্দ্রনাথ দেখিলেন, রমেশচন্দ্র পাঠ্য পুস্তক পাঠে রত। যোগেন্দ্রনাথ পুস্তকখানি লইয়া বন্ধ করিয়া বলিলেন, "তুমি তবুও পড়িবে? শরীর নষ্ট করিয়া পড়া কেন?"

রমেশচন্দ্র বলিলেন, "দেখি যদি সফল হইতে পারি।"

"অসুস্থ শরীরে শ্রম করিও না। পরীক্ষায় সফল হওয়াই কি জীবনের চরম উদ্দেশ্য?"

"তাহা যে নহে তাহা তুমি জান, আমিও জানি। কিন্তু সাধারণ লোকে বলিবে, সফল হইব বলিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি, সফল হওয়া চাহি।"

"জগতের ইতিহাসে কি অনেক স্থলে সমুজ্জ্বল সাফল্য অপেক্ষা অবনত অসাফল্যের গৌরব অধিক নহে?"

"সে সব অল্প সংখ্যকের জন্য। জগতে সাফল্যই সব। জগতে যে সফলকাম তাহার দোষও লোকে ক্ষমা করে, যে বিফল-মনোরথ তাহার গুণ কেহ লক্ষ্য করে না। সামান্য সফলতার পুরস্কার যশঃ, অসাফল্যের ফল সর্ব্বত্রই লোক নিন্দার নিষ্ঠুর দংশন।"

"তুমি বড় বিষাদপ্রবণ হইয়া উঠিতেছ।"

"তুমি অসাফল্যের যাতনা বুঝ না। আমি একবার অকৃত-কার্য্য হইয়াছি। এবার অকৃতকার্য্য হইলে কয়জন বিশ্বাস করিবে, আমি সত্যই অসুস্থ? লোকে তাহা বুঝিবে কেন?"

রমেশচন্দ্রের কণ্ঠস্বর বিষাদবিকম্পিত। যোগেন্দ্রনাথ বন্ধুর মুখের দিকে চাহিলেন। তিনি বুঝিলেন, একথা কল্পনা-প্রসূত নহে। কেহ রমেশচন্দ্রের হৃদয়ে এ সন্দেহ-শেল বিদ্ধ করিয়া দিয়াছে।

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "রমেশ, তুমি অসুখী।"

রমেশচন্দ্র অস্বীকার করিতে পারিলেন না।

যোগেন্দ্রনাথ সহানুভূতিসিক্ত স্বরে বলিলেন, "সংশোধনের কি কোন উপায় নাই?"

"না। সে কথা আর আমাকে জিজ্ঞাসা করিও না।" রমেশচন্দ্র মুহূর্ত্তের জন্য করপুটে মুখ আবৃত করিলেন, তাহার পর অন্য প্রসঙ্গের আলোচনা আরম্ভ করিলেন।

প্রেমের জয়।

সেইদিন হইতে যোগেন্দ্রনাথ আর সে কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই। বন্ধুর গোপনীয় কথা জানিয়া তাহা কর্ণান্তর না করা যেমন বন্ধুর কার্য্য, বন্ধুর কোন গোপনীয় কথা জানিতে ব্যগ্র না হওয়াও তেমনই প্রকৃত বন্ধুর কার্য্য। যে বন্ধুত্বের সুযোগে বন্ধুর গোপনীয় কথা জানিতে ব্যগ্র হয়, সে বন্ধুত্বের ব্যভিচার করে,—তাহাকে বিশ্বাস করিও না।

শৈলবালার সহিত যোগেন্দ্রনাথের বিবাহে রমেশচন্দ্রের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ দৃঢ়তর হয়। রমেশচন্দ্রের মাতা বড় পাকা গৃহিণী ছিলেন; তাঁহার গৃহিণীপনা-গুণে বালিকা শৈলবালা তাঁহার সংসারের অনেক কথাই জানিতে পারে নাই। যাহা জানিতে পারিয়াছিল তাহাও সে স্বতঃপ্রবৃত্তা হইয়া প্রকাশ করে নাই, কারণ তাহার জ্যেঠাইমা (রমেশচন্দ্রের মাতা) তাহাকে তিনটি উপদেশ দিয়াছিলেন,—স্বামীকে দেবতার মত ভক্তি করিও, সহ্য করিও, ঘরের কথা অপরের কাণে দিও না। তবে কথাবার্ত্তায় যোগেন্দ্রনাথ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, রমেশের পত্নীকে লইয়া রমেশের মাতা বা রমেশ কেহই সুখী নহেন।

তাহার পর কয়বৎসর কাটিয়া গিয়াছে—শৈল বহুবার জ্যেঠাই-মার কাছে গিয়াছে। প্রতিবারেই সে রমেশচন্দ্রের পত্নীর ব্যবহারে মর্ম্মাহতা হইয়া আসিয়াছে। সংসারের সব বুঝিতে রমণীর বিলম্ব হয় না। শৈল বুঝিয়াছে, তাহার জ্যেঠাইমার গৃহিণীপনাগুণেই এখনও রমেশচন্দ্রের সংসার ঠিক আছে।

রমেশচন্দ্রের পত্নীর সহিত ঘর করা অপর কাহারও পক্ষে দুঃসাধ্য। যোগেন্দ্রনাথও কতকটা বুঝিয়াছিলেন; কিন্তু দুই বন্ধুতে কখনও সে সব কথা হয় নাই।

* * * * *

রমেশচন্দ্র সুরেন্দ্রনাথকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "আজ কাল ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা হইতেছে; সম্ভবতঃ তাহাই হইবে। যাহা হউক, সাবধানে থাকিবেন। কাল না দেখিয়া ঠিক বলিতে পারিব না।"

যোগেন্দ্রনাথ ঘরের বাহিরে আসিয়া রমেশচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভয়ের কোন কারণ নাই ত?"

রমেশচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "সামান্য জ্বর হইলেও যদি ভয় করিতে হয়, তবে আর জগৎ চলে না। সামান্য পীড়াতে তোমার ভয় দেখিয়া হাসি পায়। ভয়ের কারণ মাত্র নাই। কেবল কথা এই, অসাবধান হইলে ভুগিবার সম্ভাবনা।"

বহুক্ষণ যোগেন্দ্রনাথের সহিত গল্প করিয়া, ভাগিনেয়দিগের সহিত খেলা করিয়া রমেশচন্দ্র বিদায় লইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ছায়া ঘনীভূত।

সুরেন্দ্রনাথ আপনার পীড়া তুচ্ছ জ্ঞান করিলেন। বিশেষ রমেশচন্দ্র যখন পীড়া ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন, তখন তিনি আর সাবধান হওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিলেন না। গরমে থাকা দূরে থাকুক—রাত্রিতে ঠাণ্ডাও লাগিল। পরদিন প্রভাতে রমেশচন্দ্র আসিয়া জানিলেন, রোগী বক্ষে বেদনা অনুভব করিতেছেন। রমেশচন্দ্র বলিলেন, "আপনি নিশ্চয়ই ঠাণ্ডা লাগাইয়াছেন।" সুরেন্দ্রনাথ অস্বীকার করিতে পারিলেন না।

রমেশচন্দ্র তিরস্কার করিলেন,—ডাক্তার বয়োকনিষ্ঠ হইলেও তাঁহার রোগীকে তিরস্কার করিবার অধিকার থাকে। বুদ্ধিমান চিকিৎসক মাত্রেই এই ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করেন। ক্ষমতা মূলধন; তাহার ব্যবহারে মিতব্যয়িতা আবশ্যক। যিনি মিতব্যয়িতা সহকারে তাহার ব্যবহার করিতে পারেন, তিনিই তাহার সদ্ব্যবহার করেন; তিনিই ক্ষমতাশালী হইয়া দাঁড়ান।

রমেশচন্দ্র বলিলেন, "বোধ হয় দিনকতক ভুগিতে হইল। বক্ষে ঠাণ্ডা লাগিয়াছে। পাছে ঠাণ্ডা লাগে, এই ভয়ে আমি কল্যই সাবধানে থাকিতে বলিয়াছিলাম।"

সুরেন্দ্রনাথ নিতান্ত অপরাধীর মত নীরবে ভ্রাতার বন্ধুর তিরস্কার সহ্য করিলেন। কিন্তু তাহাতে যে বিশেষ ফল হইল, এমন বোধ হয় না।"

যাহা হউক যোগেন্দ্রনাথ স্থির করিলেন, এবার দাদাকে জোর করিয়া নিয়মে রাখিতে হইবে। তিনি তদনুসারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

সেই দিন সন্ধ্যায় জ্বর আরও প্রবল হইল। রমেশচন্দ্র সন্ধ্যার পর আবার আসিলেন, বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিলেন; আরও সাবধানে থাকিবার ব্যবস্থা করিলেন। সুরেন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, "রোগে যেটুকু রাখিত, তোমার সাবধানের অত্যাচারে সেটুকুও যাইবে।"

রমেশচন্দ্র উত্তরে বলিলেন, "রোগ যেটুকু লইত, আমি সেইটুকু রাখিব,—তাহাকে লইতে দিব না।"

বাস্তবিকই অসাবধানতার ফলে সুরেন্দ্রনাথকে ভুগিতে হইল। জ্বর প্রবল হইল; ফুসফুসে অসুস্থতা উপস্থিত হইল। যোগেন্দ্রনাথ অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। রমেশচন্দ্র সুরেন্দ্রনাথের গৃহেই অধিকাংশ সময় কাটাইতে আরম্ভ করিলেন। তিনি জানিতেন, ভয়ের বিশেষ কারণ নাই; কিন্তু তিনি কাছে থাকিলে যোগেন্দ্রনাথের সাহস থাকে; তাই তিনি প্রায়ই সেখানে থাকিতেন।

সুরেন্দ্রনাথের এই পীড়ার সময় আর একজন অক্লান্ত প্রাণে

তাঁহার সেবা করিতে লাগিল। নলিনী সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া দিবারাত্রি তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিল। সে সুদীর্ঘকাল রোগজীর্ণা জননীর সেবা করিয়া রোগীর শুশ্রূষায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিল। এবার তাহার সেই অসাধারণ পারদর্শিতা লক্ষ্য করিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন। রোগীকে যথাকালে ঔষধ ও পথ্য দান, তাপ দেওয়া প্রভৃতি সকল কার্য্য সে সুচারুরূপে সম্পন্ন করিত। কোন কায তাহাকে একবারের অধিক বলিতে হইত না।

নলিনীর এই প্রশংসার্হ সেবা শুশ্রূষা-পর্য্যবেক্ষণ-নিপুণ রমেশচন্দ্রের নিকট একটু কেমন ঠেকিত। রমেশচন্দ্র একদিন যোগেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার দাদার শ্যালিকা অল্পদিন এখানে আসিয়াছেন না?" আর একদিন স্পষ্ট বলি-লেন, "যোগেন তুমি ও আমি ত প্রায় সর্ব্বদাই রোগীর কাছে থাকি, বৌদিদিও থাকেন, তবে আর বৌদিদির ভগিনীর থাকিবার আবশ্যক কি? দিনরাত মাথা গুঁজিয়া বসিয়া থাকিলে উঁহারও কষ্ট হয়, উনি থাকিলে আমাদেরও কেমন সঙ্কোচ বোধ হয়।

বন্ধুর কথা শুনিয়া যোগেন্দ্রনাথ দেখিলেন, নলিনীর অক্লান্ত সেবা যতই প্রশংসার যোগ্য হউক, তাঁহার কাছে তেমন ভাল লাগে না। তখন তিনি আপনার অভ্যস্ত চিত্তবৃত্তি-বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইলেন—এরূপ সেবা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। অথচ

আমার ভাল লাগে না; কেন? সম্ভবতঃ আমি ঈর্ষ্যানল-দগ্ধ। অপর একজন আমার ভ্রাতার সেবা করিতেছে; সে দাদার কৃতজ্ঞতাভাজন হইবে; সে আমার অপেক্ষাও তাঁহাকে অধিক যত্ন করিতেছে—এসব আমার ভাল লাগে না। বোধ হয় ইহা ঈর্ষ্যার নামান্তর মাত্র। ঈর্ষ্যা ত্যজ্য। তাহার কবল হইতে মুক্তি পাইবার চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য। ইত্যাদি—

যোগেন্দ্রনাথ যতই দার্শনিকজনোচিত চিন্তা করুন না কেন, মনোভাব লুপ্ত করিতে পারিলেন না।

যোগেন্দ্রনাথ যাহা ভাবিয়াছিলেন, শৈলও তাহাই ভাবিয়াছিল। কিন্তু শৈল স্বামীকে সে কথা বলে নাই,—পাছে স্বামী কিছু মনে করেন। কিন্তু যুবক যুবতীর মনোভাব-গোপন দুঃসাধ্য; তাহাদের ব্যবহারের কাচের আবরণের মধ্য দিয়া তাহা সহজেই লক্ষিত হয়। কথায় বার্ত্তায় যোগেন্দ্রনাথ বুঝিলেন, নলিনীর এই প্রশংসনীয় ব্যবহার শৈলবালারও কেমন নূতন ও অসাধারণ বলিয়া বোধ হইয়াছে। তখন তিনি রমেশের কথা তাহাকে বলিলেন। শুনিয়া শৈল বলিল, "আমি কিছু বলিতে পারিব না। তিনি কি মনে করিবেন? তাঁহার কথা লইয়া তোমরা এত আলোচনা করিয়াছ জানিলে, তিনি নিশ্চয়ই লজ্জিতা হইবেন।"

প্রায় এক পক্ষকাল জ্বরভোগ করিয়া সুরেন্দ্রনাথ জ্বরমুক্ত হইলেন। তখন শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল। দেহে আর সে পূর্ব্ব

শ্রী নাই। সবল সুরেন্দ্রনাথ যেন দুর্ব্বল শিশু হইয়া পড়িয়াছেন। রমেশচন্দ্রের পরামর্শে তিনি আফিসে ছুটি বাড়াইবার দরখাস্ত করিলেন। রমেশচন্দ্র বলিলেন, "এখনও একমাস কাল সাবধানে থাকিতে হইবে। তাহার পর বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য অন্যত্র যাওয়া যুক্তিযুক্ত। তাহা হইলে শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ হইবে; নহিলে সারিতে বিলম্ব হইবে।"

*   *   *   *   *   *

সন্দেহ কুমুদিনীর স্বভাববিরুদ্ধ। নহিলে বহুদিন পূর্ব্বেই শৈলবালা যাহা লক্ষ্য করিয়াছিল, সর্ব্বাগ্রে কুমুদিনীর তাহা লক্ষ্য করা সম্ভব হইত। সুরেন্দ্রনাথের পীড়ার সময় নলিনী সর্ব্বদাই চিন্তান্বিতা—অন্যমনস্কা থাকিত। সহসা তাঁহার কোন প্রসঙ্গ হইলে সে চমকিয়া উঠিত, যেন সে সহসা বিদ্যুৎস্পর্শে বিচলিতা হইয়াছে। সুরেন্দ্রনাথের পীড়ার সময় সে রোগীর শয্যাপার্শ্ব ত্যাগ করিয়া কোথাও অধিকক্ষণ থাকিতে পারিত না।

কুমুদিনী তাহা দেখিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি তাঁহার সরল হৃদয়ে সন্দেহের ছায়াপাত হইতে দেন নাই। এক একবার তাঁহার নিকট ভগিনীর এরূপ ব্যবহার বিসদৃশ বোধ হইলে তিনি আপনাকে ধিক্কার দিতেন; ভাবিতেন,—যদি ভগিনীকে বিশ্বাস করিতে না পারিব, তবে আর কাহাকে বিশ্বাস করিব? তিনি মনে করিলেন, স্বামীকে সন্দেহ করিব? যে দিন স্বামীর উপর আমার বিশ্বাস যাইবে, সেই দিনই যেন আমার মৃত্যু হয়।

প্রেমের যে আকুলতা সন্দেহসহচর,—যাহাতে নিত্য সন্দেহ, নিত্য শঙ্কা, নিত্য ভয়,—সেই আকুলতা কুমুদিনীর প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ছিল। নিত্য অভিমান-স্ফুরিতাধরা যুবতীর যে প্রেম পতির হৃদয়ের সর্ব্বস্ব পাইয়াও পিপাসাতুর; যে প্রেম খরবাহিনী তরঙ্গিনীর মত কিছুতেই তৃপ্তি লাভ করে না; যে প্রেমের প্রখরতাই তাহার মাধুরী; যে প্রেম বাঞ্ছিতকে মুহূর্ত্তের জন্য চক্ষের অন্তরাল করিতে চাহে না; যে প্রেমের প্রভাবে বাঞ্ছিতের নয়ন-কিরণে জগতে সহস্র শোভা বিকশিত হইয়া উঠে,—জীবনকুঞ্জে বসন্তের আবির্ভাব হয়; যে প্রেমের স্পর্শে বাঞ্ছিতের আদরে সোহাগে হৃদয়ের প্রতি তন্ত্রী আনন্দাতিশয্যে বাদকের অঙ্গুলীস্পর্শ-বিহ্বল বীণাতন্ত্রীর মত চঞ্চল হইয়া উঠে—আর সেই আদর সোহাগের অভাবে জগৎ মরুবৎ প্রতীয়মান হয়; সে প্রেম কুমুদিনীর প্রকৃতির মত প্রকৃতিতে পুষ্ট হইতে পারে না। সে প্রেমের বর্দ্ধন-জন্য অন্যবিধ হৃদয়ের আবশ্যক।

কুমুদিনীর প্রেম গভীর ও গম্ভীর। পুণ্য সাগর সঙ্গমে বিস্তীর্ণা স্রোতস্বিনী যখন সাগরে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করে, পশ্চাতে ফিরিয়াও চাহে না, আপনার জন্য সামান্য সঞ্চয়ও রাখে না, তাহার সেই সময়ের মাধুরী কুমুদিনীর প্রেমের সৌন্দর্য্যের সহিত উপমেয়। সে প্রেম চাঞ্চল্য-বিহীন; সে প্রেম সর্ব্বস্ব দান করে, প্রতিদান প্রত্যাশা করে না; সে প্রেম হৃদয় দিয়াই তৃপ্তিলাভ করে; সে প্রেম চাপল্য-বর্জ্জিত, সন্দেহ-শূন্য। সে

প্রেমের জয়।

প্রেম ভক্তির নামান্তর মাত্র। সে প্রেমের স্পর্শে বাঞ্ছিতের দোষ ও গুণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সে প্রেম যাহার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত সে বাঞ্ছিকে দেবতারূপে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আপনি উপাসিকা হইয়া সুখলাভ করে। তাই যে দিন তিনি আপনার মনে সন্দেহের ছায়াপাত-সম্ভাবনা বুঝিতে পারিলেন, সেই দিন কুমুদিনী আপনাকে ধিক্কার দিয়া বলিলেন, "স্বামীর উপর যে দিন আমার সন্দেহ হইবে, সেই দিনই যেন আমার মৃত্যু হয়। হে দেবতা, স্বামীতে আমার ভক্তি যেন অচলা থাকে। তিনি দেবতা ; আমি উপাসিকা মাত্র।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

অদৃষ্ট।

মানব-হৃদয়ের মত জটিল ব্যাপার বোধ হয় আর নাই। যেমন সূর্য্যাস্তের রক্তরাগরঞ্জিত পশ্চিম গগনের মেঘমালা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নূতন নূতন আকার ধারণ করে, তেমনই মানব হৃদয়েও মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নব নব ভাব জাগিয়া উঠে। মানব হৃদয়ে কোন্ বৃত্তির বিকাশে, কোন্ উদ্দেশ্যের উত্তেজনায়, কোন্ ঘটনার সংঘটনে, কোন্ স্বার্থের সিদ্ধিলাভ-সম্ভাবনায়,—কোন্ মুদিত কামনা কুসুমিত হইয়া উঠে—কোন্ ক্ষীণ প্রয়াস প্রবল হয়—কোন্ অন্ধকার ভাব ভাস্বর হইয়া উঠে তাহা কে বলিবে? মানবের কার্য্যসকল কোন সরল নিয়মের অধীনে আনা একান্তই অসম্ভব। মানব হৃদয় রহস্যকুহেলিকান্তরালবর্ত্তী—অজ্ঞাত—অজ্ঞেয়। সে সরল পথে যাইতে যাইতে যে স্থানে সহসা সে পথ ত্যাগ করিয়া কুটিল পথ অবলম্বন করে, সে স্থানে তাহার পথ ত্যাগের সম্ভাবনা ও সে জন্য বাধাগঠনের কথা বিচক্ষণ বর্ম্ম-নির্ম্মাতার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। মানব হৃদয়ে সহস্র চক্র আবর্ত্তিত। তাহার মধ্যে কোন্‌টির বেগ কখন্ কি হেতু প্রবল হইয়া উঠিবে, তাহা কে জানিতে পারে? মানব হৃদয়ে কখন্ কি ভাব স্ফুরিত হইয়া উঠে, তাহা কে বলিতে সক্ষম? কখন্ কি চিন্তায়

মানবের অন্তর পূর্ণ থাকে, তাহা কেহ বলিতে পারে না। ঘটনা-চক্রের আবর্ত্তনে ভাবাভিব্যক্তি—ফল, অনেক সময় অঘটন-ঘটন।

পৌষের অপরাহ্নে ম্লানতেজা পল্লবরাগতাম্র তপন যখন পশ্চিম দিগন্তে রক্তরশ্মিজাল সংহরণ করিবার আয়োজন করিতেছিল, তখন দুর্ব্বলদেহ সুরেন্দ্রনাথ শয্যায় শয়ন করিয়া একখানি সংবাদপত্র হস্তে লইয়া কি ভাবিতে ছিলেন, তাহা আমি কেমন করিয়া বলিব? সুরেন্দ্রনাথ শয্যায় শয়ন করিয়া ছিলেন; ভিন্নদেশজাত, উজ্জ্বলবর্ণ-বৈচিত্র্য-বহুল, কোমল কম্বলে তাঁহার দেহ আবক্ষ আবৃত। এখনও তাঁহার মুখে চক্ষে স্বাস্থ্য লাবণ্য প্রত্যাবৃত্ত হয় নাই। এখনও রমেশচন্দ্র প্রায়ই বলেন, "আপনি অন্যত্র, কোন স্বাস্থ্যপ্রদ স্থানে গমন করুন।" সুরেন্দ্রনাথ কখনও কলিকাতার বাহিরে গমন করেন নাই, তাই অন্যত্র গমন একটা বিরাট ব্যাপার বোধ করিয়া তাহার জন্য বিপুল আয়োজন করিতে ছিলেন; আয়োজন-বাহুল্যে এতদিন যাওয়া ঘটিয়া উঠে নাই। ঔষধ ও পথ্য উভয়েরই বিশেষ বাঁধাবাঁধি সত্ত্বেও তাঁহার শরীর আশানুরূপ সত্বর নষ্টস্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইতেছিল না। ইহা তাঁহার ভ্রাতা যোগেন্দ্রনাথের ও পত্নী কুমুদিনীর উৎকণ্ঠার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে প্রসঙ্গ উঠিলে সুরেন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিতেন, "বাঙ্গালীর 'বল, বুদ্ধি, ভরসা, চল্লিশ হ'লেই ফরসা।' আমার চল্লিশ হইয়াছে। দেহে আর সে তেজ নাই—কাযেই সারিতে বিলম্ব হইবে। সে জন্য চিন্তা

নাই।" উত্তরে রমেশচন্দ্র বলিতেন, "চল্লিশে সব শেষ সকলের নহে। আমার চল্লিশে কি হইবে? আপনি কখনও কোথাও যাইবেন না, কেবল বসিয়া বসিয়া যন্ত্রের মত আফিসের কায করিবেন; যাহা কিছু কায কেবল মস্তিষ্কের; অন্য কায কেবল লেখনীচালনা; কাযেই শরীর নিৰ্জ্জীব হইয়া পড়ে। নহিলে সত্যসত্যই আপনি আর বুড়া হয়েন নাই।"

শয্যায় শয়ন করিয়া সুরেন্দ্রনাথ যে সম্মুখে ধৃত সংবাদপত্র পাঠে নিবিষ্টচিত্ত ছিলেন না, তাহা যে কেহ তাঁহাকে লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারিত। বালক অঙ্কের খাতা খুলিয়া ছুটির কথা ভাবে, যুবক পাঠ্যপুস্তক লইয়া পত্নীর কথা ভাবে, বিষয়ী বৃদ্ধ হরিনামের মালা হস্তে লইয়া স্বার্থের কথা ভাবেন। বালকের খাতা, যুবকের পুস্তক ও বৃদ্ধের মালা উপলক্ষ মাত্র। সুরেন্দ্রনাথের সংবাদপত্রও সেইরূপ উপলক্ষ মাত্র। তিনি কি ভাবিতেছিলেন, তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু যখন জ্যেষ্ঠা কর্তৃক আদিষ্টা হইয়া নলিনী কি জিজ্ঞাসা করিতে তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিল, তখন তিনি তাহার পদশব্দে চমকিয়া কক্ষদ্বারে চাহিলেন।

কক্ষদ্বারে নলিনীকে দেখিয়া দুর্ব্বলদেহ সুরেন্দ্রনাথের নয়নের দৃষ্টি পরিবর্ত্তিত হইল। তাঁহার স্বাভাবিক কোমল দৃষ্টি সহসা অন্তর্হিত হইল। রবিকরোজ্জ্বল দিবসে মেঘলেশশূন্য নীলনভোমণ্ডলে উড্ডীয়মান পারাবতকে শ্যেন যে দৃষ্টিতে দেখে,

প্রেমের জয়।

সুরেন্দ্রনাথের স্বভাবতঃ শান্তদৃষ্টি-শ্রীশোভিত নেত্রে সেই দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিল।

যেমন প্রাচীমূলে তরুণ অরুণ বিকাশ দেখিয়া সরসী হৃদয়ে শতদল বিকশিত হইয়া উঠে, তেমনই আজ দ্বার-প্রান্তে নলিনীকে দেখিয়া সুরেন্দ্রনাথের সুপ্ত মনোভাব বিকশিত হইয়া উঠিল। ইতঃপূর্ব্বে নলিনীর অবস্থা বিবেচনা করিয়া তাঁহার মনে যে দয়ার উদ্রেক হইয়াছিল, হায়, সে জটিল দয়া আকর্ষণের নামান্তর মাত্র! শরীর সুস্থ থাকিলে মনও প্রকৃতিস্থ—শান্ত থাকে শরীর অসুস্থ হইলে মন অপ্রকৃতিস্থ—অস্থির হয়। দুর্ব্বলের পক্ষে মনোবৃত্তি-দমন—আত্মসংযম অধিকতর কষ্ট সাধ্য। পুরুষ ঝঞ্ঝা—রমণী মৃদুমলয়। পুরুষ আপনার গতিরোধে আপনি অসমর্থ—সে গতি ক্রমেই প্রবল হইয়া শেষে সর্ব্বধ্বংসী হইয়া দাঁড়ায়। রমণী আপনার গতি আপনি সংহরণ ও সংবরণ করিতে পারে। পুরুষের বাসনা প্রবল হইলে নিবারণ করা কঠিন। রমণীর বাসনা সহজে নিবারণ করা যায়; প্রাবল্য রমণীর প্রকৃতি বিরুদ্ধ। রমণী আপনাকে আপনি চালিত করে। পুরুষের বাসনা প্রবল হইলে সেই তাহাকে চালাইয়া লইয়া যায়। সুরেন্দ্রনাথ পুরুষ—সুরেন্দ্রনাথ দুর্ব্বল। তাঁহার হৃদয়ে যে সুপ্ত বাসনার বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল তাহার লোল জিহ্ব শিখা কিসে নির্ব্বাপিত হইবে; কি দাহ করিয়া তাহার ক্ষুধা মিটিবে?

বাসনার উত্তেজনা বড় ক্ষমতাশালিনী। বর্ষের চিন্তায় যাহা করা যায় না, মুহূর্ত্তের উত্তেজনায় তাহা একান্ত সহজ-সাধ্য হইয়া দাঁড়ায়। মুহূর্ত্তের উত্তেজনায় যে কথা বলা যায়, যে কর্ম্ম করা যায়, বহুবর্ষব্যাপিনী চিন্তায় সে কথা কহা যায় না, সে কার্য্য করা যায় না। অনেক সময় মুহূর্ত্তের উত্তেজনাবশে কথিত কথার ও কৃত কর্ম্মের ফল জীবনব্যাপিনী চেষ্টায় নিরাকৃত হয় না। সুরেন্দ্রনাথ—স্বভাবতঃ ধীর, স্নিগ্ধ স্নেহশীল, কর্ত্তব্য-পরায়ণ সুরেন্দ্রনাথ বাসনার উত্তেজনায় মুহূর্ত্তে যাহা করিলেন, সে উত্তেজনা না থাকিলে তাঁহার পক্ষে কখনও তাহা করা সম্ভব হইত না। জীবনে তাহার ফলভোগ নিবারিত হইবার নহে। বাসনার এই উত্তেজনা যেন তাঁহার প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছিল। তিনি আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে যাহা বলিলেন, নলিনীর কর্ণে তাহা অমৃতবৎ প্রতীয়মান হইল। আবেগ-রাগরঞ্জিত-আনন,—লজ্জানতদৃষ্টি সুরেন্দ্রনাথকে দেখিয়া তাহার মনে হইল, যেন তাহার জীবন-দেবতা আজ সেই মূর্ত্তিতে তাহার সম্মুখীন হইয়া বরাভয় দান করিতে চাহিতেছেন। সে কি সাধ করিয়া সুধাভাণ্ডে পদাঘাত করিবে?

সেচনসিক্ত ক্ষেত্রে বীজ সহজেই অঙ্কুরিত হয়। নানা ঘটনায় নলিনীর হৃদয় পূর্ব্বেই যেরূপ হইয়া ছিল, তাহাতে তাহার পক্ষে জীবনব্যাপিনী জ্বালার সম্ভাবনা-দ্বার মুক্ত হইয়াই ছিল; কেবল বহির্ব্বাহী কেহ দ্বারপ্রান্তে দেখা দেয় নাই। আজ

প্রেমের জয়।

অপ্রত্যাশিত দিক্ হইতে, অতর্কিত ভাবে বহ্নিবাহী আসিয়া দেখিল,—দ্বারমুক্ত।

চিরাগত বিশ্বাস ও ধর্ম্মভীতির যে বন্ধন তাহাকে পবিত্রতার মন্দিরবাসিনী করিয়া রাখিয়াছিল, পূর্ব্বে সে সেই বন্ধন গৌরবের অলঙ্কার বলিয়া বিবেচনা করিত, ইদানীং যৌবন-চাপল্য-প্রসূত দুশ্চিন্তাতাড়িতা হইয়া সে সেই বন্ধন নিষ্ঠুর আয়স-শৃঙ্খল বলিয়া মনে করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। আজ বাসনা-বেগে তাহার সে বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। সে সেই আশ্রয়-মন্দির ত্যাগ করিয়া রৌদ্রতপ্ত—ছায়াহীন—উপলবিষম প্রান্তরে আসিয়া দাঁড়াইল। ছায়া-স্নিগ্ধ আশ্রয় ত্যাগ করিয়া নিরাশ্রয় হইল। মন্দির-মধ্যে থাকিয়া সে বাহিরে ছায়ালোক-ক্রীড়া-মধুর, বিহগ-বিরাবিত, পুষ্পিত-দ্রুম-লতাচ্ছাদিত, মন্দানীল-বীজিত, উৎসারিত-সুখ-উৎস-সিঞ্চিত জগতের কল্পনা করিয়া-ছিল। জগতে কে আপনার অদৃষ্টে সন্তুষ্ট? সেই কল্পনা ক্রমে প্রবল হইয়া তাহার সমস্ত হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। আজ তাহারই প্ররোচনায় সে মন্দির ত্যাগ করিল। পশ্চাতে ফিরিবার পথ রুদ্ধ হইয়া গেল। সে "সুধাভাণ্ড" পদাঘাতে চূর্ণ করিতে পারিবে না।

তাহার নয়নে অশ্রু দেখা দিল। সে অশ্রু আনন্দের, না দুঃখের, না তদুভয়ের মিশ্রণোৎপন্ন?

সুরেন্দ্রনাথ কম্পিত করে নলিনীর হস্তধারণ করিলেন।

পবনস্পর্শে যেমন বিটপীর সহস্র পত্র চঞ্চল হইয়া উঠে, তেমনই সেই করস্পর্শে তাহার শত শিরা উপশিরায় রক্তস্রোতঃ চঞ্চল হইয়া উঠিল। আজ একবার শেষবার তাহার ইচ্ছা হইল, পশ্চাতে মুক্ত-দ্বার-পথে পলায়ন করে। কিন্তু হায়—তখন তাহার হৃদয় মন্দিরে পুণ্য-দেবতা বেদীচ্যুত, ধূল্যবলুণ্ঠিত—বিভগ্নাঙ্গ। সে আর পলাইতে পারিল না। পূর্ব্বের পরিচিত জীবন হইতে সে আজ ভিন্ন হইয়া পড়িল,—সে আজ অপরিচিত পথের পথিক।

* * * * * * *

এদিকে ভগিনীর প্রত্যাবর্ত্তনে বিলম্ব দেখিয়া কুমুদিনী ভাবিলেন, বুঝি নলিনী কার্য্যান্তরে ব্যাপৃতা হইয়াছে। সে সংসারের সব কায আপনি করিতে পারিলেই যেন সুখী হয়। তিনি যাহা জানিবার জন্য নলিনীকে সুরেন্দ্রনাথের নিকট পাঠাইয়াছিলেন, নলিনীর প্রত্যাবর্ত্তনে বিলম্ব দেখিয়া স্বয়ং তাহা জানিতে চলিলেন।

তিনি কক্ষদ্বারে উপনীত হইয়া দেখিলেন, নলিনী সুরেন্দ্র-নাথের শয্যায় বসিয়া আছে। পশ্চিমের দ্বার-পথে অস্তরবির রক্তকিরণ তাহার লজ্জারক্ত আননে পতিত হইয়াছে। সুরেন্দ্র-নাথের করতলে তাহার করতল স্থাপিত। তাহার চক্ষে অশ্রু, কিন্তু সেই সজল চক্ষে শরতের বর্ষণলঘু, স্বচ্ছ, শুভ্র অভ্রান্তরাল-বর্ত্তী রবিকরের মত আনন্দকিরণ যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে।

কুমুদিনী ভগিনীর আননে ও নয়নে আপনার অদৃষ্টলিপি-পাঠ করিলেন। তিনি যেন বজ্রাহতার মত নির্ব্বাক্, নিষ্কম্প, নিশ্চল—হইলেন। যেন অসহনীয় বেদনায় তাঁহার হৃৎপিণ্ড নিশ্চল হইয়া গেল। তাহার পর তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ফিরিলেন। সে দীর্ঘশ্বাসে কি বেদনা, কি যাতনা ব্যক্ত হইল!

কুমুদিনী যখন ফিরিয়া যাইতেছিলেন, যোগিনীমোহন তখন বারান্দায় খেলা করিতেছিল। সে দেখিল; জ্যেঠাইমার মুখ অন্ধকার। সে ছুটিয়া যাইয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল; ডাকিল,—"জ্যেঠাইমা!" কুমুদিনী বালককে তপ্ত বক্ষে তুলিয়া লইলেন; তাহার মুখচুম্বন করিলেন। তখন উৎসমুক্ত বারিধারার মত অশ্রু ঝরিল। যোগিনীমোহন কিছুই বুঝিতে পারিল না; নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল।

দ্বিতীয় খণ্ড

বান।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দুঃখের আস্বাদ।

সুখে হউক, দুঃখে হউক দিন যায়—থাকে না। সময়ের ফুৎকারে মানব ধূলির মত ইতস্ততঃ চালিত হয়। মানবের সুখ-দুঃখে কালের কি? পদদলিত আনুবীক্ষণিক কীটও তোমারই মত প্রকৃতির সযত্ন গঠিত। তাহার দেহে প্রকৃতির কি বিবেচনা, কি বুদ্ধি, কি ধৈর্য্য প্রকটিত! সেও প্রাণী। তাহার সুখদুঃখে তোমার কি? তবে তোমার সুখদুঃখে কাল ফিরিয়া চাহিবে কেন? সে সর্ব্বজয়ী,—পলকে প্রলয়োৎপাদনক্ষম, যাহার উদ্দেশে জীব প্রণাম করে—সেই বিরাট কাল মুহূর্ত্তের মানবের সুখ-দুঃখে বিচলিত হইবে, ইহাও কি সম্ভব? তাই সুখে হউক, দুঃখে হউক, দিন যায়; থাকে না। সারারাত্রি কাঁদিয়া কুমুদিনীর দুঃখের রজনী পোহাইল, দুঃখের দিবার আরম্ভ হইল। জগতে দুঃখীর জন্য কে কাতর? সে দুঃখ-নিশায় জননী প্রকৃতিও কুমুদিনীর অশ্রুবিপ্লাবিত নয়নে আপনার স্নেহৌষধি—নিদ্রা দান করেন নাই।

কল্যও এমনই নিশা প্রভাত হইয়াছিল। কিন্তু সে প্রভাতে আর এ প্রভাতে কি প্রভেদ! সংসারের সুখ নিতান্তই জলের বিম্ব—বাতাসের ভার সহে না। আজও তেমনই পূর্ব্বদিক্‌চক্র-

বালে রক্তরাগ দিয়া কিরণ-কিরীটী মহাদ্যুতি অরুণ-সারথী একচক্ররথে নিশার রাজ্যে সমুদিত। আজও তেমনই উষানিল-বীজনে বিহগ-কণ্ঠে কলকাকলী ধ্বনিত। আজও তেমনই নিশাপগমে জীবজগৎ জাগরিত। জড়জগতে—জগতে পরিবর্ত্তন কোথায়? পরিবর্ত্তন মনে। হৃদয়-দর্পণে বিষাদের ছায়া পড়িলে আর কোন প্রতিবিম্বই স্পষ্ট, সমুজ্জ্বল, পরিস্ফুট হয় না। অশ্রুআবিল লোচনে দৃষ্ট পদার্থ ঔজ্জ্বল্যহীন—মলিন দেখায়। কুমুদিনীর নয়নে আজ জগৎ শ্রীহীন, মলিন; তাঁহার নিকট জীবন সুখলেশহীন, ভারমাত্র।

অদ্য যে আপনাকে সর্ব্বসুখে সুখী ভাবিয়া গর্ব্বিতা, কল্য যদি তাহার সে গর্ব্ব চূর্ণ হইয়া যায়, তবে তাহার জীবনে আর কি সুখ থাকে? অদ্য যে সংসারের সর্ব্বসুখসম্পৎশালিনী, কল্য যদি মুহূর্ত্তে তাহার সে সম্পদ্‌ভাণ্ডার বিলুপ্ত হইয়া যায়, তবে তাহার জীবনে বেদনা ব্যতীত আর কি থাকে? আজ যাহার সব আছে, কাল যদি তাহার সব যায়, তবে সে আর কি সুখে বাঁচিয়া থাকে? রমণীর সুখ বল, ঐশ্বর্য্য বল, গর্ব্ব বল, সবই স্বামীতে। পতির প্রেমবঞ্চিতা নারী মুকুট-মণ্ডিতা রাজেন্দ্রাণী হইলেও ভিখারিণীর অধিক দুঃখিনী। যে রমণী স্বামীর ভালবাসা হারায়, তাহার আর কি থাকে? কাল কুমুদিনীর সব ছিল; আজ তাহার কিছুই নাই। কাল জীবনে সুখ ছিল, হৃদয়ে আনন্দ ছিল, সংসারে আকর্ষণ ছিল। আজ আছে, জীবনে

জ্বালা, হৃদয়ে বেদনা, নয়নে অশ্রু। তাই বলিয়াছি, সে প্রভাতে আর এ প্রভাতে কি প্রভেদ!

সংসারে দুঃখে জ্বালায় রমণী মনে করে, পতির প্রেমৌষধে হৃদয়ক্ষত দূর হইবে, তপ্ত হৃদয় জুড়াইবে। তাহার পর সে আশায় হতাশ হইলেও রমণী আর এক আশা অবলম্বন করে। মজ্জমান ব্যক্তি সলিলোপরি প্লবমান তৃণখণ্ড অবলম্বন করিয়া জীবন-রক্ষার আশা রাখে। সে ভাবে, সন্তান হইতে এ দুঃখ ঘুচিবে; হৃদয়ের ব্যথা অপনীত হইবে। সন্তানের সুখস্পর্শ-লাভাশায় রমণী কি না দিতে পারে? কুমুদিনীর সন্তান ছিল না। দেবর যোগেন্দ্রনাথের পুত্রদিগকেই তিনি অপত্যস্নেহে পালন করিয়াছিলেন। আজ এই বিষম বেদনায় তিনি তাহাদিগকে বক্ষে টানিয়া লইলেন। কিন্তু তপ্তবক্ষ জুড়াইল কি? মরুময় হৃদয় উর্ব্বরতালাভ করিল কি? জ্বালার শান্তি হইল কি? একের অভাব কি অন্যে পূর্ণ হয়? হইলে সংসারের শত আকর্ষণে লোক শোক ভুলিত; মহাশোক মানবের পক্ষে অজ্ঞাত রহিত। শত কার্য্যের মধ্যেও অতীত শোক হৃদয় দাহ করে। একের অভাব অন্যে পূর্ণ হয় না।

নলিনী আসিল না। যেমন সূর্য্যমণ্ডল নিবিড় জলদাবৃত হইলে সমস্ত প্রকৃতিতে বিষাদের ছায়াপাত হয়, তেমনই কুমুদিনীর এই অদৃষ্ট-পরিবর্ত্তনে সংসারে দুঃখের ছায়া পড়িল। শিশুরা কিছুই বুঝে না; তাহারা দেখিল, জ্যেঠাইমা কাঁদিতে-

ছেন,—মার মুখ ভার,—পিতা চিন্তাকুল। মোহিনী একবার জ্যেঠাইমার গলা জড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "জ্যেঠাইমা, কাঁদিতেছ কেন?" কুমুদিনীর অশ্রুর উৎস দ্বিগুণ বহিল। তিনি চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিলেন. "ও কিছু নহে, বাবা।" বালক যাইয়া জননীকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা, কি হইয়াছে?" শৈলবালা উত্তর করিল, "তোমাকে তাহা শুনিতে নাই।" জ্যেঠামহাশয় তাহাদের খেলার সাথী। যোগেন্দ্রনাথ বালকদিগকে তাঁহার কাছে যাইতে নিষেধ করিয়া দিলেন। যোগিনী জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, জ্যেঠামহাশয়ের কি অসুখ করিয়াছে?" যোগেন্দ্রনাথ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন। মোহিনী ও যোগিনী পরস্পরের দিকে চাহিল। খেলা ভাল লাগে না। দুই জনে একস্থানে বসিয়া রহিল। তাহারা বুঝে না, কি হইয়াছে, বুঝে না, কাহার দোষে, কেন গৃহে এ পরিবর্ত্তন। কিন্তু গৃহে বিষাদের যে ছায়া পড়িয়াছে, তাহা তাহাদের তরুণ হৃদয় স্পর্শ করিল।

যোগিনীমোহন প্রথম হইতেই নলিনীর সহিত সদ্ভাব সংস্থাপন করিতে পারে নাই। নলিনীর সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও সে তাহার কাছে যাইতে চাহিত না। লোকে কথায় বলে, শিশুরা বড় বিজ্ঞ। কবি বলেন, শিশু স্বর্গ-রাজ্য হইতে নবাগত, সে রাজ্যে কি জ্ঞানের অভাব আছে? আমরা বয়োবৃদ্ধি সহকারে সে স্বাভাবিক জ্ঞান সম্পদ্ হারাই; মর্ত্ত্যের মানব হইয়া পড়ি। এ সবই কথার কথা। কিন্তু অনেক স্থলে দৃষ্ট হয়, পশু যেমন

সহজাতসংস্কার বশে বিপদ্‌পথ ত্যাগ করে—শিশুও তেমনই স্বভাবতঃ দুশ্চিন্তাপ্রবণদিগকে পরিহার করে, তাহাদের মুখ দেখিলে কাঁদিয়া আকুল হয়। কেহ শিশুকে লইতে না চাহিলেও শিশু তাহার কাছে যাইতে আগ্রহ প্রকাশ করে, কেহ মিষ্টান্নের লোভ দেখাইয়াও শিশুকে ক্রোড়ে লইতে পারে না। যোগিনী-মোহন নলিনীকে সুরেন্দ্রনাথের কক্ষে যাইতে দেখিয়াছিল। সে গোপনে দাদাকে বলিল, "দাদা, এ মাসীমার দুষ্টামী। মাসীমা কিছু করিয়াছে।" মোহিনীমোহন দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল, তাহার নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল। যে গৃহে শিশু দুঃখে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে, সে গৃহে লক্ষ্মীশ্রী থাকে না—সে গৃহে দুঃখ অনিবার্য্য।

শৈলবালার সদা-প্রফুল্লমুখে চিন্তার ছায়া পড়িল—বিষাদ-গাম্ভীর্য্য দেখা দিল। যেন বীচিবিক্ষোভচঞ্চলা তরঙ্গিণী গমন পথে সহসা স্থির হইয়া দাঁড়াইল। সে কি করিবে, কিছুই স্থির করিতে পারিল না; দুঃখের উপর দুঃখ—যোগেন্দ্রনাথ চিন্তাকুল; আবশ্যক কর্ম্মেও তাঁহার মন নাই; কোন কথা কহিলে তিনি শুনিয়াও শুনেন না, কোন দ্রব্য চাহিয়া সম্মুখে পাইলেও লইতে ভুলিয়া যায়েন। শৈল দিদির সঙ্গে কাঁদিল। সে কুমুদিনীর নিকট যে আন্তরিক স্নেহ পাইয়াছিল, তাহাতে সে তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া, তাঁহার সুখে সুখ ও দুঃখে দুঃখ বোধ না করিয়া থাকিতে পারে কি?

যোগেন্দ্রনাথ হৃদয়ে যেন শত-বৃশ্চিক-দংশন-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন। তিনি জ্যেষ্ঠকে জীবনে আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন; জ্যেষ্ঠের রচিত আদর্শেই তাঁহার চরিত্র গঠিত। গুরুর অধঃপতনে ভক্ত শিষ্যের যে বিষম বেদনা, উপাসিত দেবমূর্ত্তির বিচূর্ণনে উপাসকের যে দুঃসহ যাতনা; জ্যেষ্ঠের এই পদস্খলনে আজ যোগেন্দ্রনাথের সেই বেদনা— সেই যাতনা। যে জ্যেষ্ঠকে তিনি দেবতার মত ভক্তি করিতেন ও সখার মত ভাল বাসিতেন, আজ সেই জ্যেষ্ঠের ও তাঁহার মধ্যে বিষম ব্যবধান গঠিত হইল! কুমুদিনীর দুঃখে যোগেন্দ্রনাথ অশ্রুপাত করিলেন। যোগেন্দ্রনাথের ভগিনী ছিল না—তিনি কুমুদিনীকে সহোদরার মত দেখিতেন। কুমুদিনী ভ্রাতৃলাভে বঞ্চিতা ছিলেন—তিনি দেবরকে ভ্রাতার মত স্নেহ করিতেন। কুমুদিনী যখন প্রথম শ্বশুরালয়ে আসেন, তখন সমবয়সী দেবরই তাঁহার ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখের কথা জানাইবার পাত্র ছিলেন। বালক যোগেন্দ্রনাথ অধীত বিদ্যালব্ধ জ্ঞান-ভাণ্ডার হইতে কত রত্ন ভ্রাতৃজায়াকে দেখাইতেন। তাহাতে কুমুদিনী কত বিস্ময় প্রকাশ করিতেন; দেবরের কত প্রশংসা করিতেন। বিদ্যায় বা বুদ্ধিতে যাহারা তাহার সহিত সমস্তরে বা তাহার অপেক্ষা উচ্চস্তরে অবস্থিত, তাহাদের সহিত মিশিয়া মানুষ যত আনন্দলাভ করে, যাহারা তাহার অপেক্ষা নিম্নস্তরে অবস্থিত, তাহাদের সহিত মিশিয়া সে

তদপেক্ষা অনেক অধিক আনন্দলাভ করে। তাহাতে তাহার আত্মাভিমান তৃপ্ত হয়। যোগেন্দ্রনাথ বালকোচিত স্বল্প বিদ্যায় ভ্রাতৃজায়াকে বিস্মিতা দেখিতেন। সেও উভয়ের মধ্যে একটি বন্ধন। তাহার পর সংসারের কার্য্যে দেবর সর্ব্বদা ভ্রাতৃজায়ার পরামর্শ লইতেন; ভ্রাতৃজায়া কখনও দেবরের ব্যবস্থায় দ্বিরুক্তি করিতেন না। যোগেন্দ্রনাথ জানিতেন, কুমুদিনীর স্নেহের মত আন্তরিক স্নেহ দুর্ল্লভ। কুমুদিনী জানিতেন, তাঁহার সহোদর থাকিলে, সে তাঁহাকে তাঁহার দেবরের অপেক্ষা অধিক ভক্তি ও স্নেহ দিতে পারিত না। সেই সোদরোপমা ভ্রাতৃজায়ার মর্ম্মান্তিক বেদনার কথা চিন্তা করিয়া যোগেন্দ্রনাথ কাতর হইয়া পড়িলেন।

দুশ্চিন্তায় যোগেন্দ্রনাথ সারারাত্রি ঘুমাইতে পারেন নাই। প্রত্যূষেই শৈলবালা জানাইয়াছিল, "দিদি সারারাত্রি কাঁদিয়াছেন।" ছেলেরা জ্যেষ্ঠতাতের নিকট যাইতে নিষিদ্ধ হইয়া বিমর্ষ, বিশুষ্ক মুখে পিতার কাছে কাছে ঘুরিতেছিল।

সে দিন প্রভাতে আর ভ্রাতার যাইতে বিলম্ব দেখিয়া জ্যেষ্ঠ পরিচিত স্নেহসিক্ত স্বরে ডাকেন নাই, "যোগী, আয় চা ঠাণ্ডা হইয়া গেল।" ভৃত্য তাঁহার ও বালকদ্বয়ের চা দিয়া গিয়াছিল। তাহাতে যোগেন্দ্রনাথের চক্ষে জল আসিয়াছিল। পূর্ব্বে কখনও এমন হয় নাই। তবে দুই ভ্রাতার মধ্যে এ ব্যবধান কি কখনও ঘুচিবে না?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দুঃখ কাহার ?

কেবল কি কুমুদিনীর দুঃখনিশা পোহাইল; দুঃখ-দিবার আরম্ভ হইল ? কোটরস্থ বহ্নিতে আশ্রয়তরু দগ্ধ হইলে আশ্রিতা লতা শুকাইয়া যায়। আশ্রয়তরু কি কঠিন হৃদয়ে দহন-দাহ-যাতনা ভোগ করে না ? ব্রততীর কোমলতাই তাহার সৌন্দর্য্য, তাহার পল্লবমুকুলশ্রীই তাহার আকর্ষণ—অনলতাপে সেই কোমলতা ও সেই শ্রী সহজেই বিনষ্ট হইয়া যায়। তাই লোকে সহজেই তাহাকে লক্ষ্য করে। আশ্রয়-তরুর দৃঢ় সবলতাতেই তাহার অস্তিত্ব; তাহার সে দহন-দাহ-ক্লেশ বোদ্ধা ব্যতীত কেহ বুঝে না। কুমুদিনীর দুঃখ পতিপ্রেমবঞ্চিতা হইয়া। সুরেন্দ্রনাথের দুঃখ পাপ-কলুষিত হৃদয় লইয়া। পত্নী আপনি নিষ্পাপ, আত্ম-গ্লানি-বর্জ্জিত-হৃদয়: পতির ব্যবহারে ব্যথাকাতর। পতিপাপ-সাহচর্য্যে কলুষিত, আত্ম-গ্লানি-ক্লিষ্ট হৃদয়, আপনার ব্যবহারে অপরের দুঃখে দুঃখিত। দুঃখ অধিক কাহার ?

কুমুদিনী কক্ষদ্বার হইতে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ফিরিয়াছিলেন; সুরেন্দ্রনাথ তাহা দেখিয়াছিলেন। যেমন দিবাগমে রজনীর অন্ধকারাবরণ অপসৃত হইয়া যায়—গগনে উষার রক্তরাগ লক্ষিত হয়, তেমনই সেই দ্বারপ্রান্তে প্রত্যাবর্ত্তনপরা বিষাদিতা

পত্নীকে দেখিয়া সুরেন্দ্রনাথের মোহের ক্ষণস্থায়ী উত্তেজনা অপস্যৃত হইয়াছিল, হৃদয়ে লজ্জা অঙ্কুরিত হইয়া উঠিয়াছিল। অত্যল্পকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে কুমুদিনী ব্যতীত তাঁহার জীবনে সুখ ছিল না, এখন সে এমনই পর হইয়াছে যে, তিনি তাহার নিকটে মুখ দেখাইতেও লজ্জিত। গত কল্য সংসারে যে রমণী তাঁহার গৃহের গৃহিণী, কার্য্যে মন্ত্রী, অবসরে সখী ছিল, যে তাঁহার রোগে শুশ্রূষা, শোকে সান্ত্বনা, বিজনে সখী ও সজনে গর্ব্বের বিষয় ছিল—তিনি কি মোহবশে স্বহস্তে তাহার ও আপনার মধ্যে বিষম ব্যবধান তুলিয়া দিয়াছেন! কিসে এ ব্যবধান ঘুচিবে?

সে দিন কুমুদিনী চলিয়া যাইবার পরই সুরেন্দ্রনাথ ভাবিতে লাগিলেন। ক্রমে নলিনীর আনন্দ-দীপ্ত আনন হইতে রবিকর অপস্যৃত হইয়া গেল। ক্রমে তিমিরপরিসর নিশামুখে স্বচ্ছান্ধকার পাষাণ নগরীকে স্নিগ্ধ স্নেহবসনে আবৃত করিতে লাগিল। তখনও নলিনীর করতল সুরেন্দ্রনাথের করতলে। নলিনী নির্নিমেষ নেত্রে তাহার মুখে হৃদয়-দেবতার জ্যোতিশ্ছটা লক্ষ্য করিতেছিল। সুরেন্দ্রনাথ ভাবিতেছিলেন। প্রেম বা স্বার্থ, বাসনা বা লালসা—যাহাতে স্ত্রীপুরুষকে একত্র করে, তাহার আরম্ভ অপরিমিত বাক্য-বাহুল্য-চিহ্নিত—বাক্য-সংযম-সহচর নহে। আরম্ভে আতিশয্য থাকে, গাম্ভীর্য্য থাকে না; উচ্ছ্বাস থাকে, চিন্তা থাকে না। যে স্থানে সে আরম্ভ চিন্তা-সহচর, সে স্থানে বিপদ

অনিবার্য্য। যে স্থানে প্রারম্ভেই বাক্যের আতিশয্য না হইয়া অভাব ঘটে, সে স্থানে আসন্ন বিপদের ছায়া অদূরবর্ত্তিনী। সে স্থানে বুঝিতে হইবে, যে আকর্ষণ উভয়কে একত্র করিয়াছে, সে আকর্ষণ একান্ত ক্ষণভঙ্গুর—ভগ্নোন্মুখ।

সুরেন্দ্রনাথ স্বভাবতঃ শান্তপ্রকৃতি—ধীর। তাঁহার হৃদয়ে উত্তেজনার ক্ষণস্থায়ী আবেগ সহজেই নিবৃত্ত হইয়া গেল। যেমন প্রমত্ত-পবন-চালিত ধূলিরাশি দিক্ অন্ধকার করিলে পথিকের পথ-ভ্রম হয়, বুঝি তেমনই মুহূর্ত্তের উত্তেজনায় সুরেন্দ্রনাথের স্বভাবতঃ শান্তপ্রকৃতি বিচলিত হইয়াছিল। এখন অপসৃতধূলি দিক্ নির্ম্মল;—তিনি বুঝিলেন, তিনি স্খলিতপদ পথিক—বিপথগামী। এখন উপায় কি? সুরেন্দ্রনাথ সকল দিক্ ভাবিতে লাগিলেন।

পরদিন প্রভাতে ভৃত্য অন্যদিনের মত চার আয়োজন করিয়া দিতে আসিল। তাহার কর্ত্তব্যে বিন্দুমাত্র ত্রুটি ছিল না; তথাপি সুরেন্দ্রনাথ স্পষ্ট অনুভব করিলেন, গৃহের পরিবর্ত্তন ভৃত্যকেও স্পর্শ করিয়াছে; তাহারও মুখে বিষাদ ও বিস্ময় প্রকাশিত হইয়াছে।

চা প্রস্তুত হইল। বহুদিনের অভ্যাসবশে সুরেন্দ্রনাথ বাহিরে বারান্দায় আসিলেন, উদ্দেশ্য—ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয়কে ডাকিবেন। তাহাদিগকে ডাকিতে যাইয়া সুরেন্দ্রনাথের মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল। তিনি কক্ষে ফিরিলেন। গত অপরাহ্ণ হইতে

তাহারা তাঁহার নিকটে আইসে নাই। তাঁহার নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল। শেষে তিনি ভৃত্যের নিকট ভ্রাতার ও ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয়ের পানীয় দিলেন। সে যাইয়া যোগেন্দ্রনাথকে দিয়া আসিল। সম্মুখে চার পেয়ালা পড়িয়া রহিল—তাহা হইতে ধীরে ধীরে উষ্ণ বাষ্প উঠিতে লাগিল। সুরেন্দ্রনাথ শূন্য নয়নে সেইদিকে চাহিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। আজ প্রভাতে তিনি একাকী বসিয়া। বাল্যকাল হইতে যোগেন্দ্রনাথ প্রভাতে তাহার নিকটে আসিয়া চা পান করেন। তিনি স্বয়ং চা প্রস্তুত করিয়া না দিলে ভ্রাতার তৃপ্তি হয় না। এক দিন অন্যত্র চা পান করিলে পরদিন তাঁহার নিকট পানান্তে যোগেন্দ্রনাথ বলেন, "দাদার হাতে না হইলে, চা পান করিয়া তৃপ্তি হয় না।" আজ তিনি নিকটে আসিলেন না। সুরেন্দ্রনাথের বক্ষে সে ব্যথা বাজিল। অন্যদিন ভ্রাতুষ্পুত্রদিগকে না দিয়া তাঁহার চা পান হয় না; আজ তাহারা আসিল না, তাঁহার ডাকিতে সাহস হইল না। আজ তিনি একক। পাপ নির্জ্জনতা-প্রিয়।

সুরেন্দ্রনাথের বক্ষে ব্যথা বাজিল। দুঃখের আস্বাদ কবে মিষ্ট হইয়া থাকে?

সুরেন্দ্রনাথ বুঝিলেন, নিজকর্ম্মদোষে তিনি অভিশপ্ত জীবের মত ত্যাজ্য হইয়াছেন; তিনি যেন সংক্রামকরোগগ্রস্ত, তাঁহার সঙ্গ মৃত্যুচ্ছায়া-সহচর। তিনি নানাবিষয়ের চিন্তা করিতে লাগিলেন। যে মূর্খ, যে অবোধ, সে কোন কার্য্যে রত হইলে

সহজে বিরত হইতে পারে। যে বিদ্বান্, যে বুদ্ধিমান্ তাহার পক্ষে তাহা তেমন সহজ নহে। সে অবলম্বিত পথ হইতে সহজে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লজ্জিত হয়। আরব্ধ কার্য্য সহজে ত্যাগ করা তাহার পক্ষে লজ্জাকর। তাহাতে তাহার আত্মাভিমান ক্ষুণ্ণ হয়। তাই সে আপনার কার্য্যের সমর্থক যুক্তির সন্ধান করে,—আপনাকে আপনি প্রতারিত করে, অবলম্বিত পথ দুর্গম হইলেও সুগম করিয়া লয়। তাহার পক্ষে সুপথের পথিক হইলে সে পথ-চ্যুত হওয়াও যেমন সহজ-সাধ্য নহে, কুপথের পথিক হইলেও পথি-পরিবর্ত্তন তেমনই দুঃসাধ্য। তাহার কার্য্য তাহার বুদ্ধি-প্রণোদিত বিচারের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত; ভাল হউক আর মন্দ হউক, যুক্তির আবরণে আবৃত। সে ভিত্তি সহজে বিচলিত হয় না; সে আবরণ সামান্য আঘাতে নষ্ট হইবার নহে।

উর্ণনাভ যেমন অত্যল্পকালমধ্যে অত্যল্প স্থানে সুদীর্ঘ লূতাতন্তুজাল বয়ন করিয়া ফেলে—সুরেন্দ্রনাথ তেমনই সে দিন নূতন অবস্থায়, স্বল্পকাল মধ্যে সুদীর্ঘ চিন্তাজালের সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। সে সকল চিন্তার কতক সুসংলগ্ন, কতক অসংলগ্ন—খণ্ড চিন্তার সমষ্টি মাত্র। কিন্তু তাঁহার মানসরাজ্যে যে চিন্তাচক্র দ্রুত চলিতেছিল, তাহার আবর্ত্তনে তিনি স্বয়ং চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিলেন।

মানুষ এক বিষয়ে ভ্রম করিলে, এক কার্য্যে আত্মবিস্মৃত

হইলে, একবার কুপ্রভাব-পরিচালিত হইলে—সে যে সর্ব্ব বিষয়ে অধঃপতিত হয়, এমন নহে। হৃদয়ের এক অংশ দুষ্ট হইলে সকল অংশেই যে রোগ সংক্রামিত হইবেই, এমন কোন কথা নাই। মানব হৃদয়কে কোন সহজ নিয়মে বিচার করা মূর্খের কার্য্য। যে কুচরিত্র সেও অনেক সময় দয়ালু; যে স্বার্থপর সেও অনেক সময় সহৃদয়; যে কুচক্রী সেও অনেক সময় নীতিপরায়ণ। একজন একবার পদস্খলিত হইলেই, এমন বুঝিতে হইবে না যে, তাহার উদ্ধার অসম্ভব; তাহার উদ্ধারের জন্য চেষ্টা অনাবশ্যক; ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টিই তাহার যোগ্য পুরস্কার। একজন এক বিষয়ে পাপ করিলেই কি ঘৃণার পাত্র হইয়া দাঁড়ায়?

সুরেন্দ্রনাথের বিচারশক্তি ক্ষুণ্ণ হয় নাই, দয়াবৃত্তি বিলুপ্ত হয় নাই। তাই তাঁহার প্রথম ও প্রধান চিন্তা নলিনীকে লইয়া। গললগ্নকুম্ভ মজ্জমান ব্যক্তি যেমন সেই কুম্ভভারেই তীরে ফিরিতে পারে না, তেমনই তিনি নলিনীর জন্য প্রত্যাবর্ত্তন দুঃসাধ্য বলিয়া বিবেচনা করিলেন। তিনি ফিরিলে ফিরিতে পারেন; কিন্তু হায়, তাহার আর ফিরিবার পথ আছে কি? তিনি স্বয়ং আপনার পদে ভর দিয়া দাঁড়াইতে সমর্থ, কিন্তু হায়, তাহার আর দাঁড়াইবার স্থান আছে কি? দোষ তাঁহার। তিনি সংসারের সর্ব্ব সুখে সুখী হইয়াও তৃপ্ত হইতে পারেন নাই; নিষিদ্ধ বস্তুর জন্য কর প্রসারিত করিয়াছিলেন। প্রেমময়ী পত্নী, স্নেহশীল ভ্রাতা সকলের মনে বেদনা দিয়া তিনি সুখের

সংসারে দুঃখানল জ্বালিয়াছেন। দোষ তাঁহার। যে ঐহিকের সর্ব্বসুখ-বঞ্চিতা তাঁহাকে আত্মদান করিয়াছে—তাহাকে নিবৃত্ত করাই তাঁহার কর্ত্তব্য ছিল; তিনি তাহার অভিভাবক, সে তাঁহার আশ্রিতা। তিনি তাহার বাসনা-বহ্নি নির্ব্বাপনের উপায় না করিয়া তাহাতে ইন্ধন-দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। দোষ তাঁহার।

আজ তিনি তাহাকে ত্যাগ করিয়া আপনাকে লইয়া আপনি প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারেন। কিন্তু সে কার্য্য সুরেন্দ্রনাথের নিকট বড় নিষ্ঠুর বলিয়া বোধ হইল। তিনি কি এত দূর অধঃপতিত যে, আজ আপনার জন্য অপরকে পঙ্কে ত্যাগ করিয়া যাইবেন? পাপ তাঁহার—শাস্তিও তাঁহারই প্রাপ্য। তাঁহার পাপের দণ্ড অপরকে দিয়া তিনি আপনি মুক্ত হইবেন কেন? তিনি তাহা করিবেন না।

দয়া-প্রণোদিত বিচারের ফলে সুরেন্দ্রনাথ বুঝিলেন, তিনি লূনপক্ষ বিহগের দশা-গ্রস্ত। ঊর্দ্ধে সূর্য্য-করোজ্জ্বল নীল অম্বর, দূরে চিক্কণ-শ্যাম বনান্ত, নির্ঝর-মূলে পূর্ব্ব সঙ্গীদিগের কলকাকলী, সে সে সকল উপভোগ করিতে অসমর্থ। তিনি স্বীয় কর্ম্ম-ফলে আজ তাঁহার সংসারের সহস্র সুখ হইতে বঞ্চিত—সে সংসার হইতে স্বেচ্ছায় নির্ব্বাসিত। তিনি বুঝিলেন, তিনি বাসনা-সমুদ্র মন্থন করিয়া সুধা-ভ্রমে গরলে ভাণ্ড পূর্ণ করিয়াছেন। এখন তাঁহার পক্ষে পান করিয়া সে ভাণ্ড নিঃশেষ

করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। তাহার ফল জীবন-ব্যাপিনী যাতনা। সে কথা ভাবিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন; কিন্তু দেখিলেন—বুঝিলেন, আর উপায় নাই। তাঁহাকে সে গরলরাশি পান করিতেই হইবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

গৃহত্যাগী।

আপনার ক্ষমতার আতিশয্য সম্বন্ধে ভ্রান্ত বিশ্বাস মানুষের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক। আমরা সংসার-সমুদ্রে আত্মাভিমানের জলবিম্ব ভাসাইয়া তন্মধ্যে বাস করি। সেই পয়ঃ-প্রাচীরের অন্তরায়ে বহির্জগৎ বিচিত্র বর্ণজালে অভিনব শ্রীধারণ করে। যদি সে জলবিম্ব সহসা ফুৎকারে ফাটিয়া যায়, তবে বাস্তব জগতের নগ্ন মূর্ত্তি দেখিয়া আমরা বিস্মিত—ভীত—স্তম্ভিত হই। সেই অন্তরাল-মুক্ত হইলেই জগতের মুখ হইতে সৌন্দর্য্যশ্রী অপসৃত হইয়া যায়। আমি যখন তোমাকে সহস্র সদুপদেশ প্রদান করি, তখন যদি বুঝিতে পারি, তুমি তাহাতে বিরক্ত হইতেছ, তবে আমার বিবক্ষু রসনার বেগ আপনা হইতেই নিবৃত্ত হইয়া যায়। তোমার সহিত প্রগাঢ় বন্ধুত্বের সময় যদি আমি শুনিতে পাই, আমার কুগঠন নাসিকা লইয়া তুমি বিদ্রূপ করিয়াছ, তবে সে বন্ধুত্ব সেই দিনই বিলুপ্ত হইয়া যায়। আমি যখন বহুকার্য্যে অর্থ ও অবসর দিয়া তোমাকে সাহায্য করি, তখন যদি একদিন জানিতে পাই, তুমি একদিন বিষম বিপদে অন্যের নিকট পরামর্শ লইয়াছ, তবে কি আমি আর তোমাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হই? ইহাই মানব স্বভাব।

এতদিন যোগেন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল, তিনি বুদ্ধিবলে বিপন্মুক্ত হইতে সমর্থ। আজ তাঁহার সে গর্ব্ব টুটিয়া গেল। আজ তিনি বুঝিলেন, অপ্রত্যাশিত দিক হইতে এমন বিষম বিপদ আসিতে পারে যে, তাহার নিবারণ দুঃসাধ্য। আজ তিনি দিশাহারা হইয়া পড়িলেন। এখন কি কর্ত্তব্য? উপায় কি? —ইত্যাদি চিন্তায় তিনি বিব্রত।

সুরেন্দ্রনাথের দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইবার পর একদিন কাটিয়া গেল। ভ্রাতার কথা ভাবিয়া যোগেন্দ্রনাথ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন; ভ্রাতৃজায়ার দুর্দ্দশায় তিনি অশ্রুবর্ষণ করিয়াছেন; কিন্তু ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই। পরদিন প্রাতে আপনার অধ্যয়ন কক্ষে বসিয়া যোগেন্দ্রনাথ করতল-লগ্নশীর্ষ হইয়া ভাবিতেছিলেন। কক্ষদ্বার মুক্ত হইল। রমেশচন্দ্র কক্ষে প্রবেশ করিলেন। রমেশচন্দ্রকে দেখিয়া যোগেন্দ্রনাথের মুখে যেন আনন্দালোক ফুটিয়া উঠিল। বাত্যা-তাড়িত-বারিধি-বক্ষে ভগ্নপোত নাবিক দূরে আবারিবিলম্বিত মেঘমালার মূলে আগমনশীল তরণী দেখিলে যেমন আনন্দোৎ-ফুল্ল হইয়া উঠে; সুদীর্ঘকালব্যাপী প্রবাসবাসের পর প্রবাসে স্বদেশীয়কে দেখিলে প্রবাসী যেমন আনন্দচঞ্চল হইয়া উঠে—বিপদে যখন ভাবিয়া কিছু স্থির করিতে পারা যায় না, তখন বন্ধুকে পাইলে মানুষ তেমনই আনন্দিত হয়।

যোগেন্দ্রনাথ বসিতে বলিবার পূর্ব্বেই রমেশচন্দ্র কক্ষের

এক প্রান্তে রক্ষিত কৌচখানির উপর শয়ন করিলেন ও যোগেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ভাবিতেছ?"

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তুমি আসিয়াছ, ভালই হইয়াছে।"

"তোমাদের গৃহে কি দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে?"

যোগেন্দ্রনাথ অবনত মস্তকে বসিয়া রহিলেন।

রমেশচন্দ্র বলিলেন, "মা কাল তোমাদের বাড়ী আসিয়াছিলেন।" তিনি বুঝিয়া গিয়াছেন, বাড়ীতে কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে।

রমণী দর্শনমাত্রে যাহা বুঝিতে পারেন, পুরুষের তাহা বুঝিতে অনেক বিলম্ব হয়। পুরুষ চক্ষু থাকিতেও অন্ধ—সে দেখিয়াও দেখে না, দেখিতে জানে না। রমণীর সুখদুঃখ রমণী নিমেষে বুঝিতে সমর্থ। দুই জন পুরুষ যদি একত্র দশবৎসর অবস্থিতি করে, তবুও একজন অপরকে চিনিতে পারে না। প্রকৃতি উভয়ের মধ্যে এই প্রভেদ রাখিয়াছেন। যোগেন্দ্রনাথ মুহূর্ত্ত ভাবিলেন, আপনা আপনি বলিলেন, "দূর হউক ছাই, রমেশের নিকট কিছু গোপন করিব না।" তাহার পর তিনি রমেশচন্দ্রকে বলিলেন, "নিকটে আইস।"

রমেশচন্দ্র আসিয়া একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া বন্ধুর নিকটে বসিলেন।

তখন যোগেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে বন্ধুকে সকল কথা বলিলেন। বলিতে বলিতে তাঁহার ভ্রূ যাতনায় কুঞ্চিত হইতে লাগিল।

শুনিয়া রমেশচন্দ্র বলিলেন, "প্রথম হইতেই আমার কাছে

তোমার দাদার শ্যালিকার ব্যবহার কেমন বোধ হইত। এখন দেখিতেছি, আমার আশঙ্কা সত্য।"

যোগেন্দ্রনাথ কাতরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন উপায় কি?"

রমেশচন্দ্রের স্বভাবতঃ গম্ভীর মুখ আরও গম্ভীর হইল। তিনি বলিলেন, "তুমি অবশ্য অতি উচ্চ আদর্শ হইতে ছেলেদেরও দাদার কাছে যাইতে দাও নাই। কিন্তু কথাটার আর একদিক্ আছে—সংসারের সকল পবিত্র-প্রভাব-বঞ্চিত করিয়া হয়ত তাঁহার পক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন-পথ দুর্গম করিয়াছ। যাহা হউক, যে পথ অবলম্বন করিয়াছ, এখন সেই পথেই চলিতে হইবে। আমরা আমাদের পূর্ব্ব-সঞ্চিত-সংস্কার-রঞ্জিত কাচের মধ্য দিয়া জগৎ দর্শন করি; আপনাদের সংস্কারের বর্ণে জগৎকে রঞ্জিত দেখি। আমরা আমাদের পূর্ব্ব-গঠিত আদর্শে অপরকে বিচার করি; দেশ, কাল, পাত্রের বিষয় বিবেচনা করি না, অবস্থা ভেদে যে মানুষের কার্য্য নিয়ন্ত্রিত হয়, সে কথা ভাবি না। তাহা ভাবাও সহজ নহে। তুমিও সেইরূপে বিচার করিয়া বুঝিতেছ, তোমার দাদা অতি কুকার্য্য করিয়াছেন।"

"এখন উপায় কি? দাদাকে কি ত্যাগ করিব?" যোগেন্দ্রনাথের চক্ষে জল আসিল।

"তাহা হইলে তোমার ভ্রাতৃজায়ার অবস্থা কি হইবে? তুমি চলিয়া যাইলে সম্ভবতঃ তোমার দাদা তাঁহার কোন ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু তোমার ছেলেদের ছাড়িয়া থাকা তাঁহার

পক্ষে বিষম কষ্টকর হইবে। এ অবস্থায় তাঁহাকে সেরূপ কষ্ট প্রদান অন্যায়।"

"শৈলকে কি দিন কতকের জন্য পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিব ?"

"সে ত একটা অস্থায়ী বন্দোবস্ত। তাহাতে কি হইবে ?"

"তবে কি করা যায় ?"

"আমার মত, তোমরা যেমন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাবে রহিয়াছ, তেমনই থাক। এখনও এব্যাপার নূতন—তোমার জ্যেষ্ঠের নিকট নবানের আকর্ষণ প্রবল। দিন কয়েক গত হইলে,—নূতনের নবীনত্ব দূর হইলে কি হয়, দেখা যাউক, ঘটনা পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হউক। তাহার পর বিবেচনা করিয়া অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করা যাইবে। ব্যস্ত হইয়া কিছু করিয়া কায নাই।"

"সেই ভাল।"

"বৌদিদির অবস্থা কি রূপ ?"

"তাঁহার এদিকে স্বামী, ওদিকে ভগিনী—তাঁহাকে শাঁখের করাতে কাটিতেছে। কিন্তু তাঁহার সহ্যগুণের নিকট বেদনা, যাতনা পরাজিত। এ দুঃখেও তিনি সব নীরবে সহ্য করিতেছেন। তবে বড় ব্যথা পাইয়াছেন।"

"পাইবারই কথা। সুখের বিষয়, তিনি কোন রূপ অসহিষ্ণুতা বা চাঞ্চল্য প্রকাশ করেন নাই। তাহাতে বিপরীত ফল ফলিবার সম্ভাবনা ছিল।"

"সে তাঁহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ।"

"তিনি দেবী। মানুষের এত গুণ হয় না। দেখিও তাঁহার প্রেমের জয় হইবে।"

দুই বন্ধু নীরব হইলেন। উভয়েই চিন্তিত। এই আকস্মিক বিপৎপাতে দুই জনেরই হৃদয় ব্যথিত। স্বভাব-মাধুর্য্যে কুমুদিনী রমেশচন্দ্রের ভক্তিলাভ করিয়াছিলেন। রমেশচন্দ্র তাঁহার সহিত ভগিনীর সম্পর্ক না ধরিয়া বন্ধুর সম্পর্কে তাঁহাকে 'বৌদিদি' বলিতেন। তাঁহার কথা ভাবিয়া রমেশচন্দ্র ব্যথিত হইলেন।

যোগেন্দ্রনাথ পুনরায় বলিলেন, "আজ আমি যে আদর্শে বিচার করিয়া দাদাকে দোষ দিতেছি সে আদর্শ তাঁহারই দত্ত শিক্ষার ফল। তুমি জান, আমার শিক্ষা, চরিত্র, আদর্শ, নীতি—সবই তাঁহা হইতে। তিনি আমার জ্যেষ্ঠ, আমার উপদেষ্টা, আমার গুরু, আমার আদর্শ। আমার যাহা কিছু সবই তাঁহার নিকট প্রাপ্ত। তাঁহার এই কার্য্যে আমার যাতনা, কেবল কনিষ্ঠের হৃদয়ে নিদারুণ আঘাতমাত্র নহে।"

রমেশচন্দ্র বলিলেন, "তাহা আমি জানি। বিপদে ধৈর্য্যাবলম্বন ব্যতীত গত্যন্তর নাই। তাহাই কর।"

"কিন্তু—"

যোগেন্দ্রনাথের মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল। তিনি উৎকর্ণ হইয়া শুনিলেন, সোপানে জ্যেষ্ঠের পরিচিত পদধ্বনি। তিনি সোপানে অবতরণ করিতেছেন। অল্পক্ষণ পরেই বোধ হইল, গৃহদ্বার হইতে এক খানি যান চলিয়া গেল। যোগেন্দ্রনাথ

বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে বন্ধুর দিকে চাহিলেন। তাঁহার চিন্তা-গম্ভীর আনন বিস্ফুরিত-রবিকর জলধরের মত বিস্ময়দীপ্ত।

যোগেন্দ্রনাথ ভৃত্য হরিদাসকে ডাকিলেন, সে আসিলে ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাদা কোথায়?"

ভৃত্য উত্তর করিল, "তিনি পার্শ্বের বাড়ীতে গিয়াছেন। সেই বাড়ীতে থাকিবেন।"

বাসগৃহের পার্শ্বেই তাঁহাদের একখানি ভাড়াটিয়া বাড়ী ছিল। এখন তাহাতে ভাড়াটিয়া ছিল না।

"সঙ্গে—" যোগেন্দ্রনাথ কথাটা সম্পূর্ণ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন।

ভৃত্য নতমস্তকে বলিল, "সঙ্গে তিনি গিয়াছেন।"

যেন বিষম বেদনায় যোগেন্দ্রনাথের মুখ বিকৃত হইল। তিনি বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর উপর ভ্রূযুগ স্থাপিত করিয়া করতলে মুখ ঢাকিলেন।

*　　*　　*　　*　　*

পাপের সাহচর্য্যে সুরেন্দ্রনাথ পুণ্যশ্রী-সমুজ্জ্বল সংসার ত্যাগ করিলেন। আজ তিনি গৃহত্যাগী, নূতনজীবনে প্রবিষ্ট; তাঁহার জীবনের যে অঙ্কে আজ যবনিকা উঠিল, সে অঙ্ক কলঙ্ককালিমা-কলুষিত। সে দৃশ্য আর দেখাইতে ইচ্ছা করে না। তাহার উপর অন্ধকার যবনিকা ক্ষেপণই বাঞ্ছনীয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

গৃহে।

সুরেন্দ্রনাথ গৃহ ত্যাগ করিলেন। কুমুদিনীর বক্ষে শেল বিঁধিল। তিনি হর্ম্ম্যতলে লুটাইয়া কাঁদিলেন। এতদিন হৃদয়ের এক প্রান্তে অভিমানের যে কুজ্‌ঝটিকা ছিল, আজ তাহা অপসৃত হইল। আজ নারী হৃদয়ে প্রেমই জয়ী হইল। প্রেম প্রেমাস্পদের দোষের প্রতি মানুষকে অন্ধ করে, তাহার গুণই উজ্জ্বল বর্ণে দেখায়,—দোষও গুণ বলিয়া বুঝায়। প্রেম বিচারশক্তিকে হীনপ্রভ করে। রমণী যদি পুরুষের সকল দোষ লক্ষ্য করিত, তবে স্ত্রীপুরুষে ঘর করা অসাধ্য-সাধন হইয়া দাঁড়াইত। প্রেম নীরসকে সরস করে, কর্কশকে মসৃণ করে, কুরূপকে রূপবান্ করে, দোষকে গুণ বলিয়া প্রতিপন্ন করে। প্রেমের ক্ষমতা অসীম। মীনধ্বজের কুসুমশর অঘটন ঘটায়। তাহার কোমল স্পর্শে বিষম জ্বালা; তাহার মধুর মাধুরীতে দারুণ বেদনা; উৎকণ্ঠা তাহার নিত্যসহচর। সে শরাঘাত ভীরুকে সাহসী করে, দুর্ব্বলের হৃদয়ে অসীম বল দেয়—প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিয়া জয়লাভ করে। তাই যে স্ত্রী স্বামীকে ভালবাসে, সে তাহার সব দোষ ভুলিয়া যায়—কেবল তাহার সঙ্গসুখ-লাভাশায়—কেবল তাহার কষ্টের আশঙ্কায় সকল দুঃখ নীরবে সহ্য করে। প্রেমের এমনই অসীম শক্তি।

প্রেমের জয়।

কুমুদিনীর বিষম যাতনা, তিনি হয়ত স্বামীকে দেখিতেও পাইবেন না। সুখে হউক, দুঃখে হউক; অর্দ্ধাশনে হউক, অনশনে হউক; প্রাসাদে হউক, বৃক্ষতলে হউক স্বামীর সাহচর্য্যই রমণী চরম ও পরম সুখ বলিয়া মনে করে।

কুমুদিনী মনকে বুঝাইলেন; আপনার নিকট আপনাকে দোষী প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিলেন। তিনি ভগিনীকে ক্ষমা করিতে চাহিলেন; ভাবিলেন, তাহার দুরদৃষ্ট-দাবানল-দগ্ধ জীবনে কি সুখলাভ ঘটিয়াছে? সে সংসারের প্রবেশ-দ্বারেই দারুণ আঘাতে ব্যথিতা। অপরের পক্ষে যে সুখ অযাচিত হইয়া আইসে—অতিরিক্ত অধিক হয়, তাহার পক্ষে সহস্র সাধনে সে সুখ অনধিগম্য। সংসার অপরের পক্ষে সুখদানে কল্পবৃক্ষ; তাহার ভাগ্যে দগ্ধ বিটপী। সে সংসারে প্রবেশ করিতে পায় নাই। তাই সে সংসারের কিছু বুঝে না। তাহার পক্ষে ভ্রম অসম্ভব নহে; তাহার পদস্খলন মার্জ্জনীয়। জননী মৃত্যুশয্যায় তাঁহারই হস্তে নলিনীর ভার দিয়া গিয়াছেন। তিনি ব্যতীত সংসারে তাহার আর কেহই নাই। তিনি কি তাহাকে ত্যাগ করিতে পারেন? সে যদি স্খলিতপদা হইয়া থাকে, সেজন্য দায়ী কে? তিনি তাহার অভিভাবিকা। তিনি কি আপনার কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন? তিনি কি যথোচিত সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন? তিনি কি তাহাকে বিপদের সম্ভাবনাচ্ছায়া হইতে দূরে—আপনার সতর্ক নেত্রে রাখিয়াছেন? তিনি কি

তাহার হৃদয়ের ভাব লক্ষ্য করিতে চেষ্টা করিয়াছেন? তিনি ভগিনীকে ক্ষমা করিবেন, তাহার ক্ষত হৃদয়ে আপনার স্নেহৌষধি প্রদান করিবেন।

কুমুদিনী হৃদয়কে এমনই বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু হৃদয় বুদ্ধির প্রবোধ মানে কি? বুদ্ধির প্রলেপে হৃদয়-ক্ষত নিবারিত হয় না। বুদ্ধির তকে হৃদয়ের জ্বালা জুড়ায় না;—নষ্টসুখ ফিরিয়া আইসে না। তাই তাঁহার হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইল না।

জ্বালা জুড়াইল না সত্য; কিন্তু বিজনে গোপন অশ্রুধারে ব্যতীত সে যাতনা প্রকাশও পাইত না। যখন সংসারের সকল কার্য্য শেষ হইত, যে যাহার শয্যায় শয়ন করিয়া প্রকৃতির স্নেহদান—বিস্মৃতিপ্রদ, শ্রমহারী নিদ্রাসুখ লাভ করিত, তখন সুপ্তকক্ষে একাকিনী কুমুদিনী অশ্রুত্যাগ করিতেন। নিদাঘের বৃষ্টি যেমন তাপতপ্ত ধরণীর বক্ষ শীতল করে, সে অশ্রু তেমনই তাঁহার তপ্ত হৃদয়ের জ্বালার লাঘব করিত। হৃদয়ের মূলে অশ্রুর উৎস না থাকিলে সংসারের যাতনা-দহনে কত হৃদয় মরুভূমিতে পরিণত হইত! শোকে দুঃখে, বেদনায়, যাতনায়, অশ্রু দেবতার আশীর্ব্বাদ। অশ্রু নন্দনের মন্দাকিনীকূলে মন্দারচ্ছায়ায় আসীনা, সুধাপান-নিরতা দেবকন্যার মধুর অধরচ্যুত অমৃতকণা। অশ্রু হৃদয়সাগরজাত লাবণ্যশ্রী-সমুজ্জ্বল মুক্তাফল।

একদিন শৈলবালা কুমুদিনীর সহিত সেই বিষয়ের কথা কহিয়াছিল। কুমুদিনী সস্নেহে বলিয়াছিলেন, "ভগিনী, সত্য

করাই রমণীর ধর্ম্ম। তাই জননী কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করেন, পৃথিবীর মত সহ্যগুণশালিনী হও। দুঃখ হউক, কষ্ট হউক—সবই দেবতার দান, অদৃষ্টের বাহিরে পথ নাই। কিন্তু সহ্যগুণ হারাইব কেন? তাঁহার কর্ত্তব্য তিনি করিবেন। আমি বুঝিবার কে? আর আমার সামান্য বিবেচনায় যদি বোধ হয়, দেবতা অন্যায় করিয়াছেন, তাই বলিয়া কি আমি দেবতার পূজা বন্ধ করিব? আমি কি দেবতার বিচারক,—শাসক? আমি তাঁহার উপাসিকা; বিচার করিয়া তাঁহার গুণের পূজা করি না। তবে সময় সময় মনকে বুঝাইয়া উঠিতে পারি না, বড় বেদনা বোধ হয়। তখন ভগবানের নাম লই।"

শৈল বলিল, "দিদি এখন কি করিবে?"

"কি করিব ভগিনী? স্বামী সুখে রাখুন, আর দুঃখে রাখুন, তিনি যেমন রাখিবেন, আমি তেমনই থাকিব। এ জীবনে সুখ ত অনেক দিয়াছেন। আমার মত সুখলাভ কয়জনের ভাগ্যে হয়? এখন যদি অদৃষ্টে দুঃখই থাকে, তাহাই সহিব। সংসারে সুখই লইব, দুঃখ ত্যাগ করিব—এমন প্রতিজ্ঞা করিলে কি চলে? ভগিনী, ফুলের পার্শ্বে কণ্টক থাকে; ফুলটি লইতে ইচ্ছা করি, কিন্তু করে কণ্টক বিদ্ধ হইলে চলিবে না, এরূপ হইলে হয় কি? তিনি যেমন রাখিয়াছেন, তেমনই থাকিব। তাহাতেই আমার তৃপ্তি। আমি কি তাঁহার মত বুঝি? তিনি যাহা ভাল বুঝিয়াছেন, তাহাই করিয়াছেন। আমি কি করিব?"

শৈল বলিল, "তুমিই সার্থক নারীজন্ম গ্রহণ করিয়াছিলে। আমরা তোমার পদরেণু পাইবারও যোগ্য নহি। তুমি দেবী।"

যোগেন্দ্রনাথ পত্নীর নিকট এই কথা শুনিলেন। ভ্রাতৃজায়ার প্রতি ভক্তিতে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া আসিল। কুমুদিনীর সহ্যগুণ দেখিয়া তিনি আপনার অধৈর্য্যের জন্য আপনাকে ধিক্কার দিলেন; ভাবিলেন, জগতে মনুষ্যত্বের বিকাশ কত বিরল! তিনি ইতঃপূর্ব্বে ভ্রাতৃজায়ার সহিত এ প্রসঙ্গের আলোচনা করেন নাই; এখন সে প্রসঙ্গ উত্থাপনের বাসনা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিলেন। কুমুদিনীর অসাধারণ সহিষ্ণুতা যেন যোগেন্দ্রনাথের অস্থির হৃদয়ে ধৈর্য্যদান করিল—তিনি আপনাকে আপনি বুঝাইতে শিখিলেন। কিন্তু তাহাতে হৃদয়ের ভার যায় না—ভার লঘু হয় মাত্র। যোগেন্দ্রনাথের হৃদয়ভার লঘু হইল বটে, কিন্তু সে ভার একেবারে দূর হইল না।

এমনই ভাবে দিন কাটিতে লাগিল। সংসার চলিতে লাগিল। কিন্তু পূর্ব্বভাব আর ফিরিয়া আসিল না। গৃহে পরিবর্ত্তনের ছায়া একবার পড়িলে সহজে দূর হইতে চাহে না। শিশুরা আবার খেলা করিতে লাগিল, যোগেন্দ্রনাথ আবার সংসারের কার্য্য দেখিতে লাগিলেন, কুমুদিনী আবার যোগেন্দ্রনাথের পুত্রদিগের যত্নের সামান্য ত্রুটি হইলে শৈলবালাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন, শৈলবালা আবার স্বামীর দ্রব্যাদি দেখিতে

ও তাঁহার উপর অভিমান করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু সংসার যেমন ছিল, আর ঠিক তেমন হইল না। সুরেন্দ্রনাথের গৃহে সুরেন্দ্রনাথের অভাব ঘুচিল না।

এমনই করিয়া পৌষ মাস কাটিল। মাঘের প্রথমেই পিত্রালয় হইতে শৈলবালাকে লইয়া যাইবার প্রস্তাব আসিল। শৈল বলিল, "এ অবস্থায় আমি কখনই দিদিকে একা রাখিয়া যাইব না।" কুমুদিনী অনেক বুঝাইলেন; শৈল শুনিল না। শেষে কুমুদিনী বলিলেন, "তুমি না যাইলে তোমারও নিন্দা হইবে, আমারও নিন্দা হইবে; আর লোকে সন্ধান করিবে, কেন তুমি যাইলে না। যাহাতে এ কথা জানাজানি না হয়, তাহাই করা তোমার ও আমার কর্ত্তব্য। তুমি যাও।" কুমুদিনী প্রথমে প্রস্তাব করিলেন, ছেলেরাও মাতুলালয়ে যাইবে, শেষে যাইবার দিন নিকট হইলে বলিলেন, "মোহিনী আমার কাছে থাকুক।" মোহিনীও তাহাই চাহে।

যাইবার দুই দিন পূর্ব্ব হইতে কুমুদিনী শৈলকে সাবধান করিয়া দিতে লাগিলেন, ছেলেদের যেন অযত্ন না হয়। তিনি বলিলেন, "তুমি ক্রিয়া বাড়ী যাইতেছ। সেখানে গোলমাল অবশ্যম্ভাবী। দেখিও, যেন কাযের মধ্যে ছেলেদের ভুলিও না। তাহাদের কোনরূপ অযত্ন না হয়। যোগিনী রোগা ছেলে; তাহাকে সর্ব্বদা সাবধানে রাখিবে। কোন অনিয়ম না হয়। তুমি নিজে ছেলেদের স্নান করাইবে, আহার দিবে। আর কাহাকেও সে ভার দিও না।"

তিনি স্বহস্তে ছেলেদের আবশ্যক দ্রব্যাদি গুছাইয়া দিলেন। তাহারা কি খাইতে ভাল বাসে, তাহাদিগকে কিরূপ ভাবে রাখিতে হইবে, পুনঃ পুনঃ সে সম্বন্ধে শৈলকে উপদেশ দিলেন। যাইবার সময় শৈল তাঁহার চরণে প্রণাম করিল। কুমুদিনী আশীর্ব্বাদ করিলেন, "চিরসুখিনী হও। স্বামীতে তোমার ভক্তি অচলা হউক।" তিনি তাহাকে আবার সতর্ক করিয়া দিলেন, যেন ছেলেদের কোনরূপ অযত্ন না হয়। বলিলেন, "প্রত্যহ সংবাদ দিতে ভুলিও না।"

পিত্রালয়ে যাইতে শৈলবালা চক্ষের জল ফেলিল। স্নেহ পরকেও আপন করে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ভ্রান্তি-চালিতা।

সুপ্রবৃত্তিশালিনী রমণী যখন কোন পুরুষের করে আপনার সর্ব্বস্ব—নারীজীবনের সাধনার ধন সমর্পিত করিয়া অধঃপতিতা হয়, সে কি কেবল মুহূর্ত্তের উত্তেজনার নেশায়—মোহের মায়ায় সে কার্য্য করে? সে কি কেবল বাসনা চালিতা হইয়া অধঃপতিতা হয়? তাহা নহে। সে যে ভ্রান্তিবশে সে কার্য্য করে, তাহার জন্য সে কৃপার পাত্রী। সে ভ্রান্তি আত্ম-বিসর্জ্জনের প্রশস্ত পথ। সে আশা করে, আপনার সর্ব্বস্ব দিয়া বাঞ্ছিতকে আপনার করিবে; তাহার করে আপনার সর্ব্বস্ব সমর্পিত করিলে বাঞ্ছিত তাহার হইবে; সে আর সকল অবলম্বন ত্যাগ করিলে শেষ অবলম্বিত তাহাকে ত্যাগ করিবে না। এই ভ্রান্ত বিশ্বাসই তাহার অধঃপতনের কারণ। প্রথম মিলনের পর রমণী সহস্র বন্ধনে পুরুষকে বদ্ধ করিতে চাহে; পুরুষ সেই সহস্র-বন্ধন-বিমুক্ত হইতে প্রয়াস পায়। পুরুষের সে চেষ্টা নিষ্ফল করিতে না পারিলে রমণীর অধঃপতন গভীর হওয়া অনিবার্য্য। কিন্তু ইহাই উভয়ের মধ্যে প্রকৃতি-প্রদত্ত প্রভেদ। এই নিষ্ঠুর প্রভেদই জগতে বহু মর্ম্মভেদী যাতনার উৎসমূল।

নলিনীর নিকট নবীনের প্রবল আকর্ষণ দূর হইবার পূর্ব্বেই

সে বুঝিল, সে সুখের সংসারে সর্ব্বনাশের শিখা জ্বালাইয়াছে। সে দেখিত, সুরেন্দ্রনাথের মুখে বিষাদের ছায়া গাঢতর হইতেছে, তিনি সর্ব্বদাই চিন্তিত। এক এক দিন সে পার্শ্বের গৃহে যোগেন্দ্র-নাথের পুত্রদিগের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইত। কুমুদিনী সর্ব্বদাই তাহাদের তত্ত্ব লইতেন। দাসীর নিকট সে জ্যেষ্ঠার দুর্দ্দশার কথা শুনিত। সে জ্যেষ্ঠার অসাধারণ স্নেহের কথা স্মরণ করিত, তাঁহার দুঃখের কথা ভাবিত; সে যে সেই স্নেহশীলার দুর্দ্দশার একমাত্র কারণ, তাহা বুঝিত। এই সকল ভাবিয়া সেও সর্ব্বদা চিন্তা করিত—এক একদিন সে বিরলে অশ্রুবিসর্জ্জন করিত।

গৃহান্তরে থাকিয়াও নলিনী সহস্র প্রকারে ভগিনীর স্নেহের পরিচয় পাইত। তিনি তাহাদের সুখ-বিধানের যথাসম্ভব আয়োজন করিতেন। সে স্নেহের পরিচয়ে নলিনীর চক্ষে জল আসিত। সে ভগিনীর স্নেহের কথা স্মরণ করিত, মনে মনে তাঁহার বিষাদ-কাতর মূর্ত্তির কল্পনা করিত—পূর্ব্বকথা ভাবিত, আপনার পল্লী-জীবনের কথা মনে করিত—আর কাঁদিত।

পল্লীজীবনের কথা প্রায়ই তাহার মনে পড়িত। সেই স্নিগ্ধ-ছায়া-বহুল বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী, বিহগনঝাঙ্কিতধূলি পথ; সেই প্রভাতে, সন্ধ্যায় জননীর সহিত নদীতে গমন; গৃহপ্রাঙ্গণে বৃক্ষ-মূলে স্বহস্তে জলসেচন; সে সকল বৃক্ষে ফুল ফুটিলে সেই আনন্দ; পাড়ার পথে জননীর সহিত আত্মীয়াদিগের গৃহে গমন; সেই কলুষ-লেশহীন চিত্ত; নিশ্চিন্ত জীবন; আর জীবনের একমাত্র

অবলম্বন বোধে জননীর প্রতি ভক্তি ও ভালবাসা। সে জীবন আজ স্বপ্নমাত্র—নষ্টবিত্তের পক্ষে পূর্ব্বৈশ্বর্য্যের স্মৃতি যাতনা। জীবনে নষ্ট-সুখের স্মৃতিই যাতনার চরম। নলিনী সেই যাতনা ভোগ করিত; ভাবিত, কেন সে জীবনের অবসান হইল? কেন আমি—পল্লীবালা—আজন্ম পল্লীপালিতা—এই পাষাণ নগরীর পাষাণ বক্ষে নূতন ও অনভ্যস্ত অবস্থায় পড়িলাম? পল্লী আমাকে জননীর স্নেহে রাখিয়াছিল; এ নগরী আমার—বিমাতা। সে এইরূপ চিন্তা করিত; চিন্তা করিত আর কাঁদিত। এখন ক্রন্দন ব্যতীত তাহার আর উপায় কি?

নলিনী স্মরণ করিত, তাহার জননী মৃত্যুশয্যায় শেষ কথা বলিয়াছিলেন, "ধর্ম্মে মতি রাখিও। দেবতাকে ভুলিও না।" তাহার মনে হইত, যেন জননী বিপথগামিনী দুহিতার ব্যবহারে স্নেহদীপ্ত দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়াছেন; সে নয়ন আর ধ্রুবতারার মত তাহার দিকে চাহিয়া নাই।"

একদিন জননীর কথা ভাবিতে ভাবিতে নলিনী ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। স্বপ্নে সে সেই লোকান্তরিতার পুণ্য মূর্ত্তি দেখিয়াছিল। সে আননে চির বিষাদ: সে নয়নে অশ্রুর পশ্চাতে রোষানল যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে; সে অধরের মৌন তিরস্কার কি তীব্র! নলিনী করপুটে নয়ন আবৃত করিতে চেষ্টা করিল। আপনার আননে আপনার করস্পর্শে সে চমকিয়া জাগিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ স্বেদসিক্ত। তখনও তাহার

বোধ হইতে লাগিল, যেন জননীর ছায়া-মূর্ত্তি তাহার শিয়রে। সে বহুক্ষণ সে দিকে চাহিতে পারিল না;—ভয়—পাছে আবার সেই বিষাদ-গম্ভীর মূর্ত্তি তাহার নয়নগোচর হয়; পাছে সেই অশ্রুসিক্ত রোষানল-দীপ্ত নয়নের দৃষ্টি আবার তাহার মুখে নিপতিত হয়; পাছে আবার সেই বদ্ধ ওষ্ঠাধরের মৌন তিরস্কার তাহার হৃদয়ে অসহ জ্বালার উৎপাদন করে।

চিন্তার অনল-শিখা অহরহঃ তাহার হৃদয় দগ্ধ করিত। অনুতাপের দাহে সে দগ্ধ হইতেছিল। তাহার অবসরের অভাব ছিল না, কাযেই চিন্তারও অন্ত ছিল না। কার্য্যে ব্যস্ত থাকিলে মন ভাল থাকে; চিন্তার অবসর ঘটে না। যে কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে—সে কার্য্য লইয়াই ব্যস্ত; কার্য্য-শেষে শ্রান্ত হইলে চিন্তার স্পর্শানুভবের পূর্ব্বেই সে শ্রান্তিহর নিদ্রার আশ্রয় পায়। যাহার কার্য্যের অভাব, তাহার হৃদয় দুশ্চিন্তার নরক। সে যে নরকে বাস করে,সে নরকে কি দুঃখযাতনার অন্ত আছে? তাহার জীবনে কেবল যাতনা। সে হৃদয়ে যাতনা রাবণের চিতার মত চিরপ্রজ্বলিত। অগ্নিহোত্রী দ্বিজ যেমন সযত্নে অগ্নি প্রজ্বলিত রাখে, আলস্য তেমনই সর্ব্বদা চিন্তার যাতনা প্রজ্বলিত রাখে—নির্ব্বাপিত হইতে দেয় না।

সুখের সন্ধানে যাইয়া কে কবে সফল শ্রম হইয়াছে? দূর হইতে চক্রবাল নিতান্ত নিকটে বোধ হয়; কিন্তু তাহা চির অনধিগম্য। সুখও সেইরূপ অদূরবর্ত্তী বোধ হইলেও অনধি-

গম্য। প্রভেদ এই—সুখ আপনার মোহের আকর্ষণে মানবকে আকৃষ্ট করিয়া বিফল-মনোরথ করে; চক্রবালে সে আকর্ষণ নাই। মানব-হৃদয় চুম্বকাকৃষ্ট লৌহখণ্ডের মত সুখের পশ্চাতে ধাবিত হয়; কিন্তু তাহাকে পায় না। দিবানিশি অবিরল অশ্রুধারে নলিনী এ কথা বুঝিল; বুঝিল, সে আপনি সুখ পায় নাই—কেবল একটি সুখের সংসারে অনল জ্বালিয়া দিয়াছে। বুঝিল, সে সুখভ্রমে অনন্ত দুঃখ বরণ করিয়াছে, দেবতার আশীর্ব্বাদ ভাবিয়া আত্মগ্লানির যাতনা মস্তকে তুলিয়া লইয়াছে; সে কেবল আপনি আপনার ভ্রমের ফলভোগ করে নাই, পরন্তু সে বিষফল তাহার ভালবাসার অধিকারিমাত্রকেই ভক্ষণ করাইয়াছে। হায়, এ কি ভ্রম—কি নিদারুণ, নিষ্ঠুর ভ্রম!

তাহার মোহান্ধ নয়নে যাহা নন্দনের মন্দার বলিয়া বোধ হইয়াছিল, এখন সে বুঝিল, তাহা নরকের পাপ-প্রসূন। তাহার বিকৃত স্বাদে যাহা সুধা বলিয়া বোধ হইয়াছিল, এখন সে বুঝিল, তাহা গরল মাত্র। সে যাহা দেবতার নৈবেদ্য বলিয়া মনে করিয়াছিল, এখন সে বুঝিল, তাহা প্রেতের গলিত আহার্য্য মাত্র। সুখের সন্ধান করিয়া সত্য সত্যই কে কবে সুখলাভ করিয়াছে? সুখভ্রমে কেবল কি সে-ই দুঃখ বরণ করিয়াছে?

সে আত্মগ্লানি-বিদগ্ধা, অনুতাপ-জর্জ্জরিতা, মোহাবেশমুক্তা। সে আজ বাস্তব জগতের মূর্ত্তি দেখিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছে; বুঝি-

য়াছে, তাহার কল্পিত স্বর্গ বাস্তবের স্পর্শে বিলুপ্ত। বাস্তবের মেঘ-মুক্ত গগনে কি আর কল্পনার ইন্দ্রধনু শোভা পায়?

সুখের সন্ধান সকলেই করে; সুখ কেহ পায় না। তবে আশা চিরদিন মানব হৃদয়ে প্রবল। দুঃখের গভীর অমানিশায় আশা ধ্রুবতারার মত মানব-হৃদয়কে পরিচালিত করে। দুর্দ্দশার ভীম প্রলয়-সহচর,বাত্যাবিক্ষুব্ধ সায়াহ্নে যদি আশার আলোক না থাকিত, তবে মানব এই জীবনের বোঝা বহিতে পারিত কি? আশা রোগীর পক্ষে ঔষধের অপেক্ষা অধিক উপকারী; দুঃখীর দুঃখ-বিমোচন; শোকাতুরের শোকজ্বালানিবারক। জীবনের শ্মশানে জীবনের সর্ব্বস্ব আহুতি দিয়া মানুষ আবার নূতন সুখের সন্ধানে ব্যস্ত হয়, কেন? কেবল আশায়। সেই আশার চালনায় মানব সুখ হইতে সুখান্তরের সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়—এক দিকে বিফল-মনোরথ হইয়া অন্য দিকে মন দেয়—সে কেবল আশার প্ররো-চনায়। সুখ হইতে সুখান্তর-লাভের আশাই মানব-জীবন। কিন্তু যে সংসারে এক সুখের আশায় আর সকল সুখ অবহেলায় ত্যাগ করিয়া আসে, সে যদি সে সুখলাভে বঞ্চিত হয়, তবে তাহার আর কি থাকে? যে স্পর্শমণি লাভের আশায় আপনার সকল সম্পদ ত্যাগ করিয়া আসে, সে যদি দেখে, সে যাহাকে স্পর্শমণি ভাবিয়াছিল, তাহা অসার কাচখণ্ডমাত্র, তবে তাহার যন্ত্রণার কি অবধি থাকে?

নলিনী দেখিল, সে যে সুখের আশায় সব সুখ ত্যাগ করিয়া

আসিয়াছিল—সে সুখ দুঃখমাত্র, জীবন-ব্যাপিনী জ্বালার নামান্তর, নরকাগ্নিদহন। সে বুঝিল, সে যে ভ্রম করিয়াছে, তাহার পরিণাম অনন্ত দুঃখ—অনন্ত বেদনা। সে আপনার ভ্রমে আপনি শিহরিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পিতৃগৃহে।

পিতৃগৃহে আসিয়া শৈলবালা দেখিল—ভাল লাগে না। ভাল না লাগিবার কারণও অনেকগুলি, প্রধান দুইটি—প্রথম যোগেন্দ্রনাথের সহিত বিচ্ছেদ, দ্বিতীয় পিতৃগৃহে পরিবর্ত্তন। যিনি যাহাই মনে করুন, শৈল স্বামীকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। স্বামীর নিকট হইতে দূরে যাইলে কেবল স্বামীর উপর অভিমান হয়; আর নিষ্ফল অভিমানে কেবল চক্ষে জল আইসে। তখন কিছুই ভাল লাগে না। যাহার সঙ্গসুখে নীরসও সরস হয়, তাহার অভাবে কি কিছু ভাল লাগে? যোগেন্দ্রনাথের কতকগুলি বিশেষত্ব ছিল; সে গুলির সহিত বনাইয়া চলা অনেকের পক্ষে অপ্রীতিকর; অনেকের কাছে সে গুলি ভাল নাও লাগিতে পারে। কোন্ পুরুষের কতকগুলি বিশেষত্ব নাই? শৈল তাহার আন্তরিক প্রেম-প্রভাবে স্বামীর সে বিশেষত্বগুলিকে গুণ বলিয়া মনে করিত; যাহাতে সে গুলি অব্যাহত থাকে, যাহাতে সেগুলির জন্য স্বামীর কোনরূপ কষ্ট না হয়, সে পক্ষে তাহার যত্নের অবধি ছিল না। সে জানিত, সে নহিলে কেহ সে গুলিকে তেমন চক্ষে দেখিতে পারিবে না, দেখিবে না। যোগেন্দ্রনাথের সব কায আপনি না করিলে, তাঁহার দ্রব্যাদি গোছান হইতে তাঁহার স্বাস্থ্যের

তত্ত্বাবধান পর্য্যন্ত সব স্বয়ং না করিলে তাহার তৃপ্তি হইত না—যেন কষ্ট হইত। কাযেই স্বামীকে ছাড়িয়া সে থাকিতে চাহিত না,—থাকিতে পারিত না।

দ্বিতীয় কারণ, পিতৃগৃহে পরিবর্ত্তন। পরিবর্ত্তন কালের অবশ্যম্ভাবী ফল; অনুপস্থিতি সময়-সাপেক্ষ। পরিবর্ত্তন কালের করে করাল কৃপাণ—সদা পরিচালিত। অনুপস্থিতি যত স্বল্প সময়েরই হউক না কেন, তাহারই মধ্যে পরিবর্ত্তন হয়। বিদেশে যাইবার সময় যেমন রাখিয়া যাও, আসিয়া আর তেমন পাও কি? তাহারই মধ্যে কি গৃহে পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত হয় না? পত্নীর আননে কি পরিবর্ত্তন লক্ষ্য কর না? তাঁহার ব্যবহারে কি সঙ্কোচের আভাস পাও না? যাহারা দণ্ড তোমাকে না দেখিলে কাঁদিয়া সারা হইত, সেই সব শিশুদের সহিত কি আবার নূতন করিয়া পরিচয় করিতে হয় না? স্বামীর গৃহ হইতে পিতৃগৃহে আসিয়া কন্যা অসুবিধা বোধ করে—এ বড় রহস্য। তখন স্বামীর গৃহই তাহার গৃহ—তাহার অভ্যাস সেই সংসারের সামঞ্জস্যে গঠিত। কাযেই স্বামীর গৃহ হইতে চিরপরিচিত পিতৃগৃহে আসিয়া সে অসুবিধা বোধ করে। বাল্যের পিতৃগৃহ আর যৌবনের পিতৃগৃহ উভয়ে অনেক প্রভেদ। দুই বয়সের মধ্যে কালের ব্যবধান আছে—তাহাতে পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য।

শৈলবালার পিতৃগৃহে সত্যসত্যই অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে পিসিমাই সংসারে কর্ত্রী ছিলেন। তিনি তাঁহার

পিতামাতার বড় আদরের কন্যা, বালবিধবা, পিত্রালয়ে স্নেহচ্ছায়ায় পালিতা। সেখানে তিনিই আদেশ করিতেন, অপরে তাঁহার আদেশ পালন করিত। জননীর বার্দ্ধক্যে সংসারের ভার ক্রমে পিসিমার হস্তে আইসে; শেষে মাতার মৃত্যুতে তিনিই সংসারের কর্ত্রী হইয়া দাঁড়ান। শৈলবালার পিতা তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি করিতেন। শৈলবালার মাতার পুত্রকন্যাদিগের সন্তান হইলেও তিনি ননন্দার কথার উপর কথা কহিতে সাহস করিতেন না। পিসিমা পাকা গৃহিণী; তাঁহার হৃদয়ে কেবল স্নেহ। পিসিমা নহিলে যেমন সেই সংসার চলিত না, তেমনই সেই সংসার নহিলে পিসিমার চলিত না। ছেলেমেয়েরা পিসিমার স্নেহে—তাঁহারই ক্রোড়ে পালিত। তাহাদের পদে কণ্টক বিদ্ধ হইলে যেন পিসিমার বক্ষে ব্যথা বাজিত। তাহাদের সামান্য পীড়ায় পিসিমার আহারনিদ্রা বন্ধ হইত; তিনি অনাহারে গৃহ-বিগ্রহের নিকট তাহাদের মঙ্গল প্রার্থনা করিতেন। এক একটি বালিকা স্বামী-গৃহে যাইবার সময় যেন পিসিমার বক্ষের এক একখানি অস্থি খুলিয়া লইয়া গিয়াছে। শৈলবালার পিতা এক একদিন হাসিতে হাসিতে বলিতেন, "দিদি, উহারা কি তোমার স্বর্গের সিঁড়ি করিয়া দিবে? উহাদের জন্য যে ধর্ম্মকর্ম্মও ভুলিলে!" তাহারাই পিসিমার সর্ব্বস্ব—তাহারাই তাঁহার চিরসুখ। আজ কয় বৎসর হইল, অল্পদিনের ব্যবধানে শৈলবালার পিতার ও পিতৃষ্বসার মৃত্যু হয়। তাহার পর শৈল এই প্রথম পিত্রালয়ে আসিল; আসিয়া দেখিল, আর সে সংসার নাই।

মা পিসিমার গৃহিণীপনা প্রাপ্ত হয়েন নাই। কাযেই গৃহে আর সে ভাব ছিল না। গৃহিণী গৃহিণীপনায় দক্ষা নহেন, অথচ গৃহে কার্য্য অনেক বর্দ্ধিত হইয়াছে। এখন গৃহে লোক অনেক—ছেলেদের ছেলে মেয়ে অনেকগুলি। ফলে দাঁড়াইয়াছে এই যে,গৃহে কার্য্য আর সুসম্পন্ন হয় না, কথায় কথায় মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। যে সংসারে সংসারবাসীদিগের মধ্যে মনোমালিন্য, সে সংসারে কি সুখ থাকে? মা ভাবিতেন, বধূরাই দোষী। তিনি তাহাদের উপর রাগ করিতেন; আপনি দুঃখিতা হইতেন; কাঁদিতেন; আর আরও অবিবেচনার কার্য্য করিতেন, সহানুভূতিলাভের আশায় আপনার আশ্রিতা ও অনুগতাদিগের নিকট বধূদিগের দোষের আলোচনা করিতেন। বলা বাহুল্য, তাহারা তাঁহার সহিষ্ণুতার প্রশংসা করিত ও বধূদিগের নিন্দা করিত। বধূরা মনে কষ্ট পাইত—তাহারাও কাঁদিত।

বধূরা ভাবিত,যে স্নেহ তাহারা মাতৃতুল্যা শ্বশ্রূর নিকট প্রত্যাশা করে, তাহারা সে স্নেহ পায় না। তাহারা যাঁহাকে জননীজ্ঞানে ভক্তি করে, তিনি কি তাহাদিগকে কন্যার মত দেখেন? জননীতে ও শ্বশ্রূতে কি প্রভেদ! পিসিমা ত তাহাদের প্রতি এরূপ ব্যবহার করিতেন না। তিনি থাকিতে শাশুড়ীও এরূপ ব্যবহার করিতে সাহস করিতেন না। শাশুড়ী তাহাদিগকে তিরস্কার করিলে তিনি তাঁহাকে বলিতেন, "বৌ, পরের মেয়েকে আপন মেয়ের অধিক যত্ন করিতে হয়। কন্যার মত স্নেহ দিয়া পরের মেয়েকে

আপন করিতে হয়। দোষ করে, বুঝাইয়া বলিও; তিরস্কার করিও না। এখন কি আর আমাদের সময়ের মত ছোট মেয়ে ঘর করিতে আইসে? সেয়ানা বৌ, বুঝাইয়া বলিলেই বুঝিবে।” পিসিমার গৃহিণীপনার আমলে তাহারা সত্য সত্য কোন দোষ করিলেও সে কথা কর্ণান্তর হইবার সম্ভাবনামাত্র ছিল না। পিসিমার সহিত শাশুড়ীর কি প্রভেদ? পিসিমার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সে স্নেহ গিয়াছে; সংসারের সে শ্রী গিয়াছে। সংসারে একজনের সুপ্রভাব কি সামান্য! তাহাদের জ্যেষ্ঠশাশুড়ী গৃহিণীপনায় পিসিমার শিষ্যা, তাই বড় জ্বালাতেও রমেশচন্দ্রের সংসার নষ্ট হইয়া যায় নাই।

তখন গৃহে আর এক জনের স্নেহ সর্ব্বদাই অনুভূত হইত। তখন শ্বশুর বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার স্নেহ পিসিমার স্নেহের মত পরিস্ফুট না হইলেও সকল কার্য্যেই অনুভূত হইত। যূথিকার কোমল সৌরভ যেমন বনভূমি আমোদিত করিয়া রাখে, তাঁহার স্নেহ তেমনই তাঁহার সকল ব্যবহারে—সংসারে মধুরতার সঞ্চার করিত। আজ তিনিও নাই।

মার সহিত ছেলেদের ব্যবহারে এক পক্ষে আন্তরিক স্নেহের ও অপর পক্ষে প্রকৃত ভক্তির কিছুমাত্র অভাব ছিল না। কিন্তু তবুও ছেলেরা সর্ব্বদা অনুভব করিত, পিসিমা থাকিতে যাহা ছিল, এখন আর তাহা নাই। তাহাদের আজন্ম-দৃষ্ট সংসার এখন পরিবর্ত্তিত। মাতার স্নেহ প্রচুর, কিন্তু পিসিমার স্নেহ যেন

প্রচুরতর ছিল; সেই প্রচুরতর স্নেহে পালিত হইয়া এই প্রচুর স্নেহে যেন তাহাদের আর তৃপ্তি হয় না। মাতার যত্ন যথেষ্ট, কিন্তু পিসিমার যত্ন যেন যথেষ্টতর ছিল; সেই যথেষ্টতর যত্নে অভ্যস্ত তাহারা এখন কেবল তাহারই জন্য লালায়িত। সারাদিন সংসারে খাটিয়া মা যখন বিশ্রামলাভ আবশ্যক মনে করেন, পিসিমার তখনও শ্রমে বিরতি ছিল না; ছেলেদের জন্য তিনি তখনও বিশ্রামসুখলাভানিচ্ছু। তাই ছেলেরা এখন ভাবে, পিসিমা ত এমন করিতেন না। পিসিমা থাকিতে সংসারের যে সকল কায একান্ত স্বাভাবিক নিয়মে—তাহাদের অজ্ঞাতসারে সম্পন্ন হইয়া যাইত, এখন সে সকল কায সময় সময় তাহাদের চেষ্টা ব্যতীত সম্পন্ন হয় না, সময় সময় আদৌ হয় না। তখন সংসারের সকল ভাবনা একা পিসিমার ছিল, তবু সংসারে সবই সুসম্পন্ন হইত; এখন সংসারের অনেক ভাবনা তাহাদিগকে ভাবিতে হয়, তবুও সংসারের সব তেমন সুসম্পন্ন হয় না। শত কার্য্যে তাহারা জননীতে পিসিমার সে গৃহিণীপনার অভাব অনুভব করে; জননীর অবিবেচনার পরিচয় পায়। ফলে তাহারাও দুঃখ পায়। বধূদিগের সহিত শ্বশ্রূর মনান্তরের কথা তাহাদিগকে প্রায়ই শুনিতে হয়। তাহারা মাতাকে উপদেশ দিতে সাহস করে না, তিনি মনে ব্যথা পাইবেন। অথচ তাহারা সংসারের সুখে বঞ্চিত হইতেছে। পুরুষ জীবন উৎসর্গ করিয়া শ্রম করে, স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া যশ ও অর্থ সঞ্চয় করে,—বাহিরের কায তাহার। তাই সে স্বভাবতঃই আশা

করে, গৃহের কার্য্য গৃহিণী দেখিবেন, তাহাকে সে চিন্তা করিতে হইবে না। সে চিন্তার জ্বালাও বড় সহজ নহে। পিপীলিকা ক্ষুদ্র, কিন্তু তাহার দংশনে বড় জ্বালা—তেমনই সংসার বাহিরের তুলনায় সামান্য, কিন্তু তাহার ভাবনা অনেক। যে গৃহে গৃহিণী— জননী, পত্নী বা ভগিনী—গৃহিণীপনায় অপরিপক্কা সে সংসারে শ্রী থাকে কি?

পিত্রালয়ে শৈলবালার আদর যত্নের অভাব ছিল না। বিবাহিতা কন্যা বহুদিন পরে পিত্রালয়ে আসিলে, জননী আনন্দাতিশয্যে কিরূপে তাহার প্রতি সম্যক আদর ও যত্ন দেখাইবেন, তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারেন না। তিনি যেন বহুদিনের ঈপ্সিত ধন প্রাপ্ত হয়েন। শৈল তাহার ভ্রাতাদের আদরের ভগিনী; বিশেষ সে বহুদিন পরে আসিয়াছে, কাযেই ভ্রাতাদের পক্ষ হইতেও আদরের ক্রটি হইল না। কিন্তু গৃহে এই পরিবর্ত্তনে সে বড় ব্যথিতা হইল। মা তাহাকে নিকটে বসাইয়া বধূদিগের দোষ ও আপনার অপরাধহীনতা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেন; বলিতেন, বধূরা স্বপ্রধান হইয়াছে, তাঁহাকে মানে না; তাহাদের দোষে সংসার নষ্ট হইয়া গেল। বধূরা তাহাকে নির্জ্জনে পাইলে সকল কথা খুলিয়া বলিত; বলিত, "ঠাকুরঝি, তুমি বল, আমাদের দোষ কি? ঠাকুরুণ দোষ দেখিলে বুঝাইয়া বলিলে কি আমরা রাগ করি? তিনি ত আমাদের মাতৃতুল্যা।

তিনি মুখ ভার করিয়া থাকেন, কাঁদেন, পরের কাছে আমাদের নিন্দা করেন, আমাদের সঙ্গে কথা কহেন না।"

শৈল বুঝিতে পারিল, উভয় পক্ষেরই কষ্ট হইতেছে; আর সংসার শান্তিশ্রীহীন হইতেছে। সে ভ্রাতৃজায়াদের বলিল, "মা যদি একটু অবুঝই হইয়া থাকেন, তোমাদের সহ্য করা কর্ত্তব্য। জননী অবুঝ হইলে তোমরা কি করিতে?" বধূরা বলিল, "আমরা কি সহ্য করি না? আমাদিগকে—দোষে হউক, বিনা দোষে হউক—তিরস্কার করিলে আমরা হাসি মুখে সব সহ্য করি মার তিরস্কার আশীর্ব্বাদ বলিয়া গণ্য করি। কিন্তু আমাদের জন্ত উনি চক্ষের জল ফেলেন কেন? উনি পরের কাছে আমাদের নিন্দা করেন। যদি আমরা দোষও করি, উনি পরের কাছে বলিলে, তাহারা কি আমাদের নিন্দা করিতে ছাড়ে?" বধূরা অনেক গুলি ঘটনার উল্লেখ করিল। যে সব সামান্য ঘটনায় কোন কথা না বলিলেও চলিত, পিসিমা থাকিলে যে সব ঘটনার কথা মার কর্ণেও পৌঁছিত না—সেই সব ঘটনায় মা কাঁদিয়া ভাসাইয়াছেন, পরের কাছে বধূদের নিন্দা করিয়াছেন।

শৈল মাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল। মা কাঁদিয়া বলিলেন, "তুইও বুঝি বৌদের দলে মিশিয়াছিস? উহারা আমাকে কত অপমান করে; তা আমি ছেলেদের বলি না; বলিলে সংসার একদিনও টিঁকে না?" শেষে তিনি বলিলেন, "বৌরা বুঝি তোর কাছে সব মিথ্যা কথা লাগাইয়াছে?" শৈল দেখিল সে

দুই দিনের জন্য আসিয়া বুঝি সংসারে আরও অশান্তির উৎপাদন করে; বুঝি ভাল করিতে যাইয়া মন্দ করে—মা ও বধূদের মধ্যে মনান্তর আরও বর্দ্ধিত হয়। কাযেই সে সে প্রসঙ্গের আলোচনা ত্যাগ করিল; পিতৃগৃহে আবার সেই পূর্ব্বভাব প্রত্যাবর্ত্তনের আশা ত্যাগ করিয়া ব্যথিতা হইল।

শৈল বুঝিল, সুদীর্ঘকাল পিসিমার আদর্শে মা যাহা শিখেন নাই, আজ তাহার কথায় তাঁহার তাহা বুঝিবার সম্ভাবনামাত্র নাই। মার প্রকৃতি ভিন্ন প্রকারের। তিনি স্নেহশীলা, কিন্তু তাহাতে গৃহিণীপনা নাই। তিনি সংসারের কর্ত্রী হইয়া সংসার চালাইতে পারেন না; গৃহিণীর অধীনা হইয়া সংসারে থাকিলে সংসারে শ্রীসঞ্চার করিতে পারেন।

ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহের পরই শৈল ফিরিয়া যাইতে চাহিল। মা বলিলেন, "এতদিন পরে আসিয়াছিস্, এখনই যাওয়া হইবে না।" বধূরা বলিল, "ঠাকুরঝি, ঠাকুরজামাই কি গণিয়া দু'দিনের ছুটি দিয়াছিলেন? তুমি লিখিয়া দাও, আমরা যাইতে দিব না। তিনি আসিয়া তবে লইয়া যাইবেন।" ভ্রাতারা বলিলেন, "সেও কি হয়? এ কয়দিন ত বিবাহের গোলমালেই গেল। তুই আমাদের এক ভগিনী; এতদিন পরে আসিয়াছিস্, এখনই যাইবি কি? আপনি আসিয়া দাঁড়াইয়া কায করান জামাই বাবুর কর্ত্তব্য ছিল। তা তিনি ত আসিলেনই না। কি তাঁহার এত কায? তোর বৌদিদিরা বলিতেছে, তিনি আসিয়া

দিন কতক এখানে থাকিবেন; তাহার পর যাইবি। লিখিয়াও দিয়াছি।"

অগত্যা শৈলবালার যাইতে বিলম্ব ঘটিল। সেই সময় কুমুদিনীর পত্র আসিল—

ভগিনী,

তুমি অনেক দিন পরে পিত্রালয়ে গিয়াছ। শীঘ্র আসিতে বলিতে ইচ্ছা হয় না। কিন্তু যোগিনীর জন্য ও খোকার জন্য আমার মন বড় চঞ্চল হইয়াছে। তুমি যত সত্বর পার আসিতে চেষ্টা করিও। তাহারা ছাড়া আমার আর কে আছে?

দেখিও, ছেলেদের যেন কোনরূপ অযত্ন না হয়। যোগিনী দুর্ব্বল; তাহার বিষয়ে বিশেষ সাবধান থাকিবে। শীতকাল—কোনরূপে যেন তাহার ঠাণ্ডা না লাগে। তাহাদের সংবাদ যেন প্রত্যহ পাই।

তোমার মাতা ঠাকুরাণীকে আমার প্রণাম জানাইবে। ছেলেদের আমার আশীর্ব্বাদ দিও; তুমি আশীর্ব্বাদ লইও।

এখানে সব মঙ্গল।

তুমি কবে আসিবে? আজ ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষিণী

তোমার দিদি।

সেই পত্রে মোহিনী মোহন আঁকা বাঁকা অক্ষরে লিখিয়াছে, "মা, তুমি কবে আসিবে?"

যেখানে স্নেহের আকর্ষণ থাকে সেখানে বাক্য-বাহুল্য একান্ত অনাবশ্যক। কুমুদিনীর পত্র পাইয়া শৈল বুঝিল, সে চলিয়া আসাতে তাঁহার কত কষ্ট হইয়াছে। সে মাতাকে বলিল, "মা, দিদি যাইতে লিখিয়াছেন। তাঁহার বড় কষ্ট হইতেছে। আমাকে যাইতে হইবে।" মা মনে মনে কুমুদিনীর উপর বড় রাগ করিলেন; আপনা আপনি বলিলেন, "মার চেয়ে পুড়ে বেশী তা'রে বলি ডা'ন। আমার মেয়ে এতদিন পরে আমার কাছে আসিয়াছে, তাহা আর সহিতেছে না। তাই মায়া কান্না কাঁদা হইয়াছে। দুই দিন শৈল আসিয়াছে; আর তিনি সংসার চালাইতে পারেন না। সংসারের সব খাটুনী বুঝি শৈলই খাটে। এমন মেয়ে কি আর হয়? সেই জ'াকে আবার কত ভক্তি!"

ভ্রাতৃজায়ারা বলিল, "ঠাকুরঝি, কষ্ট জ'ার হইতেছে, না জ'ার দেবরের হইতেছে?"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

আশামরীচিকা।

সুরেন্দ্রনাথ বুঝিয়াছিলেন, তিনি বাসনাবারিধি-মন্থনজাত গরলরাশি সুধাভ্রমে গ্রহণ করিয়াছেন; তাহাতেই ভাণ্ড পূর্ণ করিয়াছেন; এখন সে ভাণ্ড নিঃশেষে পান করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। তিনি সেই গরলরাশি কণ্ঠে ঢালিয়াছিলেন; তাহার অবশ্যম্ভাবী ফলের কথা বিশেষ জানিয়াও তাহা পান করিয়াছিলেন। এখন সেই বিষবলে তাঁহার জীবন জর্জ্জর, হৃদয় জ্বালাকাতর।

সে জ্বালার নিবারণ অসম্ভব। বিস্মৃতিতে তাহার হ্রাস হয় মাত্র। সুরেন্দ্রনাথ দিবারাত্রি ভাবিতেন। কুমুদিনীর কথা ভাবিতেন; নলিনীর কথা ভাবিতেন; আপনার গত জীবনের কথা ভাবিতেন; আপনার বর্ত্তমান জীবনের কথা ভাবিতেন; যোগেন্দ্রনাথের কথা ভাবিতেন; ভ্রাতুষ্পুত্রদের কথা ভাবিতেন; আকাশ, পাতাল ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেন না। তিনি প্রভাতে ভাবিতেন, মধ্যাহ্নে ভাবিতেন, সন্ধ্যায় ভাবিতেন, নিশীথে ভাবিতেন—ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেন না। প্রভাত হইতে প্রদোষ, প্রদোষ হইতে পুনঃ প্রভাত—সুরেন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ অবসর। সেই আলস্য-সহায় অবসরে সুরেন্দ্র-

নাথ কেবল সুদীর্ঘ দুশ্চিন্তাজালের সৃষ্টি করিতেন। সে দুশ্চিন্তা-জালের অন্ত আছে কি?

সুরেন্দ্রনাথ সময় সময় পার্শ্বের গৃহে ভ্রাতুষ্পুত্রদিগের সেই পরিচিত মধুময় কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইতেন। তাহাদিগকে দেখিবার জন্য, তাহাদিগের মুখচুম্বন করিবার জন্য তাঁহার হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিত। একদিন তাহারাই তাঁহার জীবনের সুখ ছিল, আর আজ? আজ তিনি তাহাদিগকে দেখিতে এত লালায়িত, কিন্তু আহ্বান করিতে একান্ত কুণ্ঠিত! প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিয়াই সুরেন্দ্রনাথের ভ্রাতাকে মনে পড়িত। একদিন প্রভাতে তাহার আগমনে বিলম্ব ঘটিলে অমঙ্গল-আশঙ্কায় তাঁহার হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিত, আর আজ তিনি এতই পর যে তাহার সুখাসুখের তত্ত্বও রাখেন না! প্রভাতে—সন্ধ্যায়, মধ্যাহ্নে—নিশীথে সেই সংসারসমুদ্রমন্থনলব্ধ অমৃতের কথা মনে পড়িত, জীবনে সেই চিরসুখ,—দুঃখে সেই চিরসান্ত্বনা,—বেদনায় সেই চিরশান্তি—পত্নীকে মনে পড়িত। তখন সুরেন্দ্রনাথের নেত্রদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিত। তিনি পত্নীর বিষাদ-কাতর মূর্ত্তির কল্পনা করিতেন;—সে নয়ন অশ্রু-বিপ্লুত, সে আনন বিষাদ-ছায়ান্বিত, মুখে সে লাবণ্য নাই। কুমুদিনীর কথা মনে হইলেই সুরেন্দ্রনাথ বিষম আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হইতেন। কুমুদিনীর প্রেম—সে কি জগতে সহজ প্রাপ্য? মুক্তার আশায় অনেকেই অতলে মগ্ন হয়, কিন্তু মুক্তালাভ কয়জনের ভাগ্যে ঘটে?

সে মুক্তালাভ কত দুষ্কর যে তাহা বুঝে, সেই সে মুক্তার আদর করিতে জানে। যে বিনা-আয়াসে, ভাগ্যগুণে কূলে বসিয়া মুক্তা প্রাপ্ত হয়, সে কি তাহার আদর বুঝে? সে তাহা একান্তই সহজলভ্য বিবেচনা করে। সুরেন্দ্রনাথের তাহাই হইয়াছিল। বিনা চেষ্টায় দুর্ল্লভ রত্ন লাভ করিয়া তিনি তাহার আদর করিতে শিখেন নাই। সুরেন্দ্রনাথের সেই হিসাবে ভুল।

আজ আপনার দোষে সেই মহার্হরত্ন হারাইয়া সুরেন্দ্রনাথ তাহার মূল্য বুঝিলেন। কুমুদিনীর প্রেম কত দুর্ল্লভ, কুমুদিনীর আত্মদান কত দুষ্প্রাপ্য, কুমুদিনীর চরিত্র-মাধুরী কত অমানুষী, কুমুদিনীর মত পত্নী কত সাধনার ধন—সুরেন্দ্রনাথ তাহা বুঝিলেন। এত দিনে সুরেন্দ্রনাথ তাহা বুঝিলেন। কিন্তু বুঝিলেই কষ্ট। সেই কষ্টে সুরেন্দ্রনাথ দগ্ধ হইতে লাগিলেন। কিন্তু এখন উপায় কি? ফিরিবার পথ কোথায়? তিনি ত একাকী ভ্রান্ত নহেন।

সুরেন্দ্রনাথ ছুটি ফুরাইবার পূর্ব্বেই আফিসের কায করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে আফিসে যাইতেন, অনেক বিলম্বে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। বাড়ীতে আসিয়াও আফিসের কায করিতেন। আফিসের সামান্য কেরাণীদের কায পর্য্যন্ত আপনি যাচিয়া লইয়া সম্পন্ন করিতেন। উদ্দেশ্য—কার্য্যে ব্যাপৃত থাকা, বিস্মৃতির প্রাণহীন অতলতলে স্মৃতির যাতনা নিমজ্জিত রাখা।

ঘাতের ফল প্রতিঘাত যেমন অবশ্যম্ভাবী; উত্তেজনার ফল অবসাদ তেমনই অবশ্যম্ভাবী। উত্তেজনায় যে আনন্দ, অবসাদে সেই বিষাদ; উত্তেজনায় যে সুখ, অবসাদে সেই দুঃখ; উত্তেজনায় যে প্রফুল্লতা, অবসাদে সেই যাতনা। সুরেন্দ্রনাথ কার্য্যের আতিশয্যে সেই অবসাদের জ্বালার নির্ব্বাণ-প্রয়াসী হইয়াছিলেন। তিনি কার্য্য-বাহুল্যে আপনার চিত্ত বিক্ষিপ্ত করিয়া যাতনা-শান্তির চেষ্টা করিতেছিলেন। বিক্ষিপ্ত আলোকরাশি যেমন এক বিন্দুতে পরিণত হইলে তাহার দাহিকা শক্তি প্রবল হয় তেমনই বিক্ষিপ্ত মনোযোগ এক বিষয়ে প্রযুক্ত হইলে বড় প্রবল হয়—সুখের হইলে বড় সুখ, দুঃখের হইলে বড় দুঃখ, আনন্দের হইলে বড় আনন্দ, জ্বালার হইলে বড় জ্বালা।

সুরেন্দ্রনাথ চেষ্টা করিলেন; কিন্তু সে চেষ্টা ফলবতী হইল না। যন্ত্রণার আতিশয্য-কালে ব্যবহৃত হইলে কোন কোন ঔষধে যেমন স্বল্পকালের জন্য জ্বালা প্রশমিত হয়, কিন্তু ব্যাধির শেষ হয় না; তেমনই বড় দুঃখে বা জ্বালায় মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হইলে স্বল্প কালের জন্য শান্তিলাভ ঘটে মাত্র, সে শান্তি স্থায়ী হয় না। হৃদয়ের অন্তস্তলে যাহার মূল প্রসারিত তাহা সমূলে উৎপাটিত না হইলে কি হৃদয় সুস্থির হইতে পারে।

যত দিন যাইতে লাগিল, যত চিন্তা বাড়িতে লাগিল, যত সকল দিক্ দৃষ্ট হইতে লাগিল; সুরেন্দ্রনাথের আত্মগ্লানির লেলিহান অনলশিখা ততই প্রবলা, ততই জ্বালাময়ী,—ততই ঊর্দ্ধগামিনী

হইয়া উঠিতে লাগিল। সেই শত রক্তনাগিনীর দংশন-জ্বালায় সুরেন্দ্রনাথ জর্জ্জর হইতে লাগিলেন। দিবানিশি সেই দংশন-জ্বালার বিরাম নাই—জীবন জ্বালাময়—জীবনে কেবলই দুঃখ।

ভ্রান্তিবশে আজন্মের আশ্রয় গভীরবারি জলধিত্যাগী, বিহগ কর্ত্তৃক ধৃত ও তাহার চঞ্চুচ্যুত জলচর বারিলেশহীন একান্ত দুরারোহশিখর পর্ব্বতোপরি পতিত হইলে যেরূপ বোধ করে, নূতন জীবনে সুরেন্দ্রনাথ সেইরূপ বোধ করিতে লাগিলেন। বিপুলতোয়াতরঙ্গিণীতীরবর্ত্তী, অবারিতচ্ছায়বনস্পতিকুলশ্যাম, ফুল্ল-কুসুমসৌরভভারকাতর, পবনতরলিত পুষ্পিত ব্রততী সুন্দর, বিহগবিরাবকলয়িত বনভূমি ত্যাগ করিয়া দ্রুমলতালেশবর্জ্জিত অগ্নিশ্বাসী মরুমধ্যে আসিয়া মৃগ যেরূপ যাতনা প্রাপ্ত হয়, এই নূতন সংসারে আসিয়া সুরেন্দ্রনাথ সেইরূপ যাতনা ভোগ করিতে লাগিলেন। যাতনার অন্ত নাই, তবুও সহ্য করিতেই হইবে। এই অবস্থায়—এই যাতনায়—এই নরকে সুরেন্দ্র-নাথের দিন কাটিতে লাগিল। তাঁহার মত দুঃখ কাহার? তাঁহার যাতনার কি তুলনা আছে?

সুরেন্দ্রনাথ দয়াপরিচালিত বিচারের ফলে উপায়ান্তর না দেখিয়া গরলভাণ্ড শূন্য করিয়া পান করিয়াছিলেন; জ্বালা অবশ্যম্ভাবী জানিয়াও তিনি তাহা ত্যাগ করিতে পারেন নাই। আজ যাতনা-ভোগ অনিবার্য্য। যাতনা-নিবারণের উপায় কি? কার্য্য-বাহুল্যে কিছুক্ষণ জ্বালা বিস্মৃত হওয়া যায় বটে; কিন্তু

তাহাতে জ্বালা দূর হয় না। জ্বালার কারণ দূর না হইলে কি জ্বালা যায়? উৎস-মুখ চিরবদ্ধ না হইলে জলস্রোতঃ নিবারিত হয় না; স্রোতের মুখে বাধা পাইলে জলরাশি কিছুক্ষণ স্থির হইয়া দাঁড়ায় মাত্র; তাহার পর আবার বিপুল বল সঞ্চয় করিয়া ভীম বেগে প্রবাহিত হয়— সে বাধা ভাসাইয়া লইয়া যায়।

যত দিন যাইতে লাগিল সুরেন্দ্রনাথের যাতনা ততই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল-- তিনি ততই বিষাদ-ভার-কাতর হইয়া পড়িতে লাগিলেন--ততই লাবণ্য শ্রী-ভ্রষ্ট হইতে লাগিলেন। সুরেন্দ্রনাথ সর্ব্বদাই লক্ষ্য করিতেন, নলিনী বিষাদিতা; সে কুল্লারবিন্দবৎ আনন বিষাদচ্ছায়া মলিন, সে অসামান্য রূপরাশি বেদনায় কীট-বিদ্ধ কুসুমের দশাগ্রস্ত,—যেন নিদাঘের অগ্নিশ্বাসে বসন্তের বন-সোহাগিনী শুকাইয়া উঠিতেছে, যেন শীতের সমীরণে শরৎ সোহাগিনী সরোজিনী ম্লান হইয়া যাইতেছে। এক এক সময় অতর্কিতভাবে আসিয়া সুরেন্দ্রনাথ দেখিতেন, নলিনীর নয়ন অশ্রু-কলুষিত। যে নয়নে সুখের চঞ্চল প্রভা মুক্তাফলে লাবণ্যচ্ছায়ার মত টল টল করিত, আজ অশ্রু তাহার নিত্য-সহচর; তাহার দৃষ্টি এখন কেবল চরণ-সংলগ্ন। সুরেন্দ্রনাথ তাহা দেখিতেন; দেখি-তেন—আর ব্যথা পাইতেন। বক্ষে কণ্টক লইয়া কে কবে সুখে কাল কাটাইয়াছে?

সুরেন্দ্রনাথ দেখিলেন, জগতে দুইজন রমণী তাঁহাকে ভাল-বাসিয়াছে—দুইজন তাঁহাকে জীবনের অবলম্বন জ্ঞানে তাঁহার

চরণে সর্ব্বস্ব সমর্পিত করিয়াছে; তিনি দুইজনকেই কাঁদাইয়াছেন। জগতে একজন পুরুষ তাঁহাকে দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করিয়াছে, তিনি তাহার হৃদয়ে বিষম ব্যথা দিয়াছেন। মানুষ যাহার আশা করিতে পারে, তিনি সে সকলই পাইয়াছিলেন; স্বীয় কর্ম্মদোষে তিনি সে সকলই হারাইয়াছেন। তাঁহার ব্যর্থ জীবনে কেবল যাতনা। সে যাতনায় তিনি অপরকে ব্যথা দিয়াছেন, আপনি ব্যথা পাইয়াছেন; অপরকে কাঁদাইয়াছেন, আপনি কাঁদিয়াছেন; অপরকে জ্বালাইয়াছেন, আপনি জ্বলিয়াছেন। তাঁহার মত দুঃখী কে?

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

আশঙ্কা।

মাঘের অপরাহ্ণ। রৌদ্র ম্লানতেজ। গগন মেঘলেশহীন। পিত্রালয়ের দক্ষিণ অংশে দ্বিতলে একটি কক্ষ-বাতায়নে বসিয়া—শৈলবালা। বাতায়ননিম্নে একটি নাতি বৃহৎ উদ্যান। উদ্যান বৃহৎ-বৃক্ষ-বিরল; কেবল পশ্চিমে প্রাচীরের পর পারেই শ্রেণী-বদ্ধ ছায়া-বহুল তমাল তরুরাজি উদ্যান খানিকে পত্র-বহুল-বৃক্ষ-নিবদ্ধ নীড়ের মত বাহিরের লোক চক্ষু হইতে অন্তরালে রাখিয়াছে। দক্ষিণে প্রাচীরের পরেই এক শ্রেণী কামিনী; সযত্ন-কর্ত্তিতশাখ খিলান ও থামের আকারে রক্ষিত। মধ্যভাগে ভূমি বৃত্ত, ত্রিভুজ ও চতুর্ভুজের আকারে বিভক্ত—শ্যামশষ্পাবৃত। তাহারই মধ্যে পত্রশোভাময় ও কুসুমশোভাময় বৃক্ষরাজি। পথগুলি শ্বেত ও লোহিত কঙ্করে মণ্ডিত। উদ্যান মনোরম। শীতের শেষে অনেক কুসুমবান তরুতেই সুমনসসুষমা কুসুমিত হইয়া উঠিতেছে। বিশেষ শ্বেত, পীত, লোহিত ও রক্ত গোলাপের আর অন্ত নাই। উদ্যান মধ্যে কোথাও বিততবহুবল্লি কুঞ্জে তিমিরোদিতবিধুমণ্ডলবৎ কুসুম; কোথাও মধুমুদিতমধুপকুলকলিত অনিলতরলিত-কিশলয় ব্রততী; কোথাও কিশলয়শয়ননিবেশিত অলসনিমীলিতলোচন শশযুগল; কোথাও পল্লবছায়াসীন প্রেমালাপরত বিহগমিথুন; কোথাও ফুলে ফুলে ইন্দ্রধনুর বর্ণে রঞ্জিত অপ্সরার

প্রেমের জয়।

অঞ্চলের মত শোভাময়পক্ষ প্রজাপতির অলস লঘু গতি; কোথাও মঞ্জুলবঞ্জুললতাকুঞ্জে গর্ব্বস্ফীতকণ্ঠ কপোতের বহুবিধ কূজিত। কোথাও স্ফুটকমলোদরখেলিতখঞ্জনোপম পবনচালিত কুসুমের শোভা, কোথাও বিহগবিরাবিত, চলবনপবনসুরভিশীত লতিকা-বিতানে প্রথমমিলনলজ্জাতুরা কিশোরীর গণ্ডরক্তরাগবর্ণ অচিরোদ্গত কিশলয়; কোথাও ঘনছায় তরুর অতি নিবিড় চিক্কণ শ্যাম পত্রদুকূল; কোথাও স্তোকস্তবককুসুমসমুন্নতদেহ তরু; কোথাও বিপুলকুসুমগুচ্ছাবনতা, তরুগাত্রাবলম্বিনী লতা। মধ্যে মধ্যে সেই শ্যামশষ্পাস্তৃত ভূমিতে শ্বেত মর্ম্মর বিরচিত বেদী; তাহার উপর শ্বেত-মর্ম্মর-মূর্ত্তি—কেহ ব্রীড়াকুণ্ঠিতা, কেহ গর্ব্ব-স্ফুরিতাধরা, কেহ কোপবিস্ফারিতনয়না, কেহ প্রেমফুল্লাননা, কেহ সারল্যাসঙ্কুচিতা, কেহ বিষাদিতা। স্থানে স্থানে অলস-বিশ্রামসহায় আসন সংরক্ষিত। যেন শিল্প ও সুরুচি সমবেত চেষ্টায়—সযত্নে সেই মনোরম উদ্যানের রচনা করিয়াছে। যেন নিপুণ শিল্পী আপনার কল্পনাসমুজ্জ্বল মানস রাজ্যের সুখস্বপ্নলোক হইতে এই চিত্র চয়ন করিয়া আনিয়াছে।

শৈল উদ্যানের দিকে চাহিয়া ছিল সত্য; কিন্তু সে সেই উদ্যানশোভা উপভোগ করিতেছিল না। তাহার মনে সুখ ছিল না। সন্তান পীড়িত হইলে কোন্ জননীর মনে সুখ থাকে? কোন্ জননীর চিত্ত চঞ্চল না হয়? জননী করুণার মূর্ত্তি—জননী দেবী। জননীর স্নেহামৃত ব্যতীত কি কখনও অসহায় শিশু এই

সংসারে মুহূর্ত্ত বাচিতে পারিত? জননী ব্যতীত আর কে আপনার সর্ব্বস্ব দিয়া আর এক জনের সুখসাধনরত? মাতৃস্নেহ মানবের সঞ্জীবনী সুধা — এই দুঃখতাপময়—শোকবিষাদকাতর—চিন্তাক্লেশবহুল জগতে দেবতার আশীর্ব্বাদ, নন্দনের আস্বাদ,—দেবতার অধরচ্যুত অমৃতকণা।

যোগিনীমোহন অসুস্থ। সামান্য জ্বরভাব প্রকাশ পাইবামাত্র শৈল চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল; কলিকাতায় যাইতে চাহিয়াছিল। কিন্তু তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। শৈল সে কথা বলিতেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিলেন, "আমরা থাকিতে কি আর তোর ছেলের অযত্ন হইবে? তুইও ত পল্লীগ্রামেই হইয়াছিলি। আমরাও পল্লী-গ্রামে থাকি। আমাদেরও ত অসুখ হয়। অত ভয় করিস্ না।"

ইহার উপর শৈল আর কি বলিবে? সে নীরব হইল; আশ্বস্তা হইল। সে দেখিয়াছে, যোগিনীমোহনের সামান্য অসুখে সুরেন্দ্রনাথ ব্যস্ত হইয়া উঠিতেন, তাহাকে সর্ব্বদা সাবধানে রাখিতেন। কিন্তু তাহার স্বাস্থ্যের প্রকৃত অবস্থা সে জানিত না; সে কথা কেহ তাহাকে বলে নাই। সে জানিত না, সুরেন্দ্রনাথ গৃহান্তরবাসী না হইলে যোগিনীমোহন তাহার সহিত আসিতে পাইত না। এখন সে ভাবিল, দাদা অবশ্য ভাল বুঝেন। তিনি যখন এমন বলিতেছেন, তখন অবশ্যই ভয়ের কোন কারণ নাই। জ্যেষ্ঠও বলিলেন, "ভয় কি? দুই দিনেই সারিয়া যাইবে।"

দুই দিন কাটিয়া গেল। যোগিনীমোহনের জ্বর একটু প্রবল হইল। শৈলবালার ভ্রাতারা পরামর্শ করিলেন। জ্যেষ্ঠ বলিলেন, "অসুখ সামান্য, সন্দেহ নাই। কিন্তু কলিকাতায় গলিতে গলিতে বড় ডাক্তার। কলিকাতার লোক কথায় কথায় ডাক্তার ডাকে; অনেই ভয় পায়। শৈল ভয় পাইয়াছে। সুতরাং জিলা হইতে একজন ভাল ডাক্তার আনানই শ্রেয়ঃ।"

এই দুই দিন গ্রামের নেটিভ ডাক্তার নাড়ী টিপিয়া কেবল "কফ মিক্শ্চার" ও "ফিবার মিক্শ্চার" চালাইয়াছেন। তাহাতে উপকার দর্শে নাই। জিলা হইতে যিনি আসিলেন, তিনি সদ্য বিদ্যালয়-ছাড়া; "ডিগ্রি" ও "ডিপ্লোমা" লইয়া আসিয়াছেন, কিন্তু অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের অবকাশ পায়েন নাই। তাঁহার ঔষধের মাত্রা বাড়াইবার ঝোঁক কাটে নাই; তাঁহার বিশ্বাস, অধিক ঔষধ দিলেই রোগী শীঘ্র আরোগ্যলাভ করে; আর—যত নূতন আবিষ্কৃত ঔষধই ব্যবহার্য্য, পুরাতন পরীক্ষিতগুলি ত্যাজ্য। তিনি সামান্য অসুখে লম্বা ব্যবস্থাপত্র লিখেন; চিকিৎসায় পরীক্ষা করিবার চেষ্টা করেন; আবশ্যক না হইলেও অস্ত্র ব্যবহার করেন; স্ফোটক হইয়াছে শুনিলেই "ক্লোরোফর্ম্ম" হইতে সর্ব্ববিধ অস্ত্রাদিতে পূর্ণ তোরঙ্গদান সঙ্গে আনেন। তিনি এখনও বুঝেন নাই, ঔষধ শরীরের স্বাভাবিক ক্রিয়ার সাহায্য মাত্র করে। রোগীর শরীরের অবস্থা কিরূপ, সে পূর্ব্বে কোন গুরুতর পীড়া ভোগ করিয়াছে কি না, ইত্যাদি কথা জানিতে

না পারিলে অনেক সময় অভিজ্ঞ চিকিৎসকেরও ভ্রম অনিবার্য্য। নবীন যুবক চিকিৎসকের 'ভ্রম স্বাভাবিক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। চিকিৎসক সকল কথা জানিতে পারিলেন না, জানিবার জন্য বিশেষ চেষ্টাও করিলেন না। তিনি ভাবিলেন ও বলিলেন, "পীড়া সামান্য, সহজেই আরোগ্য হইবে।" শৈল তাহা শুনিল—শুনিয়া আশ্বস্তা হইল—আপনাকে আপনি বুঝাইল।

শৈল স্বয়ং আশ্বস্তা হইল; কিন্তু ভাবিল, দিদি এ কথা শুনিলে কি ভাবিবেন? সে তাহার মাতাকে বলিল, "মা, কলিকাতায় দিদিকে সংবাদ দিব।" মা উচ্ছ্বসিত অভিমানের স্বরে বলিলেন, "তোমার যাহা ইচ্ছা কর। মেয়ে কখনও আপনার থাকে না। বলে, 'মা মরেন ঝি ঝি করে, ঝি মরেন কি কি করে।' আমার অপেক্ষা কি তোমার জা তোমার আপন যে, সে আসিয়া অধিক করিবে? 'মার চেয়ে পুড়ে বেশী তারে বলি ডান।' আমি এখন তোমার পর।" ইহার উপর আর কথা চলে না।

বাস্তবিক মা যে দৌহিত্রকে বিশেষ যত্ন করিতেন, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। কিন্তু তিনি আপনার ব্যতীত অপরের স্নেহ-সম্ভাবনা সহ্য করিতে পারিতেন না। বিশেষ তাঁহার যত্ন যতই আন্তরিক হউক না কেন, রোগীর বা রুগ্নের পক্ষে উপকারী নাও হইতে পারে। বালক বালিকারা উপবাসী থাকে ইহা

তাঁহার সহ্য হয় না; পীড়ায় যে উপবাস আবশ্যক হইতে পারে, তাহা তিনি বুঝিতেন না।

এখন মা জ্বর-কাতর দৌহিত্রের শিয়রে বসিয়া বীজন করিতেছিলেন। শৈল বসিয়া ভাবিতেছিল।

মার আহ্বানে শৈল চমকিয়া চাহিল। মা বলিলেন, "আমি এখানে আছি। তুই কাপড় কাচিয়া আয়।"

শৈল উঠিল, উঠিয়া শয্যাশায়ী পুত্রের কপালে করতল স্থাপিত করিল। কপাল তখনও অত্যন্ত তপ্ত; দুই পার্শ্বে শিরায় রক্তস্রোতঃ বেগে বহিতেছে। মস্তকের যন্ত্রণায় অধীর হইয়া বালক মধ্যে মধ্যে পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিতেছে।

শৈলকে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্তা হইতে দেখিয়া বালক বলিল, "মা, কবে জ্যেঠাইমার কাছে লইয়া যাইবে?"

শৈল ফিরিয়া আসিয়া পুত্রের কাছে বসিল; তাহার পর তাহাকে অন্য কথায় ভুলাইয়া সে কক্ষ ত্যাগ করিল।

কক্ষান্তরে যাইয়া শৈল আবার ভাবিতে বসিল, কুমুদিনীকে ও যোগেন্দ্রনাথকে এ সংবাদ দিবে কি না। কোন্ জননী সন্তানের পীড়ায় আপনার চরম দুর্দ্দশার সম্ভাবনা মনে করিতে পারেন? আশার স্নিগ্ধোজ্জ্বল শুভ্রালোকে জননীহৃদয়ে সে দুশ্চিন্তার ছায়াপাত হইতে পারে না; শৈলও সে সম্ভাবনা কল্পনা করে নাই। তবে যোগেন্দ্রনাথের কথায় সে মনে করিল, তিনি শুনিলে কি মনে করিবেন? ছেলেদের ভার আমার হস্তে দিয়া তিনি নিশ্চিন্ত

আছেন আর আমি তাঁহাকে সংবাদ দিব না? কুমুদিনীর কথায় সে ভাবিল, দিদিকে এ কয়দিন এ সংবাদ না দিয়াই অন্যায় করিয়াছি—আর গোপন করিব না। আমার সন্তানের পীড়ার সংবাদ কেহ আমার নিকট গোপন করিলে আমি কি আর তাহাকে শ্রদ্ধা করিতে পারি? দিদি প্রাণে বড় ব্যথা পাইবেন। মা রাগ করিবেন; তাহা হউক, দিদিকে এ সংবাদ দিব। তাঁহার নিকট যোগিনীর পীড়ার সংবাদ গোপন করিতে পারিব না।

শৈল দুইখানি পত্র লিখিল—একখানি কুমুদিনীকে, অপরখানি যোগেন্দ্রনাথকে। দুই পত্রেই সে যোগিনীমোহনের পীড়ার কথা সবিশেষ লিখিল। কুমুদিনীর পত্রে সে লিখিল, "দিদি, মার নিতান্ত নিষেধে পূর্ব্বে তোমাকে এ কথা লিখিতে পারি নাই। আজ আর না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না। তুমি আমায় ক্ষমা করিও। ছোট ভগিনীকে এবার ক্ষমা করিতে হইবে। তুমি যেরূপ ভাল বুঝ সেইরূপ ব্যবস্থা করিও।"

পত্র দুইখানি পাঠাইয়া দিয়া সে জ্যেষ্ঠাগ্রজকে ডাকিয়া পাঠাইল। তিনি আসিলে শৈল তাঁহাকে বলিল, "দাদা, যোগিনীর জ্বরত ছাড়িতেছে না। সেজদাদা উহাকে বরাবর দেখিয়া থাকেন; তাঁহাকে একবার আসিতে লিখিলে হয় না?"

জ্যেষ্ঠ বলিলেন, "সে কথা ভাল। কথাটা পূর্ব্বে আমার

মনেই হয় নাই। আজই রমেশকে পত্র লিখিয়া দিতেছি। যোগেনকেও একখানা পত্র লিখি। সংবাদটা দেওয়া কর্ত্তব্য। কি বলিস ?”

শৈল কিছু বলিল না, মুখ নত করিল।

জ্যেষ্ঠ পত্র লিখিতে চলিয়া যাইলেন।

শৈল যেন একটু সুস্থ বোধ করিল—পত্র লিখিয়া যেন মনের একটা ভার নামিয়া গেল। তাহার পর সে কার্য্যান্তরে গমন করিল।

তৃতীয় খণ্ড

নদী চঞ্চল।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শঙ্কিতা।

মধ্যম ও কনিষ্ঠ পুত্রদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া শৈল পিত্রালয়ে গেল। তাহাদের পাঠাইয়া কুমুদিনী দেখিলেন, মন বড় চঞ্চল হইয়া উঠিল। মোহিনীমোহন আর নিতান্ত শিশু নহে। তাহার পাঠাদির সময় নির্দ্দিষ্ট। সুতরাং কুমুদিনীর অবসর অত্যধিক। অবসরের সঙ্গে বাড়িল কেবল ভাবনা। অতীত জীবনের সহস্র ঘটনা, বর্ত্তমান জীবনের কথা—তাঁহাকে বিব্রত করিয়া তুলিত। তিনি সর্ব্বদাই সুরেন্দ্রনাথের কথা ভাবিতেন। তাহার কারণ সুরেন্দ্রনাথের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধার বিলোপ হয় নাই। প্রেম যৌবনের স্বপ্ন মাত্র, শ্রদ্ধাই প্রকৃত ভালবাসার ভিত্তিভূমি। প্রেম যৌবনের মোহ, শ্রদ্ধা জীবনের শান্তি। প্রেম অনেক সময় নয়নের নেশা; শ্রদ্ধার উৎস হৃদয়-মূলে। প্রেম বসন্তের কুসুম—একদিন শুভক্ষণে বিহগকূজিত প্রভাতে বালার্ক কিরণে তাহার বিকাশ, আবার তাহার বিকাশও যেমন সুলভ তাহার কুসুমলীলার অবসানও তেমনই সহজ; শ্রদ্ধা তরুর বহুসাধনজাত বহুদিনের যত্নার্জ্জিত ফল। প্রেম দীপ্তদামিনী, শ্রদ্ধা দিবাকর-কিরণ। সামান্য ত্রুটিতে, অভিমানের ছায়ায় প্রেমের ঔজ্জ্বল্য ম্লান হইয়া যায়; শ্রদ্ধা চিরপুণ্যসমুজ্জ্বলা। সামান্য

কষ্টে প্রেমের বন্ধন শিথিল হইয়া যায়; বেদনায়, যাতনায় শ্রদ্ধার বন্ধন কেবল দৃঢ় হয়। প্রেম যৌবনের, শ্রদ্ধা জীবনের। প্রেম যৌবনের চঞ্চলতা; শ্রদ্ধা জীবনের সাধনা। প্রেম সৌন্দর্য্য, শ্রদ্ধা সুখ। প্রেম মধুর, শ্রদ্ধা দিব্য। কুমুদিনীর প্রেম শ্রদ্ধায় পরিণত হইয়াছিল, তাই তিনি সুরেন্দ্রনাথের প্রতি ভক্তিহীনা হইতে পারেন নাই। তাই যে স্মৃতি অন্যের পক্ষে অজস্র দুঃখের আকর, সে স্মৃতি তাঁহার নিকট সুখসমুজ্জ্বলা। সেই স্মৃতি-মন্দিরে তিনি তদ্গতচিত্তে হৃদয় দেবতার অর্চ্চনা করিতেন। তাহাতেই তাঁহার সুখ। তিনি ভাবিতেন, দেবতার দোষগুণ বিচারের ভার তাঁহার নহে; সে কার্য্য তাঁহার ক্ষমতার অতীত। তিনি উপাসিকা মাত্র।

কুমুদিনীর স্মৃতি-মন্দির পূর্ণ, কিন্তু আজ হৃদয় শূন্য—সংসারও সে শ্রীহীন। দুঃখ তুলনায়—যাতনা তুলনায়। যে সুখের আস্বাদ পাইয়াছে, দুঃখে তাহারই কষ্ট; যে সজনে বাস করিয়াছে বিজনবাস তাহারই পক্ষে যন্ত্রণা; যে যত্ন পাইয়াছে, অযত্ন তাহারই পক্ষে জ্বালাময়; যে আনন্দের আলোক উপভোগ করিয়াছে, বিষাদের অন্ধকার তাহারই পক্ষে অসহ্য। আজ শ্রীহীন সংসারে—শূন্য হৃদয়ে কুমুদিনীর কেবল ভাবনা আছে। সেই শূন্যবোধের জন্যই তিনি শৈলবালাকে আসিতে লিখিয়াছিলেন। সে আসিলে সংসারে কায বাড়িবে, স্নেহাস্পদদিগের যত্নে, শুশ্রূষায় সময় কাটিবে—কার্য্যের মধ্যে অন্যমনস্ক থাকিবার

সুযোগ ঘটিবে,—হৃদয়ের রাবণের চিতা নির্ব্বাপিত না হউক, কিছুক্ষণের জন্যও তাহার অনল-জ্বালা প্রশমিত হইতে পারিবে। সে জ্বালার অবসান অসম্ভব।

এই সময় কুমুদিনী শৈলবালার পত্রে যোগিনীর পীড়ার সংবাদ পাইলেন। পত্রখানি হস্তে লইয়া কুমুদিনী যোগেন্দ্রনাথের বসিবার ঘরে প্রবেশ করিলেন। যোগেন্দ্রনাথ তখন দ্বিতীয়বার পত্নীর পত্র পাঠ করিতেছিলেন। তাঁহার ভ্রূমধ্য কুঞ্চিত, মুখে চিন্তার ছায়া। কুমুদিনী দেবরকে পত্রখানি দিয়া বলিলেন, "ঠাকুরপো, তুমি আমাকে লইয়া চল। আমি যাইব।"

যোগেন্দ্রনাথ মুহূর্ত্ত চিন্তা করিলেন; তৎপরে বলিলেন, "রমেশের সহিত পরামর্শ করি। সে কি বলে বুঝিয়া সব স্থির করিতে হইবে।"

"তুমি এখনই রমেশকে আসিতে লিখিয়া দাও। সেত এখন আর প্রত্যহ এখানে আইসে না।"

"সে এতক্ষণে রোগী দেখিতে বাহির হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক এখনই পত্র লিখিয়া দিতেছি।"

সত্যই রমেশচন্দ্র এখন আর প্রত্যহ বন্ধুগৃহে আইসেন না। রোগী দেখা ছাড়া আর প্রায় কোথাও গমন করেন না।"

যোগেন্দ্রনাথের পত্র পাইয়া রমেশচন্দ্র প্রায় মধ্যাহ্নে বন্ধুগৃহে উপনীত হইলেন; আসিয়া যোগেন্দ্রনাথকে বলিলেন, "যোগিনীর অসুখের সংবাদ পাইয়াছ? সেই জন্য ডাকিয়াছ?"

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "হাঁ। এখন কর্ত্তব্য কি?"

"আমি আগামী প্রভাতেই রওনা হইব। তুমিও যাইবে ত?"

"আমিত যাইবই। বৌদিদি যাইবার জন্য বড় ব্যস্ত হইয়াছেন।"

"তাঁহার যাওয়া অসম্ভব। যোগিনীর অসুখের সংবাদে তিনি যে অস্থির হইবেন, তাহা আমি জানি। কিন্তু তাঁহার যাওয়া হইবে না। তোমার দাদার অনুমতি ব্যতীত তুমি তাঁহাকে কুটুম্ব-ভবনে লইয়া যাইতে পার না।"

"দাদা কি অসন্তুষ্ট হইবেন?"

"কে বলিতে পারে? তুমি অতীতের কথা ভাবিতেছ; সেই আদর্শে তাঁহাকে বিচার করিতেছ। এখন তিনি কিরূপ হইয়াছেন, আমরা তাহা জানি না। এখন তাঁহার মনোভাব কিরূপ তাহা কে বলিবে?"

যোগেন্দ্রনাথ নীরব রহিলেন। রমেশচন্দ্রের কথা বড় সত্য, বড় কঠোর। আজ যোগেন্দ্রনাথের বোধ হইল, যেন মিষ্টভাষী রমেশচন্দ্রের কথা কহিবার প্রণালীতে কিছু পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে; ভাবপ্রকাশের ধারা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। রমেশ-চন্দ্রের কথা কহিবার প্রণালীতে একটু বিশেষত্ব ছিল। তিনি মতান্তর প্রকাশ করিলে তাহাতে মনান্তরের অবকাশ থাকিত না। তিনি বিরুদ্ধমত প্রকাশ করিলে লোকে তাহাতে রুষ্ট হইত না। এখন রমেশচন্দ্র সময় সময় সে বিশেষত্ব-বর্জ্জিত হইয়া পড়েন।

যোগেন্দ্রনাথ বুঝিলেন, যে পারিবারিক অসুখ তাঁহার মুখে বিষাদ-ছায়া অঙ্কিত করিয়াছে,—তাঁহাকে অকালবৃদ্ধ সাজাইয়াছে, সেই অসুখের গরলে তাঁহার হৃদয় জর্জ্জর; তাহারই প্রভাবে তিনি এখন পরিবর্ত্তিত, সম্ভবতঃ আরও পরিবর্ত্তিত হইবেন। যোগেন্দ্রনাথ ব্যথিত হইলেন, কিন্তু কিছু বলিলেন না।

কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব—এমন সময় রমেশচন্দ্রের আগমন-সংবাদ পাইয়া কুমুদিনী সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রমেশচন্দ্র চেষ্টা করিয়া আনন হইতে চিন্তার ছায়া অপসারিত করিলেন; যেন জলের উপর হইতে মেঘের ছায়া সরিয়া গেল, আবার রবিকরে জলরাশি জ্বলিতে লাগিল।

বৌদিদি রমেশচন্দ্রকে বলিলেন, "আমাকে তোমাদের সঙ্গে লইয়া চল। আমি তোমাদের বাড়ী যাইব।"

রমেশচন্দ্র উত্তর করিলেন, "আপনি আমাদের গৃহে পদধূলি দিবেন, ইহা আমাদের পরম সৌভাগ্য। কিন্তু সে সৌভাগ্য-লাভ যখন ঘটিবে, তখন আপনাকে এত অল্পে নিষ্কৃতি দিব না। এবার আমরা আগামী কল্য যাইয়া সম্ভবতঃ পর দিনই ফিরিয়া আসিব।"

"কেন?"

"রোগীকে লইয়া আসিব। পল্লীগ্রামে সকল ঔষধাদি সর্ব্বদা পাওয়া যায় না; আবশ্যক হইলে অন্য কোন চিকিৎসকের সহিত পরামর্শ করাও অসম্ভব। সেই জন্য রোগীকে সে স্থানে রাখিব না। বিশেষ এখানে আপনি উৎকণ্ঠিতা।"

"তবে তোমরা আগামী পরশ্বই যোগিনীকে লইয়া আসিবে ?"

"খুব সম্ভবতঃ তাহাই হইবে।"

"আমার মন বড় চঞ্চল হইয়াছে। তোমরা বিলম্ব করিও না।"

কুমুদিনী কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্তা হইলেন।

রমেশচন্দ্র বলিলেন, "যোগেন, আজ এখনই টেলিগ্রাফ করিয়া দাও যে, আমরা কালই যাইব।"

যোগেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "গ্রামে কি টেলিগ্রাফ আফিস আছে ?"

"না। টেলিগ্রাফ আফিস গ্রাম হইতে তিন ক্রোশ দূরে। মাইল হিসাবে লোকের পারিশ্রমিক দিতে হইবে।"

"আচ্ছা।"

"বড়দাদা লিখিয়াছেন, ষ্টেসনে সব বন্দোবস্ত থাকিবে। তবু নিশ্চয় ইহার জন্য টেলিগ্রাফ করাই শ্রেয়ঃ।"

তাহার পর রমেশচন্দ্র বলিলেন, "বড়দাদা ত পীড়ার বিশদ বিবরণ লিখেন নাই; কেবল মোটা কয়টা কথা লিখিয়াছেন। শৈল কি সে সব কিছু লিখিয়াছে ?"

যোগেন্দ্রনাথ পত্নীর পত্র হইতে আবশ্যক অংশটুকু পাঠ করিলেন। শুনিয়া রমেশচন্দ্র মস্তক নাড়িলেন; বলিলেন, "এইটাই আমাদের ভুল। সেখানে ডাক্তার রহিয়াছে। তাহাকে দিয়া অন্ততঃ রোগনিদান লিখাইয়া দিলে বিশেষ সুবিধা হইত।"

অল্পক্ষণ চিন্তা করিয়া রমেশচন্দ্র বলিলেন, "আমি এখন উঠি। কতকগুলি ঔষধ লইতে হইবে। সেগুলি লইয়া বাড়ী যাইব। তুমি প্রস্তুত থাকিও। বেলা দশটায় ট্রেণ। আমি নয়টার সময় এখানে আসিব।"

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তুমি এখান হইতে আহার করিয়া যাইবে।"

"ভাল। কিন্তু যদি আমার বিলম্ব দেখ, তুমি অপেক্ষা করিয়া থাকিও না। হয়ত আজই আর একবার আসিব। ইহার মধ্যে যদি কোন আবশ্যক সংবাদ পাও আমাকে জানাইও।"

রমেশচন্দ্র কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

পুত্রের পীড়ার সংবাদে যোগেন্দ্রনাথ উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। দূরত্বের ব্যবধান বিভীষিকাপ্রদ; তাহার মধ্য দিয়া দেখিলে ভীতিপ্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। পুত্র নিকটে নাই। সে স্থানে কিরূপ কি ব্যবস্থা হইয়াছে—যোগিনীমোহনের স্বাস্থ্য স্বভাবতঃই ক্ষণভঙ্গুর—ইত্যাদি নানা চিন্তায় যোগেন্দ্রনাথ চিন্তিত হইয়া উঠিলেন।

কুমুদিনীর চিন্তার অবধি রহিল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দীপ নির্ব্বাণ।

"মা—"

সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে। অন্ধকার আকাশ নিবিড়জলদাবৃত; ক্বচিৎ শীর্ণ বিদ্যুৎরেখা মেঘবক্ষ বিদীর্ণ করিয়া গগনে মুহূর্ত্তমাত্র-স্থায়ী আলোক-রেখা অঙ্কিত করিয়া যাইতেছে। অপহৃত-কর-জ্যোতিঃ নক্ষত্রনিকর মেঘাবরণান্তরালবর্ত্তী—অদৃশ্য। টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। পবন-তাড়নে বৃক্ষমূলে শুষ্ক পত্ররাজি চারিদিকে সঞ্চারিত হইয়া যাইতেছে। বাহিরে প্রকৃতির এই অন্ধকার মূর্ত্তি।

কক্ষমধ্যে যোগিনীমোহন রোগ-যন্ত্রণায় শয্যায় ছট্‌ফট্ করিতেছে। কক্ষ পূর্ণ। যাহারা স্বাস্থ্যের স্থূল নিয়ম অবগত, তাহারা রোগীর কক্ষ ছাড়িয়া অন্য কক্ষে গমন করে; আমরা আর সকল কক্ষ ত্যাগ করিয়া রোগীর কক্ষে একত্রিত হই। জীবনের অপেক্ষা মমতা আমাদের নিকট অধিক আদরের। প্রতীচ্যে কাহারও পীড়ার সময় বন্ধুবান্ধবগণ কেবল সংবাদ লইয়া যায়েন; প্রাচ্যে তাঁহারা পীড়িতের নিকটে না আসিলে অসৌজন্য হয়। যে দেশের যেমন আচার। কক্ষ আলোকোজ্জ্বল; কক্ষের সকল বাতায়ন সযত্নে রুদ্ধ। কাযেই এই মাঘ মাসেও কক্ষ-মধ্যে তাপ অনুভূত হইতেছে। কক্ষ-বাতায়নের বাহিরে পবন

আর্ত্ত চীৎকার করিতেছে; বিদ্যুৎ ঝলকিতেছে; আর কক্ষমধ্যে বালক রোগ-যন্ত্রণায় শয্যায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে।

শৈলবালার জ্যেষ্ঠভ্রাতার পত্নী যোগিনীমোহনকে বীজন করিতেছেন। শৈল পুত্রের শিয়রে বসিয়া ভাবিতেছে। অজ্ঞাত আশঙ্কায় তাহার রমণী-হৃদয়—মাতৃ-হৃদয় চঞ্চল।

অতি ক্ষীণস্বরে যোগিনীমোহন ডাকিল,—"মা—"

শৈল উত্তর দিল।

পুত্র বলিল, "জল।" দারুণ পিপাসায় তাহার কণ্ঠতালু শুষ্ক হইয়া যাইতেছে, কথা কহিতে কষ্ট হইতেছে।

শৈল চামচে করিয়া ধীরে ধীরে পুত্রের মুখে জল দিল। বালক বলিল, "মা আমাকে কোলে কর।"

শৈল ব্যস্ত হইয়া পুত্রকে ক্রোড়ে তুলিল। মাতৃ-হৃদয়ের ক্ষুধা তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিতেছিল। রোগ-যাতনায় চঞ্চল বালক ক্ষণেকের জন্য স্থির হইল। সে বুঝি চির-স্বর্গ মাতৃ-অঙ্কে স্থান পাইয়া। মাতৃ-অঙ্ক সর্ব্ব যাতনায় জুড়াইবার স্থান; সকল জ্বালায় শান্তিপ্রদ। জননী জগতে দেবী।

পুত্র জিজ্ঞাসা করিল, "মা, জ্যেঠাইমা কই?"

মাতামহী উত্তর করিলেন, "অসুখ সারিলে জ্যেঠাইমার কাছে যাইবে।"

বালক মাতামহীর কথায় কাণ দিল না; আবার মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা দাদা আসিবে না?"

বুককাটা বেদনায় শৈল অস্থির হইয়া উঠিতেছিল। কষ্টে আত্ম-সংবরণ করিয়া সে বলিল, "দাদাকে লইয়া আসিতে জ্যেঠাই-মাকে লিখিয়া দিব।"

বালক বলিল, "বাবা ?"

মাতামহী উত্তর করিলেন "বাবা কাল আসিবে।"

এইবার বালক মাতামহীর দিকে চাহিল। তাহার রোগ-যাতনাক্লিষ্ট আনন যেন প্রফুল্ল হইল।

অল্পক্ষণ পরেই বালক আবার রোগ যাতনায় চঞ্চল হইয়া উঠিল।

শৈলবালার মাতা বলিলেন, "ছেলে যে বড় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল! একবার ডাক্তারকে ডাক। কিছু ঔষধ দিক।"

শৈলবালার এক ভ্রাতা কক্ষ ত্যাগ করিলেন ও অল্পক্ষণ পরেই ডাক্তারকে লইয়া আসিলেন।

যুবক-ডাক্তার রোগীর নাড়ী টিপিলেন—বিশেষ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। সেই রোগ-যাতনা-চঞ্চল শিশুকে কঠোরস্বরে স্থির হইবার জন্য আদেশ করিয়া তাপমান যন্ত্রে তাহার দেহের তাপ জানিবার চেষ্টা করিলেন। সেই তিরস্কারে বালক কাঁদিয়া ফেলিল। তাহা দেখিয়া মাতামহী বিরক্তির স্বরে বলিলেন, "এখন ঐ ছাই কি যে কাটি হইয়াছে; এখন আর নাড়ীজ্ঞান লাগে না, কাটি কিনিলেই ডাক্তার! নাড়ী দেখিয়া যাহা বুঝিতে পার নাই, কাটিতে কি তাহা বুঝিতে পারিবে? কাঁচা ছেলে; জ্বরের ধমকে অস্থির হইয়াছে; উহাকে কি স্থির করান যায়?"

চিকিৎসক অপ্রস্তুত হইলেন। কিন্তু তিনি বাহুদণ্ড সম্পূর্ণ না করিয়া ছাড়িলেন না। পকেট হইতে রবারের দুইনলযুক্ত ষ্টেথেস্‌কোপ বাহির করিয়া চক্ষু মুদিয়া রোগীর বক্ষ পরীক্ষা করিলেন। শব্দ স্বাভাবিক বোধ হইল না। যাহা হউক ভরসা দিয়া তিনি কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

চিকিৎসক আশ্বাস দিলেন বটে, কিন্তু দেখিতে দেখিতে রোগীর রোগ-যাতনার বৃদ্ধি হইতে লাগিল। বালক জর-ঘোরে জননীকে আঁকড়াইয়া ধরিতে লাগিল। জীবনের আরম্ভে যে জননী ব্যতীত অন্য আশ্রয় থাকে না, জীবনের অবসান-সময় বুঝিতে পারিয়া কি সে সেই আশ্রয়ের সন্ধান করিতেছিল? অস্ত ও উদয়, জন্ম ও মৃত্যু রূপান্তর মাত্র। মৃত্যুর অঙ্কে জীবন; জীবনে মৃত্যুর ছায়া। কেবল মায়ামোহাবিষ্ট মানবের বুঝিবার ভুল। জীবনের সম্মুখে মৃত্যুর অন্ধগহ্বর; শ্মশানের অস্থিস্তূপে জীবনের কোমলপদপল্লব সংস্থাপিত। যে অনন্তে জীবনের অবসান সেই অনন্তেই মৃত্যুর উদয়—জীবন ও মৃত্যু একই কালের উপাদান। অনন্তকালের স্রোতে কর্ম্মউৎসমুখে দুই স্রোতঃ প্রবাহিত—এক জীবন, অপর মৃত্যু: এক জাগরণ, অপর সুপ্তি। মোহ কুজ্ঝটিকার আবরণেই মৃত্যু ভীষণ দেখায়।

বালকের এই অবস্থা দেখিয়া শৈলবালার জ্যেষ্ঠভ্রাতৃবধূ শঙ্কিতা হইলেন। আজ কয় বৎসর হইল তিনি একটি শিশু হারাইয়া ছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে সে অসহায় বাহু দিয়া এমনই করিয়া

তাঁহাকে আঁকড়িয়া ধরিয়াছিল। সে কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার আঁখিতট আর্দ্র হইয়া আসিল; তাঁহার হৃদয় আশঙ্কা পূর্ণ হইল।

বাহিরে একটু বেগে বারিপাত আরব্ধ হইল। বারিপাত শব্দ ও পবনের হুঙ্কাররব শ্রুত হইতে লাগিল। সে হুঙ্কারে কক্ষের বাতায়নগুলি সশব্দে কম্পিত হইয়া উঠিতে লাগিল। রোগ-যাতনা-কাতর পুত্রকে অঙ্কে লইয়া শৈল উদ্বেগাকুল হৃদয়ে বসিয়া রহিল।

ক্রমে রজনী আরও গভীর হইল। রোগীর চাঞ্চল্যও যেন বর্দ্ধিত হইল। শৈলবালার মাতা আবার বলিলেন, "ডাক্তারকে ডাক।"

ডাক্তার আবার আসিলেন। এবার রোগীর অবস্থা দেখিয়া তাঁহার মুখ অন্ধকার হইয়া উঠিল। এত অল্প সময়ের মধ্যে এত পরিবর্ত্তন! তিনি এ আশঙ্কা করেন নাই। তিনি উত্তেজক ঔষধ আনিতে চলিলেন।

এ দিকে রোগীর চাঞ্চল্য যেন ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসিতে লাগিল। মাতামহী বলিলেন, "এইবার ঘুম আসিতেছে।" বালক আপনা আপনি দুই একটি কথা কহিল। কথাগুলি অস্পষ্ট —অতি মৃদুস্বরে উচ্চারিত।

ডাক্তার যখন উত্তেজক ঔষধ লইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, তখন আর চেষ্টা করিয়াও রোগীকে ঔষধ পান করান গেল না। ওষ্ঠাধর-সঙ্গম দিয়া মুখমধ্যে প্রদত্ত ঔষধ গড়াইয়া বাহির হইয়া আসিল। মাতামহী বলিলেন, "ঘুম আসিতেছে। একটু ঘুমাইতে

দাও। বড় ছট্‌ফট্‌ করিয়াছে।" চিকিৎসক তখন বুঝিয়াছেন, মহানিদ্রার করস্পর্শে রোগীর নয়ন-পল্লব মুদিত হইয়া আসিতেছে। তিনি ঔষধ সেবন করান অসম্ভব দেখিয়া অগত্যা পিচকারী করিয়া শরীরে ঔষধ প্রবিষ্ট করাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। বালকের মৃণালকোমল অঙ্গে পিচকারীর সূক্ষ্মাগ্র বিদ্ধ হইল। সে আঘাত যেন শৈলবালার মাতৃহৃদয়ে লাগিল। তাহার নয়ন হইতে কয় বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া অঙ্কশায়িত পুত্রের দেহে পতিত হইল। মহিলারা কেহ মুখ ফিরাইলেন; কেহ অঞ্চলাগ্রে অশ্রু-কলুষিত নয়ন মার্জ্জিত করিলেন।

তখন সেই দীর্ঘযামা যামিনীর প্রথমার্দ্ধ বিগতপ্রায়। তখনও বাহিরে বারিপাত-শব্দ শ্রুত হইতেছে। তখনও বিকম্পিতবিজলী-কেতন বাত্যা প্রকৃতিকে নিপীড়িত করিতেছে; আর পীড়িত তরুলতার একান্ত কাতর আর্ত্তরব দিকে দিকে প্রশারিত হইয়া করুণা সঞ্চার করিতেছে। কিশলয় বিচ্ছিন্ন করিয়া, লতিকাকে আশ্রয়তরুচ্যুত করিয়া, কুসুমের দলরাজি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া, প্রকৃতির রম্য কানন শ্রীহীন করিয়া উন্মত্ত পবনের একি কৌতুক? এ যেন শ্মশানে পিশাচের তাণ্ডব নৃত্য। সযত্নরক্ষিত সহস্র জীবন ফুৎকারে বিনষ্ট করিয়া কালের রঙ্গভূমিতে মৃত্যুর একি ক্রীড়া—কি আনন্দ? সে রহস্য কে ভেদ করিবে?

শরীরে উত্তেজক ঔষধের ক্রিয়া আরব্ধ হইলে বালক আবার চঞ্চল হইয়া উঠিল;—এবার চাঞ্চল্য বড়ই প্রবল। তাহাকে

অঙ্কে রক্ষা করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। এ বুঝি নিস্তরঙ্গ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে বাত্যাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের শেষ আস্ফালন। বালক আবার অস্পষ্টস্বরে কি কথা কহিতে লাগিল। শৈল পুত্রের মুখের কাছে নত হইয়া কেবল—"জ্যেঠাইমা—জ্যেঠাইমা" স্পষ্ট বুঝিতে পারিল।

দেখিতে দেখিতে বালকের চাঞ্চল্য দূর হইয়া গেল। দীপ্ত কৃষ্ণতার নয়ন-যুগল মুদিত হইল; নিস্তেজ সুকুমার দেহ মাতৃ-অঙ্কে এলাইয়া পড়িল। যেন নিশার তিমির-স্পর্শে প্রস্ফুটিত শতদল সঙ্কুচিত হইয়া গেল।

চিকিৎসক রোগীর নাড়ী দেখিলেন, তাহার পর উঠিয়া ইঙ্গিত করিয়া শৈলবালার জ্যেষ্ঠাগ্রজকে কক্ষের বহিরে লইলেন। কক্ষের বাহিরে মৃদুস্বরে উভয়ে কি কথা হইল। সাশ্রুনয়নে শৈলবালার জ্যেষ্ঠাগ্রজ কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তিনি মাতৃঅঙ্ক হইতে বালকের দেহ লইতে উদ্যত হইলেন।

তখন আর কাহারও বুঝিতে বিলম্ব হইল না। প্রাচীনারা উচ্চরবে রোদন করিয়া উঠিলেন, বধূরা অঞ্চলে আনন আবৃত করিলেন।

শৈল মাতৃহৃদয়ের পূর্ণ আবেগে পুত্রের সেই তখনও তপ্ত শব-দেহ বক্ষে চাপিয়া ধরিল। যেন কেহ তাহাকে সে বন্ধনচ্যুত করিয়া লইয়া যাইতে পারিবে না। তাহার দীর্ণ—বিদীর্ণ হৃদয় হইতে গভীরতর যাতনায় আর্ত্তনাদ উঠিল—"দিদি"—

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শোক-সংবাদ।

এখনও ট্রেণের সময়ের বিলম্ব আছে। কিন্তু বহু পূর্ব্ব হইতেই কুমুদিনী যোগেন্দ্রনাথকে ষ্টেশনে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে বলিতেছেন এবং রমেশচন্দ্রের আগমন-বিলম্বে উৎকণ্ঠিতা হইতেছেন। স্নেহ বা ভালবাসার নিকট কালের মাপ সময়ে নহে—অভাবে ও তৃপ্তিতে। তাহারা স্বল্প সময়কে সুদীর্ঘ, ও সুদীর্ঘ সময়কে একান্ত স্বল্প বোধ করায়; দীর্ঘকে হ্রস্ব ও হ্রস্বকে দীর্ঘ প্রতীয়মান করে। তাই উৎকণ্ঠাশঙ্কিতা কুমুদিনীর নিকট আজ সময় বড় দীর্ঘ বোধ হইতেছিল। তিনি স্বহস্তে যোগেন্দ্রনাথের দ্রব্যাদি গুছাইয়া দিয়াছেন; সেই সঙ্গে বাক্স পূর্ণ করিয়া যোগীনীমোহনের প্রিয় পুত্তলিটি, প্রিয় বেশটি, প্রিয় বসনখানি, প্রিয় কুসুম পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন—যদি রোগকাতর বালক কোনটি চাহে এবং না পাইয়া তাহার নয়ন-পল্লব অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠে। সে কথা ভাবিয়া স্নেহশীলা জ্যেঠাইমার নয়নপল্লব বহুবার অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

কুমুদিনীর একান্ত ইচ্ছা, তিনি যোগিনীমোহনকে দেখিতে গমন করেন। হয়ত তাহার শুশ্রূষার ত্রুটি হইতেছে; হয়ত সে তাহাকে চাহিতেছে; হয়ত শৈল তাহাকে তিরস্কার করিয়াছে;

হয়ত নূতন স্থানে—নূতন লোকের মধ্যে সে তাহার সব কথা বলিতেছে না, সব ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছে না—তাঁহার নিকটে নহিলে তাহার মুখ ফুটে না; হয়ত সকলে তাহার অভ্যস্ত বা ঈপ্সিত দ্রব্যাদি প্রদান একান্ত আবশ্যক বিবেচনা করিতেছে না; হয়ত সে অল্পে-ব্যথিত বালক ব্যথা পাইতেছে—এইরূপ শত সন্দেহে তাঁহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে। হায়—বন্ধ্যানারী, স্নেহ চিরশঙ্কাসহচর। স্নেহে সুখ কতটুকু, ব্যথা কত অধিক; তৃপ্তি কত সামান্য, আশঙ্কা কত অপরিমেয়; আশার সফলতা কত দুর্লভ, হতাশা কত সুলভ! স্নেহবন্ধনে কে কবে স্নেহের পাত্রকে আপনার করিয়া রাখিতে পারিয়াছে? স্নেহের আবরণে আবৃত করিয়া কে কবে স্নেহের পাত্রকে মৃত্যুর করস্পর্শ হইতে নিরাপদে রাখিতে পারিয়াছে? আশা ভ্রান্তি, মায়া মরীচিকা, জীবন বেদনা মাত্র। স্নেহের ফল—যে স্নেহ দান করে, তাহার জীবন অস্থির, অসুখময়, বেদনাচঞ্চল করা। স্নেহে সুখ কোথায়? জীবনে আনন্দ কোথায়? তৃপ্তি একান্ত অর্থশূন্য—চক্রবাল রেখার মত নিতান্ত অনধিগম্য। শুধু মানবমন ভুলাইবার জন্য মায়া; শুধু মায়াবদ্ধ জীবের পক্ষে কারাগৃহ নয়নরঞ্জন—চিত্তবিনোদন করিবার জন্য আশা। সব বৃথা—সব মিথ্যা।

দ্বারে একখানি শকট স্থির হইল। যোগেন্দ্রনাথকে ডাকিয়া রমেশচন্দ্র দ্বিতলে বারান্দায়—যে স্থানে কুমুদিনী ও যোগেন্দ্রনাথ

দাঁড়াইয়া ছিলেন, সেই স্থানে আসিলেন। যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "বৌদিদি ভাবিতে ছিলেন, তুমি এত বিলম্ব করিতেছ কেন?"

রমেশচন্দ্র পকেট হইতে ঘড়ী বাহির করিয়া বলিলেন, "এখনও প্রায় তিন কোয়ার্টার সময় আছে। আমি আহার করিয়া আসিয়াছি।"

রমেশচন্দ্রের বিলম্ব দেখিয়া যোগেন্দ্রনাথ প্রস্তুত হইয়া ছিলেন। কুমুদিনী বিশেষ করিয়া উভয়কে বলিয়া দিলেন, যেন সত্বরই যোগিনীকে লইয়া আসা হয়; আর যদি তাহাকে আনিতে নিতান্তই বিলম্ব ঘটে, তবে তাঁহাকে সে কথা লিখিলেই তিনি যাইবেন। বালক রোগের সময় কিরূপ শুশ্রূষা ভালবাসে, কিসে শান্ত থাকে ইত্যাদি নানা কথা বলিয়া তিনি শেষে বলিলেন, "একটু অগ্রে যাওয়া ভাল; বিলম্ব করা কিছু নহে। তোমরা যাও।"

রমেশচন্দ্র বলিলেন, "সে কথা সত্য। যোগেন, চল যাই।"

ভৃত্য রমেশচন্দ্রের গাড়ীতে যোগেন্দ্রনাথের দ্রব্যাদি তুলিয়া দিয়া আসিয়া সে সংবাদ দিল।

রমেশচন্দ্র ও যোগেন্দ্রনাথ কুমুদিনীকে প্রণাম করিয়া সোপানাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কুমুদিনী মনে মনে ভগবানের নাম লইলেন। এই সময় ভৃত্য আসিয়া যোগেন্দ্রনাথের হস্তে একখানি টেলিগ্রাম দিল। আশঙ্কায় যোগেন্দ্রনাথের

মুখমণ্ডল পাণ্ডুর হইয়া গেল। তিনি কম্পিত করে আবরণ ছিন্ন করিয়া সংবাদ পাঠ করিলেন। তাঁহার দেহ যেন মুহূর্ত্তে একান্ত বলশূন্য হইয়া গেল। তিনি সেই স্থানে বসিয়া পড়িতেছিলেন। রমেশচন্দ্র তাঁহাকে ধরিলেন। জীবনে সেই প্রথম দারুণ শোকে যোগেন্দ্রনাথ অকৃত্রিম-সুহৃদের কণ্ঠসংলগ্ন হইয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। রমেশচন্দ্রেরও নয়ন শুষ্ক রহিল না।

অদূরে কুমুদিনী এই দৃশ্য দেখিয়া মুহূর্ত্তে সব বুঝিলেন। বন্ধ্যা রমণীর নিষ্ফল স্নেহলতা যাহাকে শতবন্ধনে জড়াইয়া হৃদয়ের শূন্য অংশ পূর্ণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল, সে আজ কোথায়? সেই হর্ম্ম্যতলে ধূলিপরে নিপতিতা কুমুদিনীর ক্লিষ্ট হৃদয় হইতে দারুণ বেদনায় আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল।

পার্শ্বস্থ গৃহে চিন্তাবিষ্ট সুরেন্দ্রনাথ সেই পরিচিত কণ্ঠের করুণ আর্ত্তনাদে চমকিয়া উঠিলেন। ব্যস্ত হইয়া তিনি ভৃত্যকে ডাকিয়া সংবাদ লইলেন। ভৃত্য জানিয়া আসিয়া সংবাদ দিল। সুরেন্দ্রনাথ এই সর্ব্বনাশের সম্ভাবনার বিষয়ও অবগত ছিলেন না, তাই বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মত এই অপ্রত্যাশিত শোক দারুণ হইতেও দারুণতর বাজিল। তাঁহার চক্ষের সমক্ষে যেন জাগ্রৎ জগতের আলোক নির্ব্বাপিত হইয়া গেল; যেন মুহূর্ত্তে সংসার শ্মশানে পরিণত হইল। সে যাতনা তাঁহার হৃদয়ে এমনই বাজিল যে, শোকাতিশয্যে নয়নে শান্তি সলিলও আসিল না।

সব যায়, স্মৃতি যায় না। সব যায়, প্রকৃতির স্বহস্তগ্রথিত বন্ধন ছিন্ন হয় না। বহুবর্ষের চেষ্টায় মানব যাহা গঠিত করে, একটি ঘটনায় প্রকৃতি তাহা চূর্ণ করিয়া ফেলে। সাগর-সলিল-বিধৌত বল্মীকস্তূপের মত তাহার চিহ্নলেশও থাকে না। মানুষ অবিরল যত্নে যে ব্যবধানের সৃষ্টি করে এবং অজস্র চেষ্টায় যাহা দূর করিতে অসমর্থ হয়, আকস্মিক বিপৎপাত মুহূর্ত্তে তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিয়া যায়। মানুষ যখন ঘটনায় পড়িয়া শোণিত-সম্বন্ধ শেষ করিতে উদ্যত হয়, প্রকৃতি তখন আপনার মনে আপনি হাসে; শেষে অকস্মাৎ এক দিন অতর্কিত ঘটনার সৃষ্টি করিয়া তাহাকে তাহার দুর্ব্বলতা বুঝাইয়া দেয়। আকস্মিক বিপৎপাতে মুহূর্ত্তে প্রমাণ হয় যে, শোণিত আর সলিল এক নহে, শোণিতের সম্বন্ধ বিলুপ্ত করা মানবের সাধ্যাতীত—প্রকৃতির সহিত সংগ্রামে মানব চিরদিন পরাজিত।

আজ এই আকস্মিক বিপৎপাতে সুরেন্দ্রনাথের লজ্জার বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল; তিনি বর্ত্তমানের কথা বিস্মৃত হইলেন। সুরেন্দ্রনাথ যে অবস্থায় এ দুঃসংবাদ শুনিলেন, সেই অবস্থায় দীর্ঘকাল পরে আপনার গৃহে প্রবেশ করিলেন; পরিচিত পথে সোপান-শ্রেণী অতিক্রম করিয়া আসিলেন।

দীর্ঘকাল পরে দারুণ শোকে আজ প্রাণাধিক ভ্রাতাকে বক্ষে ধরিয়া সুরেন্দ্রনাথ কাঁদিয়া মনের ভার লাঘব করিলেন। দুই ভ্রাতার উচ্ছ্বসিত অশ্রুস্রোতে উভয়ের মনের ব্যবধান ভাসিয়া

গেল। এ অশ্রু শোকের, এ অশ্রু মিলনের; এ অশ্রু অভিমানের, এ অশ্রু অনুতাপের। সুরেন্দ্রনাথ কাঁদিলেন। আজ শোকের বন্ধন প্রকৃতির বন্ধনকে দৃঢ়তর করিয়া ভ্রাতাকে ভ্রাতার বক্ষে ফিরাইয়া আনিল; পবিত্র সম্বন্ধকে অপগত মালিনত্য—পুণ্য-সমুজ্জ্বল করিয়া দিল।

সুরেন্দ্রনাথ ভ্রাতাকে কক্ষমধ্যে লইয়া বসাইলেন। যোগেন্দ্রনাথ বহুদিন পরে জ্যেষ্ঠকে দেখিলেন—তাঁহার দেহে আর সে শ্রী নাই; আননে আর সে লাবণ্য নাই; উন্নত কপাল চিন্তারেখাঙ্কিত; মস্তকের দুই পার্শ্বে কেশরাশি শ্বেত হইয়া আসিয়াছে; নয়নে আর সে সরল দৃষ্টি নাই—দৃষ্টি প্রায়ই মৃত্তিকাসংলগ্ন।

সেই শোকের অন্ধ তমিস্রায় কুমুদিনীর সহিত সুরেন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ হইয়া গেল। কেহ কোন কথা কহিলেন না। প্রকৃত দারুণ শোকে বাক্যের অবসর থাকে না। শোকের সান্ত্বনা বাক্যে নহে। একই দারুণ শোকে যাহারা অশ্রুপাত করে, তাহাদের মধ্যে বাক্যের প্রয়োজন কি? শোকের একত্ব ও সমবেদনাই যথেষ্ট। শোকে যে সমবেদনাভাগী, সে শোকের অংশ লইয়া সান্ত্বনা দেয়; তাহারও হৃদয় পূর্ণ; তাহার মুখে বাক্য থাকে না। শূন্য কুম্ভেই শব্দ অধিক; আন্তরিকতাহীন শোকই বাক্য-বাহুল্য-চিহ্নিত। তাই যাহারা পর তাহারাই শোকে কথা কহিয়া—বুঝাইয়া সান্ত্বনা দিতে আসে, যে ব্যথারব্যথী সেও অশ্রুর উচ্ছ্বাসে বাক্যস্ফূর্তিহীন হয়।

কিন্তু সহস্র কথায় যাহা হইবার সম্ভাবনামাত্র ছিল না, নীরব অশ্রুবর্ষণে তাহা হইল। পতিপত্নীর পরস্পরের হৃদয়ে পরস্পরের হৃদয় প্রতিবিম্বিত হইল। উভয়ে উভয়কে বুঝিলেন; বুঝিয়া সুখী হইলেন। ধূল্যবলুণ্ঠিতা—রোদননিরতা পত্নীকে দেখিয়া সুরেন্দ্রনাথ বুঝিলেন, দূরে যাইয়া তাঁহার হৃদয়ে কুমুদিনীর সমুজ্জ্বল পুণ্যজ্যোতিশ্ছটাবেষ্টিত যে দেবীত্বের আদর্শ স্ফুটতর হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা কেবল কল্পনাপ্রসূত নহে; পরন্তু বাস্তবের বেদীতে সংস্থাপিত, কোমলতায় গঠিত, করুণাশ্রীবিমণ্ডিত, স্নিগ্ধ শান্তিসমলঙ্কৃত। তাই তিনি সুখী হইলেন। কুমুদিনী বুঝিলেন, স্থানের ব্যবধানে সুরেন্দ্রনাথের প্রকৃতিতে ব্যবধান সৃষ্ট হয় নাই। আজও তিনি সেই কোমলপ্রকৃতি—স্নেহশীল সুরেন্দ্রনাথ। তাই তিনিও সুখী হইলেন।

* * * * * *

রমেশচন্দ্র বলিলেন, "আমার বিবেচনায় শৈলকে আর সেখানে না রাখিয়া এখানে আনা কর্ত্তব্য।"

সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তাহাই শ্রেয়ঃ।" কিন্তু বলিয়াই কেমন সঙ্কোচ বোধ করিলেন, যেন তিনি আর পূর্ব্বের মত বলিবার অধিকার হারাইয়াছেন। তাঁহার হৃদয়ে যাতনার উপর যাতনা বাজিল।

যোগেন্দ্রনাথ যাইয়া শৈলকে আনিবার কথা হইল। যোগেন্দ্রনাথ একান্ত কাতরস্বরে বলিলেন, "রমেশ, তুমি যাও।"

যোগেন্দ্রনাথ কেন যে স্বয়ং যাইতে চাহিলেন না, রমেশচন্দ্র তাহা বুঝিতে পারিলেন, আর দ্বিরুক্তি করিলেন না।

স্থির হইল, রমেশচন্দ্রই যাইয়া শৈলকে কলিকাতায় আনিবেন।

অশ্রুআবিললোচনে—কম্পিতকণ্ঠে কুমুদিনী বলিলেন, "রমেশ, তবে তুমি আজই যাও।"

ঘড়ী দেখিয়া রমেশচন্দ্র বলিলেন, "ট্রেণের সময় অতীত হইয়া গিয়াছে। আমি আজ রাত্রির গাড়ীতে যাইব।"

কুমুদিনী বলিলেন, "কালই ফিরিও।"

তাঁহার ব্যগ্রতায় রমেশচন্দ্র সেই প্রস্তাবেই সম্মত হইলেন।

পুত্রশোকাতুরা ভগিনীকে কলিকাতায় আনিবার জন্য সেই দিন রাত্রির ট্রেণে রমেশচন্দ্র পৈতৃক ভবনে যাত্রা করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

শোক।

পুত্রশোকাতুরা শৈলবালা পিত্রালয় হইতে প্রত্যাবৃত্তা হইল। স্মৃতিই জ্বালার মূল—স্মৃতি সঙ্গে সঙ্গে যায়। যে গৃহে তাহার মৃত পুত্রের সকল স্মৃতি বিজড়িত, শৈল সেই গৃহে ফিরিয়া আসিল; স্মৃতি সঙ্গে লইয়া আসিল—স্মৃতির অগ্নিতে ইন্ধন সংযোগের অবকাশ লইয়া আসিল। কেবল সমবেদনা-কাতরা কুমুদিনীর কাছে আসিল; কেবল সমশোকাতুর পতির নিকটে আসিল।

কুমুদিনী দেখিলেন, শৈল আর সে শৈল নাই। সে ক্রীড়া-কৌতুকিনী চপলা এখন বিষাদভারাবনতা; সে চঞ্চল চক্ষু এখন সর্ব্বদাই অশ্রু-সজল; সে সদা-প্রফুল্ল-ভাব এখন শোকের প্রবাহে বিধৌত; সে প্রস্ফুটিত কুসুমের লাবণ্যের মত লাবণ্য এখন ম্লান—যেন নিদাঘের তপ্ত শ্বাসে বসন্তের বনশোভা শুকাইয়া উঠিয়াছে। তাহার আর বেশভূষায় যত্ন নাই, আর পরিপাট্য নাই। আননে বিষাদ-কালিমা; নয়ন কোটরগত; গণ্ডে অস্থি দেখা যাইতেছে; রুক্ষ কুন্তলজাল মুখে চক্ষে আসিয়া পড়িয়াছে। শোক সে আননে আপনার মসি ঢালিয়া গিয়াছে; বিষাদ সে আননের প্রফুল্লভাব হরণ করিয়াছে। পুত্রশোক-কাতরা জননীর হৃদয়ে কি আর সুখ থাকে? কালের অমোঘ বিস্মৃতি-প্রলেপেও

সে শোকের ক্ষতচিহ্ন যায় না ; শোক কালজয়ী—শোক জীবনের সাথী, বুঝি মরণেও সহগামী। পুত্রশোকাতুরা জননী বিষাদ প্রতিমা।

শৈল দেখিল, এ কয়দিনে কুমুদিনীর যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে, জীবনের দারুণ বেদনায়ও তাহা হয় নাই। রমণীর সব সহে—স্নেহে আঘাত সহে না। কেন না সে আঘাত স্বপ্নেরও অগোচর, কল্পনারও অতীত, একান্ত অপ্রত্যাশিত, নিতান্ত বেদনার। ভালবাসায় আঘাত বরং সহ্য হইতে পারে, স্নেহে আঘাত সহে না। বিধবা রমণী পুত্রের সংসারে যেন সব ভুলিয়া থাকেন, শেষে বার্দ্ধক্যে পরলোকগত পতির অভ্যাস, ব্যবহার, আদর প্রভৃতির কথা কহিতে আর স্মৃতির দংশন দারুণ বোধ হয় না। কিন্তু পুত্রশোকাতুরার জীবনে আর কি থাকে? বহুদিন পূর্ব্বে মৃত শিশুর কথা স্মরণ করিতেও বৃদ্ধা জননীর চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া আইসে। ভালবাসায় প্রতিদানের প্রত্যাশা থাকে—স্নেহ একান্ত নিঃস্বার্থ। পতির উপর অভিমান করা স্বাভাবিক ; পুত্রের শত অপরাধ জননীর নিকট ক্ষমার যোগ্য। প্রেম সামান্য ত্রুটিকে বৃহৎ করিয়া দেখায়, স্নেহ গুরুতর ত্রুটিকেও গণনায় আনে না। প্রেমে বাসনা আছে, স্নেহ বাসনালেশশূন্য। তাই রমণীর সব সহে—স্নেহে আঘাত সহে না।

বন্ধ্যা কুমুদিনীর সঞ্চিত অপত্যস্নেহ দেবরের পুত্রদিগকে লইয়া তৃপ্ত হইয়াছিল ; তাই যোগিনীমোহনের মৃত্যুশোক কুমুদিনীর

হৃদয়ে পুত্রশোকের মত বাজিয়াছিল। সে শৈশব হইতে কাহার অঙ্কে পালিত; কাহার স্নেহে বর্দ্ধিত? কাহাকে সে মাতার অধিক ভালবাসিত; কাহার নিকট হইতে সে জননীর নিকটেও যাইতে চাহিত না? কাহাকে না দেখিলে সে কাঁদিয়া সারা হইত; মাতার উপর রাগ করিয়া সে কাহার কাছে শান্ত হইত? কাহাকে ছাড়িয়া সে শেষবার মাতার সহিত মাতুলালয়ে যাইতে কাঁদিয়াছিল, এবং কাহার প্রবোধ ব্যতীত সে কিছুতেই যাইতে চাহে নাই? তাহার পীড়ায় কে অনিদ্র হইয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে নিশা জাগিয়াছে? কাহার হস্তে নহিলে সে শিশু ঔষধ গ্রহণ করিত না? তিনি কি তাহাকে পুত্রের অধিক ভালবাসেন নাই? সে যে তাঁহার পুত্রেরও অধিক, বুঝি প্রাণেরও অধিক!

পশু-সহজাত-সংস্কার-বশে শত্রু মিত্র চিনিয়া লয়। মানব হৃদয়ও তেমনই স্বভাবদত্ত ক্ষমতায় কে প্রকৃত ব্যথারব্যথী তাহা বুঝিতে পারে। শৈলবালা বুঝিতে পারিল, তাহার হৃদয়ের মত কুমুদিনীর হৃদয়েও পুত্রশোক বাজিয়াছে; তিনিও তাহারই মত ব্যথিতা, তাহারই মত শোকাতুরা; তিনি তাহার হৃদয়ের ব্যথার অংশী—তাঁহার কাছে কাঁদিলে অশ্রুতে অশ্রু মিশিবে;—হৃদয়ে হৃদয় মিশিবে; হৃদয়ের ভার প্রশমিত হইবে।

দারুণ শোকে দুইজনে সাক্ষাৎ। কুমুদিনী কাঁদিলেন - শৈল কাঁদিল। উভয়ে একই শোকে কাতর; কে কাহাকে সান্ত্বনা

দিবে? তবে আজ সমবেদনাকাতরা কুমুদিনীর কাছে কাঁদিয়া শৈলবালার হৃদয়ের ভার কিছু প্রশমিত হইল।

বড় গুমটের পর যেমন এক পশলা বৃষ্টি হইলে ধরণী শীতল হয়, তেমনই বেদনায় সমবেদনাকাতরের সহিত কাঁদিতে পারিলে বেদনার লাঘব হয়। এ কয় দিন কুমুদিনীর মনের কথা মনেই রহিয়া অহরহঃ বর্দ্ধিত হইয়াছে। এ কয়দিন তিনি কেবল মৃত বালকের খেলিবার পুত্তলি, পরিধেয় বসন প্রভৃতি সাজাইয়াছেন, গুছাইয়াছেন—আর অশ্রুসিক্ত করিয়াছেন; দারুণ বেদনা প্রকাশ করিতে পারেন নাই—তাই হৃদয়ের ভার লাঘব হয় নাই। আজ শোকাতুরা শৈলবালার সঙ্গে কাঁদিয়া তিনি হৃদয়ে অননুভূতপূর্ব্ব স্নিগ্ধ শান্তি অনুভব করিলেন। বেদনার দারুণতা যেন দূর হইয়া গেল।

দুইজনে সাক্ষাতে কেহই কথা কহিতে পারিলেন না; কেবল অশ্রুতে অশ্রু মিশিল। যখন শোকে কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ, তখন কথার অবকাশ থাকে না; তপ্ত অশ্রু বাক্যের স্থান অধিকার করে। তাই আজ সাক্ষাতে এই দারুণ শোকে এই বিষম মর্ম্মব্যথায় দুই ভগিনী কেবল কাঁদিলেন।

* * * * * *

যোগেন্দ্রনাথ স্বয়ং শৈলকে আনিতে গমন করেন নাই। শৈল ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার সাক্ষাৎ পায় নাই। তাই এই বড় দুঃখের সময়েও শৈলবালার অভিমান হইল। যখন হৃদয়

একে পূর্ণ থাকে, তখন অপরের স্থান হওয়া দুষ্কর। শৈলবালার শোককাতর হৃদয়ে অভিমান ক্ষীণ হইলেও অভিমানের অঙ্কুর দেখা দিল। অভিমান যৌবনের ধর্ম্ম।

যোগেন্দ্রনাথ কেন যে তখনও তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই, শৈল তাহা বুঝিতে পারে নাই। তাঁহারও হৃদয় পূর্ণ, তিনিও পুত্রশোকাকুল। তিনি জানিতেন, প্রথম সাক্ষাতে কেহই আত্মসংবরণ করিতে পারিবেন না, তাই যেস্থানে বিজনে উভয়ের কাঁদিবার সুযোগ হইবে, সেই স্থানেই উভয়ের সাক্ষাৎ বাঞ্ছনীয়। শৈল তাহা বুঝিতে পারে নাই; পারে নাই বলিয়াই স্বামীর ব্যবহারকে উপেক্ষা মনে করিয়াছিল। আর স্বামীর এই প্রতীয়মান উপেক্ষা পুত্রশোককাতরার হৃদয়ে বড় ব্যথা দিয়াছিল।

সারাদিন দিদির কাছে কাঁদিয়া শৈল স্বামীর কাছে গেল। যোগেন্দ্রনাথ তখন অধ্যয়ন-কক্ষে কৌচে বসিয়া—যুক্তবাহুযুগলমধ্যে মুখ ন্যস্ত।

শৈল ধীরে ধীরে যাইয়া স্বামীর পার্শ্বে বসিল।

যোগেন্দ্রনাথ মুখ তুলিলেন। উজ্জ্বল দীপালোকে শৈল দেখিল, তিনি কাঁদিতেছেন—তখনও গণ্ড বহিয়া অশ্রু ঝরিতেছে।

শৈল শোককাতর স্বামীর অশ্রু-সজল নয়নে ও বিষাদচ্ছায়াময় আননে আপনার অতি দারুণ শোকের প্রতিচ্ছবি দেখিল। তাহার পর স্বামীর বাহুপাশবদ্ধা শৈলবালার মস্তক আপনা হইতেই স্বামীর বক্ষে আসিয়া পড়িল।

সেইখানে—সেই সুখে চিরঅতৃপ্তি; দুঃখে দুঃখনিবারণ; সুখে—দুঃখে, বিপদে—সম্পদে, বিষাদে—পুলকে চরম ও পরম আশ্রয় দয়িত-হৃদয়ে মুখ গুঁজিয়া শৈল কাঁদিতে লাগিল। যেন ঝঞ্ঝাবাত-তাড়িতা—বিচ্ছিন্নকোরকা, লূনপল্লবা ব্রততী আশ্রয়-তরুর প্রসারিত বাহুপাশবদ্ধা হইয়া শোক প্রকাশ করিতে লাগিল; যেন নির্দ্দয় শরে গতপ্রাণ-শাবকের শোককাতরা হরিণী আশ্রয়-গুহায় উপনীতা হইয়া আয়ত, কোমল নয়নে অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল। আর যোগেন্দ্রনাথের অশ্রু সেই আলুলায়িত কুন্তলা—শোকাতুরা—তিনি সর্ব্বস্বা পত্নীর কেশজ[illegible]পতিত হইতে লাগিল।

সেই অভিমান ও রহস্য সমুজ্জ্বল বিদায় দিনে কে কল্পনা করিয়াছিল, দারুণ শোকের ছায়ায় উভয়ের মিলন—অদৃষ্ট লিপি? হায়, বসন্তের কুসুম-সৌরভ-ভার-কাতর মৃদু-মলয়-সেবিত পূর্ণিমায় কে নিদাঘের বিদ্যুৎ-কেতন নিকষকৃষ্ণ মেঘের কথা স্মরণ করে? জীবনের সুখের দিনে কে আসন্ন দুঃখের ছায়াপাত লক্ষ্য করিতে পারে? মানবের অদৃষ্টকার তাহার সুখের জন্য তাহাকে সে বিষয়ে অন্ধ করিয়াছে। সে বিষয়ে অন্ধত্বেই সুখের একমাত্র সম্ভাবনা। নহিলে জীবনে সুখ থাকিত না; সুখের আস্বাদও তিক্ত হইত। সে দিন যাহা স্বপ্নেরও একান্ত অগোচর ছিল, আজ তাহা নিতান্ত নিষ্ঠুর সত্য। অদৃষ্টের উপহাস এমনই নিদারুণ! জগতে সম্ভবে ও অসম্ভবে প্রভেদ

কতটুকু? উভয়ের মধ্যে সীমারেখা কত সঙ্কীর্ণ! মায়াবী অদৃষ্টের মায়াদণ্ডের স্পর্শমাত্রে অসম্ভব সম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। ভ্রান্ত মানব সীমাবদ্ধ বুদ্ধিতে সম্ভব ও অসম্ভব লইয়া বৃথা তর্ক করে।

কেহ কোন কথা কহিলেন না; কেবল উভয়ের অশ্রু অবিরল ঝরিতে লাগিল, সে অশ্রুতে কি বেদনা, কি সুখ, কি যাতনা, কি শান্তি! জীবনে অনেক সময় দৃষ্টি ও অশ্রু বাক্যের অপেক্ষা অধিক অর্থব্যঞ্জক – অধিক মর্ম্মস্পর্শী। কে তাহা অনুভব করে নাই? বাক্য আন্তরিকতা হীন—শূন্যগর্ভ-হৃদয়-জাত। অশ্রু হৃদয়ের গভীরতম শোকসাগর মন্থনের ফল। বাক্য দাম্ভিকতা, অশ্রু কোমলতা; বাক্য যে স্থানে যাতনা, অশ্রু সে স্থানে সান্ত্বনা।

সেই দিন স্বামীর বক্ষে কাঁদিয়া—স্বামীর শোকাশ্রুপাতে অভিষিক্তা শৈলবালা বুঝিয়া গেল,—শোক একা তাহার নহে; বেদনা কেবল তাহারই হৃদয়ে বাজে নাই। বেদনার যাতনা যেন বহু পরিমাণে প্রশমিত হইল।

* * * * * * * *

প্রত্যূষে যাইয়া শৈল দেখিল, কুমুদিনীর অভুক্ত শয্যা পড়িয়া আছে; তিনি হর্ম্ম্যতলে। বোধ হয় সারারাত্রি অনিদ্রায় রোদনের পর প্রভাতে তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হইয়াছে। তখনও তাঁহার চারিদিকে তাহার মৃত পুত্রের ব্যবহৃত নানা দ্রব্য পড়িয়া আছে। কতকগুলি দ্রব্য বক্ষে লইয়া তিনি ঘুমাইয়াছেন।

প্রেমের জয়।

শৈলবালার নয়ন অশ্রুতে ও হৃদয় ভক্তিতে পূর্ণ হইয়া আসিল। সে নিশ্চল হইয়া নিদ্রিতা দেবীমূর্ত্তি দর্শন করিতে লাগিল। মুহূর্ত্তের জন্য অশ্রুবিন্দু আঁখিতটে আসিয়া স্থির হইয়া রহিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

শোকের ফল।

গভীর শোক, গভীর প্রেম ও গভীর ধর্ম্মভাবাবেশের মত বিজন-প্রিয়। শোকে জনসঙ্গ পীড়াদায়ক; প্রেমে চিন্তাসহচর, কল্পনামধুর নিঃসঙ্গ সর্ব্বদা বাঞ্ছিত; ধর্ম্মালোচনার প্রকৃষ্ট স্থান নির্জ্জন গিরিগুহা বা লোকালয় হইতে সুদূর কানন। অনেক সময় গভীর শোক বা প্রেমে হতাশা ধর্ম্মের দ্বার মুক্ত করিয়া দেয়; মানব নূতন আলোকে আপনার কৃতকর্ম্ম ও জীবন লক্ষ্য করে।

বহুদিন চিন্তার তুষানলে যাহা হয় নাই, আজ শোকে সুরেন্দ্রনাথের তাহা হইল। যেমন গাঢ় মেঘান্ধকার নিশায় সহসা বিকশিত-বিদ্যুদ্দীপ্তিতে ঝঞ্ঝাবৃষ্টিবজ্রবিপন্না প্রকৃতির কাতর মূর্ত্তি মুহূর্ত্তমধ্যে পথিকের নয়ন সমক্ষে প্রতিভাত হইয়া উঠে, তেমনই এই আকস্মিক শোকে সুরেন্দ্রনাথের চক্ষে তাঁহার সমস্ত দুর্দ্দশা স্পষ্টতর হইয়া উঠিল। এতদিন যে অনুতাপ-তুষানল তাঁহার হৃদয় দগ্ধ করিতেছিল, আজ তাহা দীপ্ত বহ্নিতে পরিণত হইল। তাহার শত শিখার জ্বালা তাঁহার হৃদয়ে শত বিষধরের দংশন-জ্বালার মত তীব্রতম হইয়া উঠিল। সেই দারুণ জ্বালায় সুরেন্দ্রনাথ একান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। প্রথম শোকো-

চ্ছ্বাসের প্রশমন ও লজ্জার উদয়ে গৃহ হইতে নূতন আবাসে ফিরিয়া তিনি ভাবিতে বসিলেন।

আজ সুরেন্দ্রনাথ আপনার কৃত কর্ম্মের সম্পূর্ণ ফল বুঝিতে পারিলেন। নিজকর্ম্মদোষে তিনি প্রাণের পুত্তলিদিগের নিকট হইতে কতদূরে আসিয়া পড়িয়াছেন! আজ এই শোকে যাহাদিগের সহিত কাঁদিলে শোক-যাতনা অর্দ্ধেক প্রশমিত হইত; তাঁহার সহানুভূতিতে যাহাদের দাবানলদগ্ধ হৃদয়ে শান্তিবারি সিঞ্চন হইত; এই শোকে যাহাদিগকে সান্ত্বনা দান করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য, আজ তিনি নিজকর্ম্মদোষে তাহাদের নিকটে নাই—স্বহস্তে তাহাদের মধ্যে ও আপনার মধ্যে বিষম ব্যবধান নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আপনার দুষ্কৃতির ব্যবধান এখন লজ্জা-যোগে দৃঢ়তর ও দুর্ভেদ্যতর হইয়াছে। একপার্শ্বে তাঁহার আপনার বলিতে যাহারা তাহারা সকলে, আর এক পার্শ্বে তিনি একক—অনুতাপ-যাতনা-জর্জ্জরিত—কাতর। অশ্রুই এখন তাঁহার একমাত্র সম্বল। আজ সে ব্যবধান ভঙ্গ করিয়া তাহাদিগের নিকটে যাইতে তিনি যত ব্যগ্র, বোধ হয় মরণাহত মানব মানস-কল্পিত দিব্যধামে যাইতেও তত ব্যগ্র হয় না। কিন্তু তাঁহার আর সে সাধ্য আছে কি? তাই এখন অশ্রুই তাঁহার একমাত্র সম্বল।

সুরেন্দ্রনাথ বুঝিয়াছেন, আজ সেই শোককাতরদিগকে সান্ত্বনা দান তাঁহারই কর্ত্তব্য। কিন্তু তিনি তাহাতে অশক্ত।

যখন কর্ত্তব্যে ও অবস্থায় বিরোধ উপস্থিত হয়, তখন হৃদয়-সমুদ্র-মন্থনে গরল ব্যতীত আর কি উঠে? সে গরল-জ্বালায় সমস্ত জীবন যাতনা-চঞ্চল হইয়া উঠে। যাহার কর্ত্তব্য-জ্ঞান আছে, তাহার পক্ষে বাধ্য হইয়া কর্ত্তব্যপালনবিমুখতার মত যাতনা আর কিছুতেই নাই। তাই বলিয়াছি, আজ অশ্রুই সুরেন্দ্রনাথের একমাত্র সম্বল।

সুরেন্দ্রনাথ একা থাকিতে ভালবাসেন। সঙ্গী—কেবল চিন্তা। আর কাহারও সঙ্গ এখন কষ্টকর। আফিসের কায আর ভাল লাগে না; ছুটি লইলেন। তিনি এখন কেবল প্রভাতে, মধ্যাহ্নে, সন্ধ্যায়, নিশীথে চিন্তা করেন; চিন্তা করেন—আর অশ্রুবিসর্জ্জন করেন। কতদিন নিশীথে নলিনী দেখিয়াছে, বিনিদ্র সুরেন্দ্রনাথ বসিয়া চিন্তা করিতেছেন; দীপালোকে তাঁহার গণ্ড বহিয়া প্রবাহিত অশ্রুধারা শরতের আকাশে ছায়াপথের মত দেখাইতেছে। তিনি যেন বাহ্যজ্ঞান-হত। সহসা কোন শব্দ হইলে তিনি চমকিয়া উঠেন, যেন তিনি কোন চিন্তায় তন্ময়। তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার প্রয়াস পাইতে নলিনীর সাহস হইত না। তাই সেও কাঁদিত; কাঁদিত আর নিজের অবস্থা বুঝিত। সে যখন দেখিত, সুরেন্দ্রনাথকে শোকে সান্ত্বনা দিবার সাহস তাহার নাই, তখন অধিকারের কথা মনে পড়িত; আর সঙ্গে সঙ্গে মানসপটে সুরেন্দ্রনাথের অশ্রুবিপ্লুত আননের পার্শ্বে জ্যেষ্ঠার বিষাদ-মলিন মুখচ্ছবি ফুটিয়া উঠিত। এই কারণে

শোকের সময় শোককাতরা কুমুদিনী স্বামীর ব্যবহারে ব্যথিত হৃদয়ে কি দারুণ ব্যথা পাইতেছেন, সে তাহা কল্পনা করিত। কল্পনা কেবল যাতনা বাড়াইত—কেবল কাঁদাইত। তাই সেও কেবল কাঁদিত; কাঁদিত—আর বুঝিত, অদৃষ্টের কঠোর শাসন অদূরবর্ত্তী। তাহা ভাবিয়া সে শিহরিয়া উঠিত। অভাগিনী জগতের আর সব ত্যাগ করিয়া যে আশ্রয় লইয়াছে, সে আশ্রয়চ্যুতির কল্পনা তাহার পক্ষে বড় যাতনার। হৃদয়ের সর্ব্বগ্রাসী বৃত্তির মূলোৎপাটন কি সহজসাধ্য—সম্ভব?

নলিনী ভাবিয়া দেখিত, সে বিষবল্লরীর মত আশ্রয়-তরুর সর্ব্বনাশ করিয়াছে। তবুও সে সেই আশ্রয়—ত্যাগের কল্পনা করিলেই কাঁদিত; কাঁদিত, আর বুঝিত—অদৃষ্টের শাসন আরব্ধ হইয়াছে। অদৃষ্টের অশনির আঘাত হইতে অব্যাহতি লাভের উপায় নাই; তাহা অব্যর্থ—তাহা ভীষণ। অদৃষ্টের রোষ-কষায়িত লোচন দেখিয়া নলিনী ভাবিত, অদৃষ্টের সহিত তাহার বিবাদ কেন? নিয়তি তাহার পক্ষে কোন দিনই স্নেহশীলা জননী নহে; চিরদিনই কমঠ-কঠোর বিমাতা। তাহার ভাগ্যে অদৃষ্টের স্নেহলাভ ঘটে নাই; সে পাইয়াছে—কেবল তিরস্কার, কেবল শাসন। বুঝি সেই জন্যই সে ভ্রান্তিবশে অদৃষ্টের গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল—নিষিদ্ধ স্থানে আসিয়াছিল—অদৃষ্টের সহিত বিবাদ করিয়াছিল। এখন সে সেই অবিমৃষ্য-কারিতার—সেই দুঃসাহসিকতার ফলভোগ করিতেছে। হায়—

অদৃষ্টের সহিত সংগ্রাম করিয়া কে কবে জয়ী হইতে পারিয়াছে? চাপল্য-প্রণোদিতা হইয়া সে যে খেলা খেলিতে গিয়াছিল, তাহার ফলে সে কেবল হৃদয়মূলে বেদনার উৎস রচনা করিয়াছে—পরিচিত, অভ্যস্ত পথ ত্যাগ করিয়া কঙ্কর-কণ্টকিত, অপরিচিত পথে আসিয়াছে—কুলবালার স্বহস্ত-সিঞ্চিত প্রাঙ্গণ লতার কোমল কোরক অগ্নিশ্বাসী মরুতে আনিয়াছে—জীবনের সুখ ও শান্তি চরণে দলিয়া সাধ করিয়া কণ্টক-মুকুট মস্তকে পরিধান করিয়াছে। আজ তাহার অশ্রু ভিন্ন আর কি আছে? তাই নলিনীও কেবল ভাবিত—ভাবিত, আর কাঁদিত।

এক দিন অপরাহ্নে সুরেন্দ্রনাথের মনে হইল, কিছু দিনের জন্য কলিকাতা ছাড়িয়া কোথাও যাইবেন। পরপারে ষ্টেসনে সন্ধান লইবার উদ্দেশ্যে তিনি যাত্রা করিলেন। কিন্তু গাড়ীতে বসিয়াই চিন্তা আসিল; সুরেন্দ্রনাথ বুঝিলেন, তিনি শৃঙ্খলবদ্ধ,—তাঁহার পক্ষে গমন অসম্ভব। তিনি সেতুর উপর গাড়ী থামাইয়া অবতরণ করিলেন—যান-চালককে গৃহে ফিরিয়া যাইতে অনুমতি করিলেন। যান-চালক ভৃত্য মাত্র; সে চলিয়া গেল।

সেতুর রেলিং ধরিয়া সুরেন্দ্রনাথ দাঁড়াইলেন। ঊর্দ্ধে ধূম মলিন নীল গগন; পশ্চিমে অস্ত-রবির চিতা-শয়ন বিচিত্র বর্ণ জালে শোভাময়। অদূরে নয়ন-বিমোহন প্রাকৃতিক দৃশ্য বিকৃত করিয়া কর্ম্মক্ষেত্র শত কলের চিমনী ধূমোদগীরণ করিতেছে। দুই দিকে রাজপথে জলস্রোতের মত জনস্রোতঃ প্রবাহিত। কেবল

কর্মের কোলাহল কেবল ব্যস্ততা। নিম্নে কল কল গদ গদ নাদে বীচিমালিনী জাহ্নবী প্রবাহিতা। নদী-বক্ষে তীর-বদ্ধ তরণী সকল নদীর তরঙ্গ-ভঙ্গে কম্পিত-কলেবর; কোন জলযানের বিস্ফারিত চিম্‌নী হইতে ধূম উঠিয়া শান্ত সমীরণে কিছু দূর সরল ভাবে উঠিয়া ছড়াইয়া পড়িতেছে। মধ্যে মধ্যে দুই একখানি ক্ষুদ্রকায় ষ্টীমলঞ্চ অনাবশ্যক শব্দাতিশয্যে অতি ব্যস্ত ভাবে গতায়াত করিতেছে। সুরেন্দ্রনাথ দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন। জাহ্নবী-তরঙ্গ-সঙ্গ-শীতল সমীরণ তাঁহার মুখে, চক্ষে সস্নেহ-স্পর্শ দিতে লাগিল। ক্ষণকালের জন্য তিনি বেদনাক্লিষ্ট—অনুতাপ তপ্ত হৃদয়ের যাতনা বিস্মৃত হইলেন।

কিছুক্ষণ পরে সুরেন্দ্রনাথ পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেন, প্রাসাদ-মালিনী পাষাণ-নগরী অন্ধকার অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়াছে। রাজপথে ধাবমান আলোক মরীচিকা সৃষ্ট করিয়া যান গতায়াত করিতেছে। জনকোলাহল দূরাগত সাগর-গর্জ্জনবৎ শ্রুত হইতেছে। সুরেন্দ্রনাথ ফিরিলেন।

সেতু পার হইয়া সুরেন্দ্রনাথ দক্ষিণে কিছু দূরে অগ্রসর হইলেন। দক্ষিণে ভাগীরথী, বামে প্রান্তর। সুরেন্দ্রনাথ নদী-তীরে উপবেশন করিলেন। তটভূমিতে জাহ্নবীবারির তরঙ্গাঘাত স্নিগ্ধ মধুর বোধ হইতে লাগিল। অদূরে নদীমধ্যভাগে তরঙ্গ-শালিনী প্রবাহিনীর অষ্টমীর চন্দ্রকরোজ্জ্বল রূপ মনোহর। প্রকৃতি সুন্দরী। ভক্তের হৃদয়ে সে সৌন্দর্য্য ভক্তির উৎপাদন

করে। কবির চক্ষে সে সৌন্দর্য্য চিরদিন উপভোগ করিলেও তৃষ্ণা মিটে না। প্রকৃতি সর্ব্বার্থদায়িকা—যে যেভাবে তাঁহাকে কামনা করে, তিনি সেই ভাবে তাঁহাকে দর্শন দান করিয়া কৃত-কৃতার্থ করেন। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য চির-নবীন চির-মধুর। জাহ্নবী-কূলে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরণী বদ্ধ। দিনান্তে শ্রম-কাতর মাঝিরা আহারের আয়োজন করিতেছে। তাহাদের হৃদয় দুশ্চিন্তা-কাতর নহে। দিনান্তে—শ্রমের পর বিশ্রাম তাহাদের নিকট বড় সুখদ। কেহ কেহ প্রফুল্ল চিত্তে গান গাহিতেছে, কেহ দাশরথীর সুমধুর গান গাহিতেছে, কেহ ভক্ত সাধক রামপ্রসাদের গান আরম্ভ করিয়াছে, কেহ বা টপ্পার সুর ধরিয়াছে।

সুরেন্দ্রনাথ কিছুক্ষণ সেই মন্দানিলবীজিত, শ্রান্তিহর জাহ্নবী কূলে বসিয়া রহিলেন। রাত্রি কিছু অধিক হইল। তখন তিনি উঠিয়া গৃহাভিমুখগামী হইলেন।

চিন্তাবিষ্ট হৃদয়ে, পথে যাইতে যাইতে সুরেন্দ্রনাথ সেই হিমনিশায় পথালোকে দৃষ্ট হিমকাতরা অভাগিনীদিগের লাবণ্য-শ্রীহীন মুখ দেখিলেন। ইহাই বিপথগামিনীদিগের শেষ গতি। সহসা নলিনীর কথা মনে পড়িল। তাহার——? সুরেন্দ্র-নাথের মস্তক ঘুরিতে লাগিল;—তিনি শিহরিয়া উঠিলেন; বুঝিলেন, তিনি স্বীয় কর্ম্মবদ্ধ—সে বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিবার শক্তি তাঁহার নাই। হৃদয়ে বিষম ব্যথা বাজিল।

গৃহে ফিরিয়া সুরেন্দ্রনাথ ভাবিতে বসিলেন। ভৃত্য আহার্য্য লইয়া আসিল। তিনি আহার করিবেন না বলিয়া ভৃত্যকে যাইতে অনুমতি দান করিলেন। সুরেন্দ্রনাথ করতললগ্নশীর্ষ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। সে ভাবনার কি অন্ত আছে?

নলিনী চিন্তাবিষ্ট সুরেন্দ্রনাথের বিষাদ-রেখাঙ্কিত আনন দেখিল—কাঁদিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সংসার।

ভগ্নশাখ তরুর বিভগ্ন শাখা আর ফিরে না সত্য; কিন্তু নূতন শাখায় ও পল্লবে তাহার সে ক্ষত-চিহ্ন লুকাইয়া যায়। ঝঞ্ঝাবাতে বিচ্যুত-কুসুম লতিকার বিচ্ছিন্ন কুসুম আর ফিরে না বটে, কিন্তু নব বসন্তে তাহার অঙ্গে আবার নব কুসুম শোভা পায়। আঘাতের চিহ্ন বিলুপ্ত না হইলেও আর তেমন থাকে না। তেমনই কালের সঙ্গে সঙ্গে শোকেও পরিবর্ত্তন ঘটে; স্মৃতি থাকে, কিন্তু বেদনার আতিশয্য আর থাকে না। তাহা না হইলে মানবকে আর শোকের পর শোক সহিতে হইত না; এক শোকই তাহার জীবন-দীপ নির্ব্বাপিত করিয়া দিত। ধীরে ধীরে দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। ক্রমে এক মাস কাটিয়া গেল। সজলজলদান্ধকার বর্ষার পর শরতে যেমন প্রকৃতির মলিন মুখে রবিকরে হাসি ফুটিয়া উঠে, তেমনই শৈলবালার মুখে আবার প্রফুল্লভাব ফিরিয়া আসিল। যোগেন্দ্রনাথ আবার পূর্ব্ববৎ সংসারের কার্য্যে মন দিলেন। শৈল আবার স্বামীর পুস্তকগুলির সাজান গোছান হইতে পূর্ব্ববৎ সকল কর্ম্ম করিতে লাগিল। হৃদয়ের শূন্য অংশ বুঝি সংসারের—দৈনন্দিন জীবনের

শত কার্য্যের শাখা-পল্লব-কুসুমে লুকাইয়া গেল; বাহিরের কাহারও পক্ষে আর সহজে তাহার অস্তিত্ব বুঝিবার সম্ভাবনা রহিল না। স্বামীস্ত্রীতে আবার তেমনই আদর সোহাগ হইতে লাগিল; তেমনই কারণে অকারণে অভিমান ও ফলে চুম্বন আরব্ধ হইল, তেমনই রহস্য কৌতুক দেখা দিল। শোকের স্থায়ী চিহ্ন আর বাহিরের লোকের পক্ষে সহজে অনুভবযোগ্য রহিল না। কেবল যোগেন্দ্রনাথ বুঝিলেন—কেবল শৈলবালা বুঝিল, যৌবনের সে চাঞ্চল্যাবেগশেষের সূচনা দেখা দিয়াছে; জীবনের রঙ্গমঞ্চে নূতন অঙ্কের অভিনয় আরব্ধ হইয়াছে; জীবনের এক অংশ পশ্চাতে রহিল।

শৈলবালা পিত্রালয় হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর রমেশচন্দ্র ও তাঁহার মাতা প্রায় প্রত্যহই তাহাকে দেখিতে আসিতেন। জ্যেঠাইমার স্নেহ-সান্ত্বনা শৈলবালার হৃদয়ে নিদাঘে তাপতপ্ত ধরার বক্ষে জলধরধারার মত স্নিগ্ধতার সঞ্চার করিত। শৈল তাঁহাকে যেমন ভক্তি করিত, তিনিও শৈলকে তেমনই ভালবাসিতেন। সেই সময় শৈল লক্ষ্য করিল, জ্যেঠাইমার শরীর যেমন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে; যিনি উষা হইতে মধ্য রাত্রি পর্য্যন্ত সংসারে শ্রম করিয়াও শ্রান্তি বোধ করিতেন না, তিনি এখন অতি অল্পেই শ্রান্তা হইয়া পড়েন। তাঁহাকে সে কথা বলিলে তিনি বলিতেন, "আমার আবার অসুখ! বয়স হইয়াছে. তাই ক্রমেই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছি।"

শৈল আরও লক্ষ্য করিত, রমেশচন্দ্রের মুখে বিষাদের ছায়া ক্রমেই ঘনীভূত হইতেছে।

কয়দিন পরে একদিন রমেশচন্দ্র আসিয়া বলিলেন, "মার শরীর ক্রমেই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। অথচ সহস্র চেষ্টা করিয়াও ঔষধ সেবন করাইতে পারিলাম না। আজ দ্বাদশী; একাদশীর উপবাসের পর আজ এত দুর্ব্বল হইয়াছেন যে, সকালে কার্য্য করিতে করিতে মূর্চ্ছিতা হইয়াছিলেন। তবুও সংসারের সব কায স্বয়ং না করিলে তাঁহার তৃপ্তি হয় না। বুঝি এইবার আমার সব শেষ হয়।" যোগেন্দ্রনাথ ও শৈলবালা সেই দিনই তাঁহাকে দেখিতে যাইয়া ঔষধ সেবনের জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেন। রমেশচন্দ্রের বাল্যবন্ধু যোগেন্দ্রনাথ জামাতা হইবার বহু পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার স্নেহভাজন হইয়াছিলেন। তাঁহাদের কথায় তিনি স্বাভাবিক মিষ্ট হাসি হাসিয়া বলিলেন, "রমেশ বুঝি ভয় পাইয়াছে? ও পাগল—উহার কথা শুনিও না। আর যদি মরণই হয় আমার ত এখন মরিবার সময়।" শৈলবালা ও যোগেন্দ্রনাথ অনেক চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে ঔষধ সেবনে সম্মতা করিতে পারিলেন না। হিন্দু বিধবা চেষ্টা করিয়া জীবননাশ পাপ বলিয়া বিবেচনা করেন বলিয়াই যে কয় দিন শরীর বহে, সে কয় দিন জীবিতা থাকেন; নহিলে জীবনে তাঁহার আর আসক্তিমাত্র থাকে না। তাই হিন্দু বিধবা যখন মৃত্যুর ছায়াপাত লক্ষ্য করিয়া আনন্দিতা হয়েন, তখন তাঁহাকে আর

জীবনের প্রতি আকৃষ্টা করিবার চেষ্টা করা রোগ জয় করিবার চেষ্টা করান অসম্ভব। এমন দৃষ্টান্ত কে না দেখিয়াছে?

সেই দিন শৈল জানিল, রমেশচন্দ্রের পত্নী পিত্রালয়ে। যোগেন্দ্রনাথ তাহা জানিয়া রমেশচন্দ্রকে বলিলেন, "রমেশ এসময় তোমার স্ত্রীকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়াছ কেন?" মুহূর্ত্ত মধ্যে যেন রমেশচন্দ্রের মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল। তাহার পর বন্ধুর হস্ত ধারণ করিয়া রমেশচন্দ্র বলিলেন, "আর এক দিন বলিব। ভাই, আজ আর কিছু জিজ্ঞাসা করিও না।" যোগেন্দ্রনাথ বুঝিলেন, যে দাবদাহে রমেশচন্দ্র সর্ব্বদা অস্থির, ইহাও তাহারই ফল। তিনি চিন্তাবিষ্ট হইয়া ব্যথিত হৃদয়ে গৃহে ফিরিলেন।

* * * * * * * *

আঘাতের উপর আঘাতে কুমুদিনীর হৃদয়ে বড়ই বাজিয়াছিল। কিন্তু যে শোক-দুঃখ বিষাদ-বিতাড়ন সংক্ষুব্ধ সংসার-সিন্ধুকূলে দৃঢ় বিশ্বাসের শৈল অবলম্বন করিতে পারিয়াছে, তাহার হৃদয় শান্তি-হারা হয় না। সংসার সিন্ধু তাহার পদমূলে ক্রুদ্ধ সিংহের মত গর্জ্জন করে, কিন্তু তাহার সে আক্রোশ নিষ্ফল। সেই সংক্ষুব্ধ সাগরে শত ভগ্নপোত হতভাগ্য মগ্ন হয়, কিন্তু বিশ্বাসীর দৃষ্টি সেই অবলম্বিত শৈলশিরঃসমুজ্জ্বলকারী ধর্ম্মের কনক কিরণ-সুধা পান-রত। তাহার হৃদয় চিরশান্তিস্নিগ্ধ—চিরপুণ্যসমুজ্জ্বল। ধর্ম্মকে যে সত্য সত্যই অবলম্বন বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে,

সে ধর্ম্মেই সুখ পায়। ধর্ম্মকে জীবন-সর্ব্বস্ব ও জীবনাধিক বলিয়া মনে করিতে না পারিলে কেবল বিশ্বাসের জন্য কেহ প্রাণ দিতে পারিত না। কঠোর কারাগার, কঠিন কশাঘাত, তীক্ষ্ণ তরবারি, অমিতজ্বালা অনল, মানব ধর্ম্মের জন্য কিছুই গ্রাহ্য করে নাই। বিশ্বাস এমনই প্রবল—এমনই অসাধ্য-সাধনক্ষম—এমনই হৃদয়-গ্রাসী। সেই বিশ্বাস বলেই কুমুদিনী জীবনের দারুণ বেদনায় আত্মহারা হয়েন নাই; সেই বিশ্বাস বলে তিনি পুত্রাধিক পুত্রের মৃত্যুশোকেও আপনাকে শান্ত করিতে পারিলেন।

পর্ব্বতের স্নেহরাশি যেমন তাহার হৃদয়েই বদ্ধ থাকিতে পারে না—তাহার বক্ষ হইতে বহির্গত হইয়া স্নেহসঞ্চারে ধরণীকে উর্ব্বরা লতা-পত্র-পুষ্প-লাবণ্যময়ী—দিব্যশ্রীসম্পন্না করিয়া তুলে, মানবের স্নেহও তেমনই পাত্রবিশেষকে অবলম্বন করে এবং তাহারই জন্য আপনার সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন করিতেও প্রস্তুত হয়। যোগিনী কুমুদিনীর বড় প্রিয় ছিল। তাহার প্রধান কারণ তাহাকে লইয়া তাঁহার আশঙ্কার অবধি ছিল না। আশঙ্কা যেমন স্নেহের সহচর—আশঙ্কায় তেমনই স্নেহ দৃঢ় হয়। যাহাকে লইয়া সর্ব্বদা ভয়—বুঝি হারাইব—তাহাকে চক্ষের অন্তরাল করিতে হৃদয় শঙ্কায় কম্পিত হয়—মনে সুখ থাকে না। সেই উৎকণ্ঠাই তাহার প্রতি স্নেহবন্ধন দৃঢ়তর করে। তাই প্রায়ই দৃষ্ট হয়, রুগ্ন পুত্র মাতার অধিক প্রিয়। অসহায়ের প্রতি

দয়াই যদি অপত্যস্নেহের ভিত্তি হয়, তবে সে স্নেহ দুর্ব্বল সন্তানেই প্রবল হইবার সমধিক সম্ভাবনা; কারণ—সে সর্ব্বদা অপরের সাহায্যপ্রার্থী। সবল পুত্র যেস্থলে আপনি কাহারও সাহায্য চাহে না, দুর্ব্বল পুত্র সে সময় প্রায়ই অশ্রুসজল নেত্রে মাতার দিকে চাহিয়া সাহায্য ভিক্ষা করে। তাই রুগ্ন যোগিনীমোহন জ্যেঠাইমার সমধিক প্রিয় ছিল। তাই তাহাকে হারাইয়া তাঁহার হৃদয়ে বড় শোক লাগিয়াছিল।

অবলম্বনবিচ্যুতা ভূপতিতা লতিকা যেমন নূতন অবলম্বনকে সাগ্রহে আঁকড়িয়া ধরিয়া আপনার করিয়া লয়, বন্ধ্যা কুমুদিনীর স্নেহ তেমনই এবার শৈলবালার কনিষ্ঠ পুত্রকে পূর্ণ আবেগে জড়াইয়া তাঁহার তপ্ত বক্ষ শীতল করিতে লাগিল।

* * * * * *

সুরেন্দ্রনাথের ও নলিনীর কাহারও চিত্তে সুখ ছিল না। উভয়েই অনুতাপজর্জ্জরিত—উভয়েই মোহকুজ্ঝটিকাবরণের অপসারণে আপনাকে পথিভ্রান্ত জানিয়া দুঃখিত; উভয়েই শ্রান্ত। উভয়েই বুঝিয়াছেন, ভ্রান্তিবশে সুখ পশ্চাতে রাখিয়া আসিয়াছেন। উভয়েই ভাবিতেন, সে সুখ এ জীবনে আর ফিরিয়া পাইবার নহে। তাই সুরেন্দ্রনাথের কেবল কুমুদিনীর কথা, গতজীবনের কথা মনে পড়িত। সে স্মৃতিতে কেবল যাতনা। সে সুখ পুনরায় যতই অনধিগম্য বলিয়া মনে হইতেছিল, ততই তাহা ত্যাগ করিয়া আসায় মনে দুঃখ জাগিতেছিল।

সুরেন্দ্রনাথ ভাবিতেন, এখনও কুমুদিনী তেমনই স্নেহময়ী, বুঝি তেমনই প্রেমময়ী; আজও যোগেন্দ্রনাথ তেমনই সৌভ্রাত্র-শালী; আজও তাঁহার সেই সংসার আছে—কেবল সে সংসারে তিনি নাই; তিনি দূরে, তিনি ত্যক্ত, তিনি অনুপস্থিত। আর কি ফিরিবার পথ নাই? তিনি এত নিকটে, তথাপি এত দূরে! সুখসরসীর তীরে দাঁড়াইয়া যে তৃষ্ণাতুর তাহার সর্ব্ব-দুঃখ-বিমোচন সলিল পান করিতে অক্ষম, তাহার বড় কষ্ট। সাফল্যের দুরারোহ গিরির যশঃসমুজ্জ্বল চূড়া দেখিতে পাইয়াও যে তাহাতে আরোহণ করিতে পারে না, তাহার বড় বেদনা। যে স্বর্গের পথে যাইতে পারে না, বোধ করি তাহার দুঃখের অপেক্ষা যে স্বর্গের দ্বারে উপস্থিত হইয়া অভ্যন্তরে প্রবেশাধিকার-বঞ্চিত হয়—যে দ্বার হইতে মন্দার-কুঞ্জে মরকত-তৃণাসনশায়িতা, মধুপান-প্রফুল্লিতা, শ্লথকুসুমাকুলকুন্তলা অপ্সরাগণের কলকণ্ঠের গীতধ্বনি শুনিতে পায়; কল্পবৃক্ষমূলে প্রেমস্ফুরিত নয়না, নৃত্যপরা দিব্যাঙ্গনাগণের ঝলকিত চঞ্চল অঞ্চল বিকশিত বিদ্যুদ্দামবৎ দেখিতে পায়; নন্দনের বিকশিত-শত-শোভা কুসুমকাননের দিব্য সৌরভের আঘ্রাণ পায়; জলকেলীরতা, চাপল্যচঞ্চলা দেববালা-গণের মৃণালভুজান্দোলন বিচ্ছুরিত জলকণার আস্বাদ লাভ করে; চিরবসন্তের শতকুসুমসুরভিভারকাতর নন্দনমলয়ের স্পর্শ অনুভব করে—অথচ দ্বার অতিক্রম করিতে পায় না—তাহার দুঃখ অনেক অধিক। সুরেন্দ্রনাথের দুঃখ বড় অধিক। কেননা, তিনি অতি

নিকটে, কেননা যে ব্যবধান তাঁহাকে দূরে রাখিয়াছে, সে ব্যবধান তাঁহার স্বহস্ত রচিত, কেননা যে মোহবশে তিনি অজ্ঞাতের অকূলে ভাসিয়াছিলেন, সে মোহ এখন দূর হইয়াছে। তাই সুরেন্দ্রনাথের হৃদয়ে এখন অহরহঃ জ্বালা-- বিষম জ্বালা।

সুরেন্দ্রনাথের হৃদয়েও জ্বালা, নলিনীর হৃদয়েও জ্বালা। তবে ফলে প্রভেদ ছিল। সুরেন্দ্রনাথ উদ্বেল চিন্তাসমুদ্রে কূল পাইতে ছিলেন না; নলিনী যেন শ্বেত-ফেনচূড় তরঙ্গরাশির পরপারে তীররেখা দেখিতেছিল। সুরেন্দ্রনাথ যখন কেবল নিরাশার অন্ধকার দেখিতেছিলেন, নলিনী তখন সেই দিগ্ব্যাপ্ত ঘনান্ধকারমধ্যে আলোকবিকাশসূচনা লক্ষ্য করিতেছিল। সে কি ভ্রান্তি? না সে চিন্তার প্রভেদসঞ্জাত—নারী-হৃদয়ের আত্ম-ত্যাগ-সঙ্কল্পের ফল?

নলিনী ভাবিতেছিল, সে ত আপনার সুখ বিসর্জন দিয়াছে, তবে আর অপরের সুখ আগলিয়া বসিয়া থাকে কেন? আপনার সর্ব্বস্ব হেলায় হারাইয়া কে অপরের সর্ব্বস্ব আগলাইয়া তপ্ত বক্ষ শীতল করিতে পারে? সে ত আপনি জন্মের মত অশ্রু সম্বল করিয়াছে—তবে অপরকে আর কাঁদায় কেন? তাহাতে তাহার কি সুখ? সে ত আপনি বেদনা পাইতেছে—তবে আর অপরকে বেদনা দেয় কেন? তাহাতে কি তাহার বেদনার নিবৃত্তি হইবে?

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

গৃহান্তরে।

ফাল্গুনের শেষ। রৌদ্রতপ্ত প্রকৃতিও কাতর হইয়া আসিতেছে। বসন্তের কুসুমদুকূল ম্লানভাব ধারণ করিতেছে; বসন্তের বনলতা খর-রবিকরে মলিন হইতেছে। রোগী দেখিয়া রমেশচন্দ্র মধ্যাহ্নের পর গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। বাহিরের সজ্জাকক্ষে বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া হস্তমুখাদি প্রক্ষালনের পর তিনি অন্তঃপুরে চলিলেন। অন্তঃপুরের দ্বার হইতে মা তাকে ডাকিয়া রমেশচন্দ্র আহারের ঘরে প্রবেশ করিলেন। মা সেই হর্ম্ম্যতলেই অঞ্চল বিছাইয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন; পুত্রের কণ্ঠস্বর শুনিয়া উঠিলেন। মা'র শরীর ক্রমেই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে; নহিলে তাঁহার পক্ষে এ সময় বিশ্রামের প্রয়োজন কিছুদিন পূর্ব্বেও ছিল না।

মা উঠিয়া পুত্রের আহার্য্য গুছাইয়া আনিলেন। রমেশচন্দ্র লক্ষ্য করিলেন, সেই লঘুভার দ্রব্য স্বল্প পথ আনিতেই মা শ্রান্তি বোধ করিয়াছেন। তিনি বলিলেন, "মা, ক্রমেই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছ; তবুও দিবারাত্রি এত শ্রম কর কেন? তোমার কি শ্রম না করিলেই নহে? আমি কত দিন বলিয়াছি, তুমি আর এত শ্রম করিও না।"

মা বলিলেন, "বাবা, আর কত দিন খাটিব? যে কয় দিন আছি, সংসারে কি না খাটিয়া বসিয়া থাকিতে পারি; আপনি না করিলে কি কিছু মনের মত হয়?

মা পুত্রকে বীজন করিতে বসিলেন।

শরীর যতই দুর্ব্বল হউক না কেন, মা'র শ্রমে বিরতি ছিল না। বিশেষতঃ পুত্র যাহা আহার করিতে ভালবাসে, তাহা স্বহস্তে প্রস্তুত না করিলে, তাহার খাদ্য আপনি না গুছাইলে, আপনি বসিয়া তাহাকে না খাওয়াইলে, গ্রীষ্মকালে তাহার আহারের সময় স্বয়ং বীজন না করিলে তাঁহার তৃপ্তি হইত না। রমেশচন্দ্রের রোগী দেখিয়া ফিরিতে বিলম্ব হইত, কিন্তু তাঁহাকে কোন দিন শীতল আহার্য্য আহার করিতে হইত না; সে ব্যবস্থা মা করিয়া রাখিতেন। মা'র যত্নে রমেশচন্দ্রের অর্দ্ধেক শ্রম দূর হইত। পুত্রবধূ গৃহকর্ম্মে সহায়তা করিলে মা'র শ্রম অনেক কমিত। মা যে বধূর নিকট সে সাহায্য পাইতেন না, তাহা কেবল তিনি জানিতেন—আর রমেশচন্দ্র জানিতেন। মা'র গৃহিণীপনা গুণে আর সকলে বুঝিত, মা'ই ইচ্ছা করিয়া বধূকে কোন কার্য্য করিতে দেন না; সব কার্য্য স্বয়ং না করিলে তাঁহার তৃপ্তি হয় না। আহার করিতে করিতে রমেশচন্দ্র মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, কিছুতেই কোন কাযের করিয়া তুলিতে পারিলে না?" মা বলিলেন, "তোর এখন সে কথায় কায নাই। এখন আহার কর।" মা অন্য কথা পাড়িলেন।

পুত্র আর দ্বিরুক্তি করিলেন না; তাহার কারণ মা'র উত্তর বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া তিনি পুনরায় আহারে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার মনও ভাল ছিল না। দুইজন দরিদ্র রোগী ব্যবস্থা লইতে আইসে নাই; তিনি সন্ধান করিয়াও তাহাদের গৃহ পান নাই।

মা জানিতেন, পত্নীর ব্যবহারে পুত্র বড় অসুখী। পাছে সে আরও কষ্ট পায়, সেই আশঙ্কায় তিনি তাহার নিকট সর্ব্বদা বধূর দোষ ঢাকিবার চেষ্টাই করিতেন। তিনি জানিতেন, যেস্থানে লোক অত্যধিক প্রত্যাশা করে, সেই স্থানেই পুত্র হতাশ হইয়াছে—তাই তিনি সর্ব্ব প্রযত্নে তাহাকে সুখী করিবার চেষ্টা করিতেন; তাহার স্বাচ্ছন্দ্য-বিধান-প্রয়াসী হইতেন। পুত্র জানিতেন, মা'র তিনি ছাড়া আর কেহই নাই। ক্রমে মাতা-পুত্রের মধ্যে স্বাভাবিক স্নেহ-সম্বন্ধ অতি নিবিড় ও অসাধারণ মধুর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। পুত্রকে অল্পক্ষণ দেখিতে না পাইলে মা অস্থির হইয়া পড়িতেন। মা যে কার্য্যটি স্বয়ং না করিতেন, সেটি কিছুতেই পুত্রের মনঃপূত হইত না। পুত্র বিশেষ জানিতেন, তিনি ব্যতীত মা'র সংসারে আর কোন আকর্ষণ নাই। মা বিশেষ জানিতেন, তিনি নহিলে পুত্রের পদে পদে অসুবিধা হয়। কাহাকেও নহিলে কাহারও চলে না।

আহারের পর বহির্ব্বাটীতে আসিবার সময় রমেশচন্দ্র দেখিলেন, পার্শ্বের ঘরে পর্য্যঙ্ক-শয্যায় শয়ন করিয়া তাঁহার পত্নী

একখানি বাঙ্গালা উপন্যাস পাঠ করিতেছেন। সিক্ত কেশ শুষ্ক করিবার জন্য মুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে—সেগুলি প্রায় হর্ম্যতল স্পর্শ করিতেছে। মুখে চিরপরিচিত বিরক্তি-ভাব। সে মুখে প্রফুল্লতার লেশ নাই। রমেশচন্দ্র কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পত্নী একবার চাহিয়া দেখিলেন। তখন উপন্যাসের একটি অধ্যায়-শেষে পতিপত্নীর মধ্যে মান-ভঞ্জনের অভিনয় হইতেছে। পত্নী আবার উপন্যাস পাঠে মন দিলেন।

রমেশচন্দ্র বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "কত দিন বলিয়াছি, ছাই পাঁশ যাহা পাও, তাহাই পড়িও না।"

পত্নী উত্তর করিলেন না।

রমেশচন্দ্র বলিলেন, "মা'র শরীর অসুস্থ, তথাপি তিনি সংসারে খাটিয়া মরেন; আর তুমি দিব্য আরামে উপন্যাস পাঠ করিতেছ! তোমার একটু লজ্জা বোধ হয় না?"

এইবার পত্নী বলিলেন, "লজ্জা কিসের? কেই বা তাঁহাকে মাথার দিব্য দিয়া সকল কায করিতে বলে, আর কেই বা তোমাকে তোমার মা'র খাটুনি কমাইবার জন্য চাকর দাসী রাখিতে বারণ করে?"

পত্নীর ব্যবহার বহুদিন পূর্ব্বেই রমেশচন্দ্রের ধৈর্য্যসীমা অতিক্রম করিয়াছিল; আজ তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। তিনি বলিলেন, "তোমাকে সাবধান করিয়া দিতেছি, আমার বাড়ীতে দাসদাসীর সঙ্গে এক সঙ্গে আমার মা'র নাম করিও না।"

মুখরা ভার্য্যা কর্কশ কণ্ঠে উত্তর করিলেন, "কেন করিব না? এ বাড়ীতে কি কোন ব্যবস্থা আছে? এ বাড়ীতে কি মানুষ থাকিতে পারে?"

ক্রোধে রমেশচন্দ্রের সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতেছিল। তাঁহার নয়ন রক্তবর্ণ; তাঁহার আনন প্রলয়-সহায়-বজ্র-সহচর পার্ব্বত্য বাত্যার মত ভীষণ। তিনি বলিলেন, "এ বাড়ীতে যদি মানুষ থাকিতে না পারে, সে তোমারই গুণে।" স্বর অতি তীব্র।

রমেশচন্দ্রের পত্নী পুস্তক ফেলিয়া উঠিলেন; বড় যত্নের কেশরাশি গুছাইয়া লইতেও বিস্মৃত হইলেন। দেরাজের নিকটে যাইয়া অঞ্চলবদ্ধ চাবির গোছার মধ্যে একটি দিয়া একটা দেরাজ খুলিয়া এক তাড়া চাবি বাহির করিয়া লইয়া—দেরাজ মুক্ত রাখিয়াই রাগে গরগর করিতে করিতে রমেশচন্দ্রের পার্শ্ব দিয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্তা হইলেন।

শাশুড়ী যে কক্ষে ছিলেন, বধূ সেই কক্ষে উপস্থিত হইলেন। শাশুড়ী পূর্ব্ব দিন কি একটা দ্রব্য বাহির করিবার জন্য বধূকে এক গোছা চাবি দিয়াছিলেন—চাবির গোছা বধূর নিকটেই ছিল। সেই চাবির গুচ্ছ সশব্দে মেজেয় ফেলিয়া বধূ বলিলেন, "আমার পিত্রালয়ে দাসীর অভাব নাই। আমি দাসীপনা করিতে শিখিও নাই; দাসীপনা করিতে আসিও নাই। আমাকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দাও। আমি এখানে থাকিতে পারিব না।"

বধূর এরূপ ব্যবহারে শাশুড়ী অভ্যস্তা। যখন মনে বড়

ব্যথা পাইতেন—মনকে বুঝাইতেন, বধূ যেরূপ ব্যবহারই করুক না কেন, সেত তাঁহার একমাত্র সন্তান রমেশের পত্নী। ছেলে যদি অমন ব্যবহার করিত, তিনি কি তাহাকে ত্যাগ করিতে পারিতেন? তাই আজও শাশুড়ীর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল না। তিনি স্বাভাবিক কোমল স্বরে বলিলেন, "বৌমা, কি হইয়াছে?"

কি হইয়াছে বধূ, গর্জ্জন করিয়া শাশুড়ীকে তাহা বুঝাইতে আরম্ভ করিতেছিলেন। সম্ভবতঃ সেই গর্জ্জনে ক্রোধের প্রথম উচ্ছ্বাস শেষ হইয়া যাইলে শাশুড়ী বধূকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিতে পারিতেন। এমন অনেক দিন হইয়াছে। কিন্তু আজ আর তাহা হইল না। রমেশচন্দ্র আসিয়া দ্বার পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "সে কথা মাকে না বলিয়া আমাকে বলিলে আমি সে ব্যবস্থা করিয়া দিতাম। আমি সে ব্যবস্থা করিতেছি।"

রমেশচন্দ্র বহির্ব্বাটীতে গমন করিলেন। মাতা ডাকিলেন। রমেশচন্দ্র ফিরিলেন না। পুত্রের মুখ দেখিয়া মা'র ভয় হইল। তিনি জানিতেন, পিতার ক্রোধ-প্রবণতা পুত্রে বর্ত্তিয়াছে। সে 'না' বলিলে, 'হাঁ' বলান বড় কঠিন কার্য্য।

অল্পক্ষণ পরেই ফিরিয়া রমেশচন্দ্র বলিলেন."গাড়ী আসিয়াছে।"

রমেশচন্দ্রের পত্নী আপনাকে একান্ত অপমানিতা বোধ করিয়া কুপিতা ফণিনীর মত ক্রোধে ফুলিতে লাগিলেন। রমেশচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে তিনি কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

মা বলিলেন, "রমেশ! রমেশ! তুই কি পাগল হইয়াছিস্? করিস্ কি?" তাহার পর বধূকে ডাকিলেন, "বৌমা আমার কথা শুন। এ বাড়ী কি তোমার নহে?" কেহই উত্তর দিলেন না; কেহই ফিরিলেন না। তখন উভয়েরই হৃদয়ে ক্রোধ প্রবল—বিবেচনার স্থান মাত্র নাই।

পত্নী গাড়ীতে উঠিলে রমেশচন্দ্র দ্বারবানকে ডাকিয়া তাঁহার শ্বশুরালয়ে যাইতে বলিয়া দিলেন। "যো হুকুম, মহারাজ"—বলিয়া ভোজপুরী ভৃত্য কোচবাক্সে উঠিল।

পুত্র ও পুত্রবধূ ক্রোধে চলিয়া যাইতেছেন দেখিয়া মাও তাঁহাদের অনুসরণ করিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহাদিগকে নিবারণ করিতে পারিবার পূর্ব্বেই তাঁহারা দ্রুত কক্ষের পর কক্ষ অতিক্রম করিয়া গিয়াছিলেন। দাস দাসীর সমক্ষে কোন কথা কহা যুক্তিযুক্ত নহে বুঝিয়া মা ফিরিলেন; ভাবিলেন, গোপনে ছেলেকে বুঝাইয়া বলিবেন—তাহার পর আবার বধূকে আনাইবেন।

পত্নী চলিয়া যাইলে রমেশচন্দ্র আসিয়া মা'র কাছে বসিলেন। তখন ক্রোধের প্রথম উচ্ছ্বাস অপগত; বাত্যাতাড়িত সিন্ধুর উত্তাল তরঙ্গভঙ্গ গিয়াছে—চাঞ্চল্যমাত্র বর্ত্তমান।

মা বলিলেন, "বাবা, রাগের ভরে এমন কায কেন করিলে? অপযশ কাহার?"

"অন্যায় করিয়াছি সত্য; কিন্তু, মা আর যে সহিতে পারি না!"—বলিয়া রমেশচন্দ্র কাঁদিয়া ফেলিলেন।

মা সস্নেহে পুত্রের মস্তক আপনার বক্ষে তুলিয়া লইলেন। জীবনের প্রথম দুঃখে বালক যেমন করিয়া মাতৃঅঙ্কে মুখ গুঁজিয়া কাঁদে ; আজ বহুবর্ষ পরে জীবনের দারুণ দুঃখে মা'র বুকে মুখ লুকাইয়া রমেশচন্দ্র তেমনই করিয়া কাঁদিলেন। যে অগ্নি আজ বহু বর্ষ ধরিয়া পলে পলে হৃদয় দগ্ধ করিতেছিল, আজ মা'র কাছে কাঁদিয়া যেন সে অগ্নির দহন-জ্বালা প্রশমিত হইল। জুড়াইবার এমন স্থান আর নাই। রমেশচন্দ্র সত্যসত্যই বালকের মত কাঁদিতে লাগিলেন।

মা'র চক্ষুও শুষ্ক রহিল না। মা সস্নেহে পুত্রের গাত্রে হস্ত বুলাইতে লাগিলেন। বিংশতি বর্ষ বয়ক্রমকালে প্রথম সন্তান রমেশচন্দ্রকে ক্রোড়ে পাইয়া তিনি যেমন স্নেহে সেই অসহায় শিশুর গাত্রে কোমল কর বুলাইয়া ছিলেন, আজ সংসারে দুঃখ-কাতর, ক্রন্দনরত পুত্রকে অঙ্কে পাইয়া তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে তেমনই স্নেহে—তেমনই যত্নে তাহার গাত্রে স্বীয় স্নেহ-কোমল কর বুলাইতে লাগিলেন। স্নেহময়ী জননীর নিকট পুত্র চিরদিনই সমান।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

মাতা পুত্রে।

রমেশচন্দ্রের মাতার শরীর দিন দিন ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে লাগিল। কোন বিশেষ ব্যাধি নাই, কিন্তু শরীরে ব্যাধি-চিহ্ন বর্ত্তমান। ক্ষুধা নাই; শরীর দুর্ব্বল; দেহে জীবনীশক্তির প্রাচুর্য্যাভাব। রমেশচন্দ্র বুঝিলেন—মৃত্যুর স্পর্শ ধীর—নীরব, কিন্তু অনতিক্রমণীয়, আসন্ন মৃত্যুর ছায়া ক্রমেই ঘনীভূত হইবে। মা ঔষধ সেবন করিলেন না; কিন্তু রমেশচন্দ্রের পক্ষে অক্লান্ত শুশ্রূষার ত্রুটিমাত্র ছিল না।

একদিন মা রমেশচন্দ্রকে বলিলেন, "রমেশ, আমার বাঁচিবার আর অধিক দিন নাই। আমি মরিবার পূর্ব্বে বৌমাকে আনাইব। বাবা, ইহাতে আর আপত্তি করিস্ না।"

রমেশচন্দ্র বলিলেন, "মা, তোমার মৃত্যুকালে নিশ্চিন্ত হইয়া আমি একাই তোমার পদসেবা করিব। আর কাহাকেও কায নাই।"

মা বলিলেন, "বাবা, আমি যদি বৌমাকে না আনাই, তবে আমি আমার একটা কর্ত্তব্য বাকি রাখিয়া যাইব। বৌমা যদি মন্দ ব্যবহারই করিয়া থাকেন, তবুও তিনি অত্যাজ্যা—তিনি তোর স্ত্রী। আমি মরিবার সময় তোদের এ বিবাদ দেখিয়া মরিলে আমার মরিয়াও সুখ হইবে না।"

"মা, তুমি ত সব জান। যে এতদিন তোমার উপদেশে ও আদর্শে কিছু লাভ করিতে পারিল না, তাহাকে কি মরণকালে সদুপদেশ দিয়াই ভাল করিতে পারিবে?"

"যদি নাই পারি—তবু আমার কায আমি করিয়া যাইব। ঘরের ছিদ্র পরকে দেখান হইবে না। আমার শ্বশুরের বংশের কলঙ্কের কথা লইয়া আর কেহ আলোচনা করিবার অবকাশ পাইবে না। তোর পিতা সর্ব্বদাই বলিতেন, বংশের অপযশে লোক কেন কাতর হয়, সকল লোকে তাহা বুঝিতে পারে না, কারণ—বংশযশ সকলের নাই; যাহার তাহা আছে, তাহার নিকট সে যশ বড় আদরের—অনেক সময় তাহাই তাহার এক মাত্র গর্ব্বের বস্তু। আমি আমার শ্বশুরের বংশের অপযশের কারণ রাখিয়া যাইব না।"

"কিন্তু এমন ঘটনা যে, মা, নিত্য ঘটিবে। কাহারও প্রকৃতি কি সহজে পরিবর্ত্তিত হয়?"

"তাহার উপায় তোমাকে করিতে হইবে। আমি জানি, তুমি একগুঁয়ে। সে দোষ তোমার নহে; সে তোমার বংশে বর্ত্তমান। কিন্তু আমার মৃত্যুকালের একটা অনুরোধ তোমায় রাখিতেই হইবে। তোমাকে বধূমাতার সহিত বনাইয়া চলিতে হইবে। যদি তাহা একান্ত অসম্ভব হয়। তবে অন্য ব্যবস্থা করিবে। বৃহৎ পরিবারের স্থান-সঙ্কুলান হয়। এমন করিয়া তোমার পিতা এই গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তুমি আমার একমাত্র সন্তান। বিধাতা

আমাকে পৌত্র বা পৌত্রীর মুখ দেখিবার সৌভাগ্য দান করেন নাই। তোমার একার এত বড় গৃহের সমস্ত আবশ্যক নাই। তুমি অধিক ঘরে দ্রব্যাদি ছড়াইয়া রাখা ভালবাস না; বাল্যাবধি কয়টি ঘরেই তোমার সব দ্রব্যাদি রাখিতে ভালবাস—সব হাতের কাছে থাকে। গৃহের ভিতরের অংশ তুমি বধূমাতাকে ছাড়িয়া দিতে পার। আবশ্যক হইলে তাঁহার দাসদাসীর পৃথক্ বন্দোবস্ত করিয়া দিতে তোমার কষ্ট হইবে না। তাহা হইলে তাঁহার ব্যবস্থায় তুমি হস্তক্ষেপ করিবে না; তাঁহার কথায় তুমি থাকিবে না। কলহের কারণ না পাইলে আর বৌমা কলহ করিবেন না। উভয়ের ব্যবস্থা স্বতন্ত্র হইলে আর কলহের কারণ পাইবে না।"

রমেশচন্দ্র ক্ষণেক চিন্তা করিলেন,—মা'র কথা ভাবিলেন; শেষে বলিলেন, "তোমার যাহা অভিপ্রেত, তাহাতে আমি প্রতিবাদ করিব না।"

মা বলিলেন, "তবে আমি আজই বৌমাকে আনিতে পাঠাইব।"

"কিন্তু তোমার লোক যদি ফিরাইয়া দেয়; তবে সে অপমান আমার সহিবে না।"

মা আর কোন কথা কহিলেন না।

মা সেই দিনই বধূকে আনিতে লোক পাঠাইলেন; পত্রে লিখিয়া দিলেন, "আমার শরীর অসুস্থ। তোমাকে দেখিতে ইচ্ছা করি। যদি রমেশের সহিত কথান্তরই হইয়া থাকে—রাগ

করিয়া থাকিতে নাই। সংসার তোমার। আমি ত মরিতে বসিয়াছি। তুমি ফিরিয়া আইস। কবে আসিবে, লিখিও।" পত্রে মা বধূর পিতৃগৃহের সকলের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। সকলের সংবাদ লইলেন।

দাসী ফিরিয়া আসিল। পুত্রবধূ পত্রের উত্তর দেন নাই; পাত্র বিচার না করিয়া দাসীকেই বক্তব্য বলিয়াছেন। দাসী আসিয়া বলিল, "আমার বয়সে কখনও এমন অপমান সহি নাই। আমাকে একবার বসিতেও বলে নাই। বৌমা তোমার পত্রখানা পড়িয়া ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, 'যাইয়া বল, আমি যাইব না। আগে ভদ্রতা শিখিয়া তবে যেন ভদ্রলোকের সঙ্গে কুটুম্বিতা করে। ব্যবহার শিখিতে এখনও অনেক বিলম্ব। যে স্থানে ভদ্রলোকের বাস নাই, সে স্থানে ভদ্রতা শিখিবে কেমন করিয়া?' এমনই কত কটু কথা বলিলেন। আমি আর কি বলিব? আমি চলিয়া আসিতে ছিলাম। বৌমা মুখ বাঁকাইয়া বলিলেন, 'রকম দেখ! বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়! ঝির আবার রাগ কত!' বৌমার মা আমাকে ডাকিয়া বসাইতেছিলেন। বৌমা তাঁহাকে বলিলেন, 'আর নাই দিও না। ও পাপ বিদায় হইতেছে হউক। ও বাড়ীর ছায়া মাড়াইও না। তিনি মেয়ের ভয়ে আর কিছু বলিতে সাহস করিলেন না।"

মা ঝিকে বিদায় দিলেন। ঝি চলিয়া গেল। দুই বিন্দু অশ্রু মা'র রক্তহীন শীর্ণ গণ্ড বহিয়া আসিল। মা ত্রস্তভাবে অঞ্চলে

চক্ষের জল মুছিলেন—পাছে রমেশ আসিয়া তাঁহাকে কাঁদিতে দেখে। বুঝি অদৃষ্টের লেখনী মাতৃস্বরূপিণী স্নেহশীলা—পুণ্যবতীর সেই দুই বিন্দু অশ্রু লইয়া পুত্রবধূর ভাগ্যে অনন্ত দুঃখ লিখিয়া রাখিল।

মা স্থির করিলেন, যাহাই হউক, আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব। তিনি পুত্রকে একথার বিন্দুবিসর্গও জানিতে দিলেন না; মনের কষ্ট মনেই রাখিলেন—বাহিরে ফুটিলেন না।

কয় দিন পরে মা আবার পুত্রবধূর নিকট দাসী পাঠাইলেন। পত্রে লিখিলেন, "আমার কন্যা নাই, তুমিই কন্যা স্থানীয়া। আমার বাঁচিবার আর অধিক দিন নাই। মৃত্যুর পূর্ব্বে একবার তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া মরিতে ইচ্ছা করি। ইহাই আমার শেষ সাধ। মা, আমার এ সাধ অপূর্ণ রাখিও না; একবার আসিও।"

এই করুণ উক্তিও পুত্রবধূর হৃদয় স্পর্শ করিল না। তিনি মনে মনে হাসিলেন; ভাবিলেন, এইবার ঔষধ ধরিয়াছে। আমি নহিলে চলে না; তাই আমাকে লইয়া যাইবার জন্য এসব ফন্দী। আমি হাবা মেয়ে নহি যে, সহজেই ভুলিব। আমি যেরূপ অপমানিতা হইয়াছি, তাহার শোধ তুলিয়া তবে যাইব। নাকের জলে চোখের জলে হইয়া যখন আসিয়া আমায় সাধিয়া লইয়া যাইবে, তখন যাইব—তৎপূর্ব্বে নহে। তিনি প্রকাশ্যে দাসীকে বলিয়া দিলেন, "আমি যাইব না। কেন পুনঃপুনঃ আমাকে

বিরক্ত কর !” দাসী যাইয়া মা'কে সেই কথা বলিল। তখন রমেশচন্দ্র জননীর কাছে বসিয়া ছিলেন।

রমেশচন্দ্র দাসীর কথা শুনিলেন; রুদ্ধমুখ আগ্নেয়পর্ব্বত যেমন আপনার অন্তরস্থিত বহ্নিজ্বালায় আপনি দগ্ধ হয়, তেমনই ক্রোধে দগ্ধ হইতে লাগিলেন।

ঝি বলিল. “মা, এই ত দুইদিন এমনই হইল। তুমি কেন আমাদের পাঠাও? এ অপমান কি কেবল আমাদের?”

ঝি চলিয়া যাইলে রমেশচন্দ্র মা'কে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মা, আরও একদিন লোক পাঠাইয়াছিলে?”

মা ধীরে ধীরে বলিলেন, “পাঠাইয়াছিলাম ” যেন তিনি পুত্রের নিকট কত অপরাধিনী।

রমেশচন্দ্র আর কোন কথা কহিলেন না। তাঁহার দৃষ্টি মৃত্তিকা-সংলগ্ন। মা লক্ষ্য করিলেন, পুত্রের কপালে শিরাগুলি পুষ্ট হইয়া উঠিতেছে। তিনি বুঝিলেন, ক্রোধাবেশে পুত্র চঞ্চল; কেবল বহু চেষ্টায় সে ক্রোধ সংযত রাখিতেছে।

কিছুক্ষণ পরে মা বলিলেন, “বাবা তোর অমতে আমি একায করিয়াছি। তোর অপমান হইয়াছে। যিনি তোর বিবাহ দিয়াছিলেন, তিনি বাঁচিয়া থাকিলে তিনিই কর্ত্তব্য স্থির করিতেন; আমি স্বল্পবুদ্ধি নারী, আমাকে ভাবিতে হইত না। তিনি আজ স্বর্গে।—আমার দিন ফুরাইয়াছে। আমার কন্যা নাই। বড় আশা করিয়াছিলাম, তোর বিবাহ দিয়া কন্যা পাইব।

বড় সাধ ছিল, তোদের সুখী দেখিয়া সুখে মরিব তাই আমি মান অপমান সব ভুলিয়া একায করিয়াছি। এমন হইবে, তাহা বুঝিতে পারি নাই। তোর ভাল হইবে ভাবিয়া আমি মার কায করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। আমার ভাগ্য-দোষে বিপরীত ফল ফলিয়াছে।"

একটু পরেই মা আবার বলিলেন, "বাবা, তোর অনভিপ্রায়ে আমি এ কায করিয়া তোর মনে ব্যথা দিয়াছি। মা'র অপরাধ লইস না।"

"মা!—মা!—"অশ্রুর উচ্ছ্বাসে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। রমেশচন্দ্র কাঁদিয়া ফেলিলেন। পুত্রের অশ্রুর সঙ্গে সঙ্গে স্নেহ-ময়ী জননীরও অশ্রু ঝরিলে লাগিল। সেই পূত অশ্রুজলে বুঝি পুত্রের সমস্ত অকল্যাণ বিধৌত হইয়া গেল। তাহার পর জননী সস্নেহে অঞ্চল দিয়া পুত্রের অশ্রুধারা মুছিয়া দিলেন। সে অশ্রু তিনি যত মুছেন, ততই দ্বিগুণ বহে।

কিছুক্ষণ মার কাছে কাঁদিয়া রমেশচন্দ্র শান্ত হইলেন—হৃদয়ের দারুণ ভার অপনীত হইল। তাহার পর উঠিয়া তিনি ছাদে গমন করিলেন। তখন সন্ধ্যা সমাগতা।

ক্রমে রাত্রি হইল। মোক্ষকামীর অখণ্ড পুণ্যের মত দিব্য-দীপ্তিসমুজ্জ্বল চন্দ্রের কিরণ-স্পর্শে নৈশ গগনপটে শতসৌধচূড়া পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। নগরের কোলাহল মন্দীভূত হইতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে দূরে পিঞ্জরাবদ্ধ বিহগের গীত স্বপ্ন-সঙ্গীতের

মত মধুর বোধ হইতে লাগিল। চিন্তাসহচর রমেশচন্দ্র একাকী ছাদে পাদচারণ করিতে লাগিলেন ; সুদূর অতীত হইতে বর্ত্তমান পর্য্যন্ত জীবনের ঘটনাবলীর পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার চক্ষের সম্মুখ হইতে অতীতের যবনিকা অপসৃত হইয়া গেল ; শত পরিচিত মূর্ত্তি দেখা দিল। জীবনের বিস্মৃতপ্রায় কত ঘটনা—কত ক্ষুদ্র সুখদুঃখ আজ যেন সুপ্তিগহ্বর হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। কে তাহাদের ইয়ত্তা করিতে পারে? শত ঘটনা নিত্য হৃদয়ে চিহ্নমাত্র রাখিয়া যায়—আবার হয় ত কোন দিন চিন্তাস্পর্শে কোন অজ্ঞাত কারণে পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

সহসা অপগত-রোধ-শিলা জলস্রোতঃ যেমন প্রবলবেগে সফেন আবেগে চারিদিকে ভূমিতে ছড়াইয়া পড়ে, তেমনই আজ অতীতের শত স্মৃতি রমেশচন্দ্রের হৃদয়ে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছিল।

যে সরসীসলিলে আমরা আমাদিগের অতীত স্মৃতি নিমজ্জিত রাখি, তাহার জলরাশি বড় স্বল্পে—স্মৃতির সামান্য সঞ্চালনে—চিন্তার সামান্য সন্তাড়নে চঞ্চল হইয়া উঠে এবং অচিরে বীচি-বিভঙ্গবিহ্বল হইয়া আবিলতা প্রাপ্ত হয়। তখন তরঙ্গতাড়ন অনুভূত হয়—চাঞ্চল্য প্রতীয়মান হয় ; কিন্তু কিছুই স্পষ্ট লক্ষিত হয় না। রমেশচন্দ্রেরও তাহাই হইল ; অল্পক্ষণ পরেই সহস্র স্মৃতির আবেগচাঞ্চল্যে সবই অস্পষ্ট করিয়া দিল ; কেবল হৃদয়ে সেই চাঞ্চল্য প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

কিছুক্ষণ ছাদে পাদচারণ করিয়া রমেশচন্দ্র নামিয়া আসিলেন।

সে দিন রাত্রে রমেশচন্দ্র নিদ্রা যাইতে পারিলেন না। মধ্যরাত্রে একবার উঠিয়া দেখিলেন, মা তখনও জাগিয়া—তাঁহার নয়ন অশ্রু-সজল। রমেশচন্দ্র মার কাছে যাইয়া বলিলেন, "মা, কাঁদিতেছ?"

মা বলিলেন, "বাবা, তোকে সুখী দেখিয়া মরিতে পারিলাম না।"

চতুর্থ খণ্ড

বান-নিবৃত্তি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শ্মশান-শয়ন।

দুই তিন দিনের মধ্যেই রমেশচন্দ্রের মাতার শরীর একান্ত নিস্তেজ হইয়া পড়িল। দিন নিতান্তই ফুরাইল। আর শয্যা-ত্যাগের ক্ষমতা নাই।

একদিন প্রভাতে মা বলিলেন, "রমেশ, আজ শরীর বড়ই অসুস্থ বোধ হইতেছে। তুই সকাল সকাল আহার কর।" তিনি জিদ করিয়া সকাল সকাল পুত্রের আহার্য্য আনাইয়া তাঁহাকে আহারে বসাইলেন। তাঁহার শরীর অধিক দুর্ব্বল হওয়া অবধি তাঁহার শয্যাগৃহেই রমেশচন্দ্রকে আহার করিতে হইত। মার আদেশে সে দিন বহু ব্যঞ্জন—মৎস্য ও মাংস রন্ধন করা হইয়াছিল। মা আপনি জিদ করিয়া পুত্রকে সব আহার করাইলেন; বলিলেন, "অনেক দিন খাইতে পাইবি না।"

মধ্যাহ্নের পর হইতেই মার শরীর নিতান্ত নিস্তেজ হইয়া পড়িতে লাগিল। অন্য দিনের মত আজও কুমুদিনী যোগেন্দ্র-নাথ ও শৈলবালার সহিত তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। অবস্থা দেখিয়া যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমি আজ থাকিব।" শৈলও থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। সন্ধ্যার সময় ছেলেদের লইয়া কুমুদিনী গৃহে ফিরিলেন। কুমুদিনী আসিবার সময়

প্রণাম করিলে মাতা আশীর্ব্বাদ করিলেন, "স্বামি-সুখে সুখিনী হও।" তিনি ছেলেদের আশীর্ব্বাদ করিলেন।

সে রাত্রিতে রমেশচন্দ্র, যোগেন্দ্রনাথ ও শৈল তিন জনই রোগিণীর নিকটে রহিলেন। প্রায় মধ্যরাত্রে মা শৈলকে ডাকিলেন; শৈল নিকটে আসিলে আশীর্ব্বাদ করিলেন, "মা আমার, চির-সুখিনী হও।"

তাহার পর যোগেন্দ্রনাথ আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। মা আশীর্ব্বাদ করিলেন, "সুখে সংসার কর।"

তাহার পর মা রমেশচন্দ্রকে ডাকিলেন। পুত্র শয্যাপ্রান্তে উপস্থিত হইলে মা তাঁহার মস্তকে আপনার দক্ষিণ করতল সংস্থাপিত করিলেন। যেন সে মস্তক হইতে আর আপনার শিথিল-বল হস্ত অপসারিত করিতে ইচ্ছা হয় না। সেই স্নেহস্পর্শে পুত্রের শিরে অজস্র আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইল—সে আশীর্ব্বাদ ভাষার অতীত, কেবল মাতৃহৃদয়েই তাহার অনুভূতি সম্ভব—অন্যত্র নহে।

বৃদ্ধা দাসী প্রণাম করিলে, মা তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তাহাকে বলিলেন, "বৌমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিও, আমি তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া মরিতেছি।"

ইহার কিছুক্ষণ পরেই জননীর সংজ্ঞা লোপ হইল। ধীরে ধীরে জীবনের স্রোতঃ শেষ হইতে লাগিল।

এই ভাবে রাত্রি কাটিল। আর জ্ঞান নাই; কেবল

রমেশচন্দ্র বাষ্পরুদ্ধ ভগ্ন কণ্ঠে "মা!" বলিয়া ডাকিলে যেন মুদিত নয়নে সামান্য স্পন্দন বোধ হয়; প্রশান্ত অধরে ঈষৎ কম্পন অনুভূত হয়। বুঝি যখন বাহ্য জগৎ সম্বন্ধে অনুভূতির দ্বার রুদ্ধ হইয়া যায়, তখনও হৃদয়ের সূক্ষ্মতম তন্ত্রীতে যে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়, তাহার আকুল আহ্বান ধ্বনিত হইয়া সামান্য অনুভূতির সঞ্চারের চেষ্টা করে। মরণের স্পর্শ-প্রারম্ভেই বুঝি জীবনের প্রিয়তম বন্ধন বিচ্যুত হইয়া যায় না—তখনও জীবনে ও মরণে সম্বন্ধ ঘুচে না।

মধ্যাহ্নে অবস্থা আরও মন্দ বোধ হইল। জননীকে গঙ্গাতীরস্থ করিবার জন্য, গঙ্গাতীরে গৃহ স্থির করিতে রমেশচন্দ্র সরকারকে পাঠাইয়া দিলেন। যোগেন্দ্রনাথ তাহাতে আপত্তি করিলে রমেশচন্দ্র বলিলেন, "মা পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে গঙ্গাতীরস্থা করিতে আদেশ করিয়াছেন। যতক্ষণ তাঁহার বাহ্য অনুভূতির সম্ভাবনামাত্র ছিল, ততক্ষণ আমি তাহা করিতে পারি নাই। এক্ষণে আর সে সম্ভাবনা নাই। এখন তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া কৃতার্থ হইব।"

রমেশচন্দ্র স্থির। বেদনার আতিশয্য আঘাতের আতিশয্যের মত একটা সীমা অতিক্রম করিলে অনুভূতির সীমা ছাড়াইয়া যায়। রমেশচন্দ্রেরও তাহাই হইয়াছিল। শোকের এমন একটা অবস্থা আইসে, যখন অস্থিরতা আপনি স্থির হইয়া যায়—চাপল্য গাম্ভীর্য্য আনিয়া দেয়।

* * * * * * * * *

অপরাহ্নে জননীর দেহ ভাগীরথী তীরে গৃহে নীত হইল।

ক্রমে ভাগীরথীর পরপারে গৃহাদির পশ্চাতে অস্তরবির শেষ কনককিরণও নিশার তিমির-সাগরে ডুবিয়া গেল। তিমির-পরিসর নিশামুখে ললাটে শুক্রতারার দীপ্তি সন্ধ্যা ধীর-পদে অগ্রসর হইল। গঙ্গাবক্ষে রজনীর অন্ধকার ছড়াইয়া পড়িল। দিবাবসান হইল। ক্রমে দিবসের শেষ কোলাহলও নিবৃত্ত হইল। প্রকৃতি অপগতচাপল্যা—গম্ভীরা—বিষাদিতা।

ভাগীরথীতীরে একটি গৃহের একটি প্রকোষ্ঠে শুভ্র শয্যায় জননীর সংজ্ঞাশূন্য দেহ শায়িত। কক্ষে কয়টি মোমের বাতি স্নিগ্ধ কিরণ ঢালিতেছে। রমেশচন্দ্র জননীর শিয়রে বসিয়া একদৃষ্টে মাতৃমুখ নিরীক্ষণ করিতেছেন। যোগেন্দ্রনাথ পার্শ্বে বসিয়া। মাতার মুখে যন্ত্রণার চিহ্নমাত্র নাই—যেন মাতা নিদ্রা-নিমগ্না। মুখে দিব্য শান্তি; অধরে প্রশান্ত ভাব; নয়ন মুদ্রিত; দুই হস্ত দুই পার্শ্বে পড়িয়াছে।

আত্মীয়দিগের মধ্যে কয়জন সেই কক্ষেই বসিয়া আছেন। আর কয়জন বাহিরে বারান্দায়। ভৃত্যবর্গ বারান্দায়—কেবল বৃদ্ধা দাসী মাতার পদপ্রান্তে বসিয়া সেই হিমায়মান-চরণসেবা করিতে করিতে নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে। সমাজের সকল স্তরেই রমণী—রমণী।

গৃহে যেন মৃত্যুর ছায়া পড়িয়াছে। সকলেই নীরব। সেই

নিস্তব্ধ নিশীথে জাহ্নবী-তরঙ্গ-সঙ্গ-শীতল-পবন-তাড়িত বীচিমালার কল কল ধ্বনি শ্রুত হইতেছে। অদূরে কোথায় বৃহৎ পিত্তল ঘড়ীতে সময় বাজিতেছে—সে ধ্বনি বহুক্ষণ নৈশপবনে কম্পিত হইয়া ধীরে ধীরে মিলাইয়া যাইতেছে। বিরল-পথিক রাজপথে ক্বচিৎ কোন পথিকের পদধ্বনি ধ্বনিত হইতেছে। আকাশ চন্দ্রকিরণপ্লাবিত। নিকটে শতসৌধের চন্দ্রকরবিধৌত চূড়া।

যাঁহারা বাহিরে বারান্দায় বসিয়া ছিলেন, তাঁহাদিগের কেহ কেহ মধ্যে মধ্যে কক্ষে আসিয়া মরণাহতা জননীর অবস্থা লক্ষ্য করিতেছেন। সকলেরই গতায়াত নিঃশব্দে। যে গৃহে মৃত্যুর করস্পর্শ অনুভূত হয়—সে গৃহে গাম্ভীর্য্য আপনি আইসে।

রমেশচন্দ্র শিয়রে বসিয়া এক দৃষ্টে মাতৃমুখ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। এই শেষ দেখা। তখন তাঁহার মনে কি হইতেছিল, তাহা কে প্রকাশ করিতে পারে? তিনি প্রস্তররুদ্ধ-মুখ নির্ঝরের মত স্থির; বাত্যাবিহীন ঋতুতে সাগরের মত গম্ভীর।

ক্রমে আসন্ন মৃত্যুরপূর্ব্ব-লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল। বৃদ্ধা দাসী পদসেবা ত্যাগ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিল। সুদীর্ঘ ব্যর্থ জীবন যাঁহার সেবায় কাটাইয়াছে; যাঁহাকে দেবতার মত ভক্তি করিয়া উপাসিকার প্রাপ্য স্নেহ পাইয়া সকল কষ্ট ভুলিয়াছে—আজ তাঁহার পদসেবার শেষ। আজ তাঁহার সব শেষ। দাসী মনে করিল, যেন তাহারও জীবনের কার্য্য

শেষ হইল। সে কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিয়া জননীর কর্ণে তাঁহার অভীষ্ট-লোক-যাত্রার সম্বল ইষ্টদেবতার নাম শ্রবণ করাইল।

তাহার পর জননীর শয্যা জাহ্নবীতীরে নীত হইল; শয্যাপদ পুণ্যসলিলে সংস্থাপিত হইল।

নিস্তব্ধ নিশীথ। উপরে সুনীল গগনে শত তারকার ধরাতল-নিবদ্ধ দৃষ্টি। নিম্নে উদার জাহ্নবী-প্রবাহ। উভয় তীর ঝিল্লীমন্দ্রমুখরিত—অপগতজনকোলাহল। আকাশ প্রশান্তিপূর্ণ। প্রকৃতি শান্ত। নিশীথিনী গম্ভীরা। জাহ্নবীজীবনে নিষ্ফল চাঞ্চল্যচিহ্ন নাই। গগন-বক্ষ হইতে চন্দ্র সেই স্নিগ্ধ প্রশান্তি-পূর্ণ মরণাহত মুখে অম্লানোজ্জ্বল রজত কিরণ ঢালিয়া দিয়াছে।

ধীরে ধীরে জোয়ারের পর যেমন গঙ্গার জলরাশি সরিয়া যায়, তেমনই জননীর জীবন স্রোতঃ প্রবাহিত হইয়া গেল। সেই গম্ভীর নিশীথে—সেই জাহ্নবীজীবনে তাঁহার শেষ শ্বাস বহির্গত হইয়া গেল। সর্ব্বাঙ্গ স্থির। মুখে সেই স্নিগ্ধ প্রশান্ত ভাব।

সেই নৈশগগনে বৃদ্ধাদাসীর আর্ত্ত কণ্ঠস্বর নিশীথ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিল।

রমেশচন্দ্রের "মা" বলা ফুরাইল। তিনি ভাবিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সব ফুরাইল—তাঁহার আর কেহই নাই।

যাও, মা, তোমার অখণ্ড পুণ্যার্জ্জিত অভীষ্ট লোকে যাও। যে সংসারে সুখে দুঃখের ছায়া; যে সংসারে স্নেহের পার্শ্বে শোক; যে সংসারে বিষাদ হর্ষের চিরসহচর; যে সংসারে

প্রেমের জয়।

নিঃস্বার্থ ভালবাসা চির-বেদনাময়; যে সংসারে জীবনে পদে পদে যাতনা; যে সংসারে কপটতা ধর্ম্মের ভাণ করে; যে সংসারে শঠতা সরলতার নামে পরিচিত হয়—সে সংসার তোমার মত পুণ্যময়ী—স্নেহশীলার উপযুক্ত স্থান নহে। তোমার অভীষ্টলোকে তোমার স্নেহশীল হৃদয়ের সকল ব্যথা অপনীত হউক; তুমি সকল দুঃখ ভুল; তোমার পুণ্যরাশি দিব্যদীপ্তি মুকুটে পরিণত হউক।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রোগশয্যা।

জননীর দেহ দাহ করিয়া বিশদ বস্ত্র ও বিশদ উত্তরীয় ধারণ করিয়া নগ্ন পদে রমেশচন্দ্র গৃহে ফিরিলেন। গৃহ শূন্য—হৃদয়ও শূন্য। গৃহের প্রবেশদ্বারে রমেশচন্দ্র মুহূর্ত্ত দাঁড়াইলেন, তাহার পর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। জীবনের সকল আকর্ষণ সেই শ্মশান-শয়নে চিতানলে ভস্মসাৎ হইয়াছে।

যোগেন্দ্রনাথ আশঙ্কা করিয়াছিলেন, রমেশচন্দ্র বড় অধীর হইয়া পড়িবেন। কিন্তু তিনি বুঝিলেন, তাঁহার আশঙ্কার ভিত্তিমাত্র নাই। রমেশচন্দ্র অধীরতার চিহ্নমাত্র দেখাইলেন না। তিনি স্থির। কেবল মুখে বিষাদের ছায়া গাঢ়তর—গভীরতর। যোগেন্দ্রনাথ লক্ষ্য করিলেন, তিনি চিন্তাকুল—অন্যমনস্ক; সহসা কেহ কোন কথা কহিলে চমকাইয়া উঠেন। যোগেন্দ্রনাথ ভাবিলেন, এসময় চিন্তাকুলতা স্বাভাবিক।

যোগেন্দ্রনাথ বন্ধুকে আপনার গৃহে লইয়া যাইতে চাহিলেন, বলিলেন, "এখানে কে সব আয়োজন করিয়া দিবে?" রমেশচন্দ্র বলিলেন, "আমাকে ক্ষমা কর—আজ যাইতে পারিব না, বাড়ীতেই থাকিব।"

রমেশচন্দ্র সকল নিয়ম পালন করিলেন; তাহার পর যোগেন্দ্র-

নাথ বিদায় লইলে, মা'র কক্ষে যাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। এইবার রুদ্ধ অশ্রুর উৎস মুক্ত হইল; নির্ঝরমুক্ত বারিধারার মত অশ্রু ঝরিতে লাগিল। রমেশচন্দ্র হর্ম্ম্যতলে লুটাইয়া কাঁদিলেন। চারিদিকে মার স্মৃতি—হৃদয়ে বাহিরে কেবল সেই স্মৃতি।

অপরাহ্নে ভৃত্য আসিয়া দ্বারে করাঘাত করিল; জিজ্ঞাসায় উত্তর দিল, তাঁহার শ্বশুরালয় হইতে সংবাদ পাইয়া কে আসিয়াছেন। রমেশচন্দ্র বলিলেন, "বল, এখন আমি দেখা করিতে পারিব না।" তিনি মনে মনে বলিলেন, "যখন সকল সম্বন্ধ ঘুচাইব, তখন আর বৃথা লৌকিকতায় কায কি? আর কলহও ভাল লাগে না, কপটতাও ভাল লাগে না।" ভৃত্য চলিয়া গেল। রমেশচন্দ্র আবার ভাবিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে যোগেন্দ্রনাথ আসিয়া ডাকিলেন। রমেশচন্দ্র বাহিরে আসিলেন। শৈল সঙ্গে আসিয়াছিল। সে কাঁদিতে লাগিল; রমেশচন্দ্র তাহাকে সান্ত্বনা দিলেন।

যোগেন্দ্রনাথ মনে মনে রমেশচন্দ্রের সহৃগুণের বিশেষ প্রশংসা করিলেন; ভাবিলেন, এত দিনেও রমেশের সকল গুণ বুঝিতে পারি নাই।

সন্ধ্যার পর যোগেন্দ্রনাথ বিদায় লইলেন। রমেশচন্দ্র বলিয়া দিলেন, তিনি পরদিন প্রভাতে তাঁহার গৃহে যাইবেন। চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে শৈল সেই শূন্য গৃহ ত্যাগ করিল।

* * * * * * * *

পরদিন প্রত্যূষে স্নান করিতে যাইবার পূর্ব্বে যোগেন্দ্রনাথ বারান্দায় পাদচারণ করিতেছেন। সমস্ত গৃহ কেনাঙ্গা ফুলের উগ্রমধুর গন্ধে আমোদিত। সুরেন্দ্রনাথের ভৃত্য হরিদাস আসিয়া প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া ডাকিল—"ছোট বাবু!"

যোগেন্দ্রনাথ দেখিলেন, তাহার মুখ শুষ্ক। তিনি বলিলেন, "কে, হরিদাস? সংবাদ কি?"

ভৃত্য উত্তর করিল, "গত কল্য হইতে বড়বাবুর প্রবল জ্বর হইয়াছে। আজ সর্ব্বাঙ্গে বেদনা—বলিতেছেন।"

তখন কলিকাতায় বসন্ত রোগে নিত্য বহু লোক প্রাণত্যাগ করিতেছে। পথে প্রায়ই "হরিবোল" শ্রুত হয়। বিদেশী ছাত্রের দল অনেকেই 'মেস্' ত্যাগ করিয়া দেশে চলিয়া গিয়াছে; যাহাদের নিতান্ত না থাকিলে নহে তাহারা দুই বেলা গৃহে গন্ধক-ধূম দিয়া শঙ্কাকুল হৃদয়ে বাস করিতেছে। কলিকাতার বাসিন্দাগণ কেহ কেহ সহর ত্যাগ করিয়া নগরোপকণ্ঠে উদ্যান-গৃহে গিয়াছেন। সমস্ত সহরে আতঙ্কের ছায়া—ক্রমে গাঢ়তর হইয়া আসিতেছে। রৌদ্রতপ্ত গগনে সূর্য্যকর বড় প্রখর। সকলেই আশা করিতেছে, বৃষ্টি হইলে ব্যাধির প্রকোপ-শান্তি হইবে। কিন্তু বৃষ্টি কোথায়? প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যায় খানকতক মেঘ আকাশে দেখা দেয়—বিদ্যুৎ চমকায়; তাহার পর, যেন সহরবাসীদিগের আশাকে একান্ত উপহাস করিয়া, রাত্রির মধ্যেই আকাশ মেঘ-মুক্ত হইয়া যায়—প্রভাতে আবার মেঘমুক্ত গগনে

অম্লানোজ্জ্বল রবিকর জ্বলিয়া উঠে। দুই চারি জন এক সঙ্গে হইলেই কেবল আলোচনা—কাহার গৃহে ব্যাধি দেখা দিয়াছে; কোন্ পল্লীতে ব্যাধির প্রকোপ প্রবল, এখন কি করা কর্ত্তব্য। সহরবাসীরা বিষম আশঙ্কায় দিনাতিপাত করিতেছে। সকলেরই ভয়—কাহার গৃহে কখন ব্যাধির বিষম স্পর্শ অনুভূত হয়; কাহার অদৃষ্টে কি আছে। বসন্তের মত বিষম ব্যাধি বড় নাই। ব্যাধির বিষময় ফলের আশঙ্কা অধিকাংশ ব্যাধিতেই আছে: কিন্তু লোকে বসন্তকে যত ভয় করে, আর কোন ব্যাধিকে তত ভয় করে না। একান্ত আপন জন ব্যতীত কেহ বসন্তরোগীকে স্পর্শ করে না। কে ইচ্ছা করিয়া এমন বিষম ব্যাধি টানিয়া আনিতে চাহে? লোকে কুষ্ঠরোগীর সংস্পর্শে আসিতে যত ভীত না হয়, বসন্তরোগীর ব্রণক্ষতাঙ্কিত—স্ফীত—বিলুপ্ত-স্বাভাবিক-আকৃতি আনন দেখিলে তত ভীত হয়। বসন্ত যাহার জীবন রাখিয়া যায়, তাহারও অঙ্গে আপনার চিহ্ন রাখিয়া যায়—সে আমরণ সেই চিহ্ন বহন করে। সকল রোগই প্রাণনাশক হইতে পারে—সকল রোগ শারীরিক সৌন্দর্য্য-সংহারক নহে। মানব স্বভাবতঃই সৌন্দর্য্যের উপাসক। মানব প্রকৃতিতে সৌন্দর্য্যের উপাসক; মানব দেহে রূপের সন্ধান করে। যে দিন আদিম মানব নগ্নসরলতায় বিস্ময়বিপ্লুত নেত্রে প্রকৃতির দিকে চাহিয়াছিল—সেই দিন হইতে সৌন্দর্য্য-তৃষ্ণা তাহার হৃদয়ে বদ্ধমূল। তাই মানব-হৃদয়ে রূপের মোহ বড় সামান্য প্রবল

নহে। বসন্ত মানব-দেহ হইতে রূপের চিহ্ন মুছিয়া লইয়া তৎপরিবর্ত্তে কুশ্রীর চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া যায়। তাই বসন্তের নামে মানব শিহরিয়া উঠে। এখন এমনই দাঁড়াইয়াছে যে, পুত্রের অঙ্গে মশকের দংশন-চিহ্ন দেখিলেও জননীর হৃদয় আতঙ্কপূর্ণ হইয়া উঠে। পতিগৃহগতা দুহিতার জন্য জননীর সর্ব্বদাই আশঙ্কা। নিত্য কত গৃহে জননী আপনার কান্তরূপ শিশুর স্থানে রোগ-চিহ্ন-বিলুপ্ত-শ্রী শিশুর মূর্ত্তি দেখিয়া শিহরিয়া উঠিতেছেন; পতি আপনার রূপবতী ভার্য্যার ভীষণদর্শন আনন দেখিয়া ব্যথিত হইতেছেন। প্রতিবেশী প্রতিবেশীর বিশুষ্কক্ষত আকৃতি দেখিয়া শঙ্কিত হইতেছেন।

রমেশচন্দ্রের উপদেশে কয় দিন পূর্ব্বে যোগেন্দ্রনাথ বসন্তের টিকা লইয়াছেন ও গৃহের আর সকলকে লওয়াইয়াছেন।

আজ হরিদাসের কথা শুনিয়া যোগেন্দ্রনাথের মনে বিষম আশঙ্কার উদয় হইল। আশঙ্কার আতিশয্যে আর চিন্তার অবসর রহিল না; সঙ্কোচের চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গেল। কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণ করিতে আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব হইল না। যোগেন্দ্রনাথ হরিদাসের সঙ্গে সঙ্গে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ভ্রাতার গৃহে উপনীত হইলেন।

দ্রুতপদে সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া যোগেন্দ্রনাথ ভৃত্য কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট ভ্রাতার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তখন নলিনী রোগযন্ত্রনাচঞ্চল সুরেন্দ্রনাথের শুশ্রূষা করিতেছিল।

সে যোগেন্দ্রনাথকে দেখিয়া উঠিয়া পার্শ্বের কক্ষে গেল। সুরেন্দ্রনাথের অবস্থা দেখিয়া ও শুনিয়া যোগেন্দ্রনাথের সন্দেহ আরও দৃঢ় হইল। মুহূর্ত্ত মাত্র চিন্তা করিয়া তিনি গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তিনি রমেশচন্দ্রের নিকট চলিলেন।

রমেশচন্দ্র আসিয়া পরীক্ষা করিলেন; পার্শ্বের কক্ষে যাইয়া যোগেন্দ্রনাথকে বলিলেন, "বসন্ত—তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এখন যাহাতে বিস্ফোটক প্রকাশ পায় তাহাই করিতে হইবে।"

যোগেন্দ্রনাথের মুখ গম্ভীর হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৌদিদিকে কি এ সংবাদ দিব ?"

রমেশচন্দ্র বলিলেন, "অবশ্যই দিতে হইবে।"

"কিন্তু রোগ স্পর্শাক্রমক।"

"মানুষের জীবন এমনই ক্ষণভঙ্গুর যে, তাহা যে থাকে সেই আশ্চর্য্য। মানুষের মৃত্যু আশ্চর্য্য নহে; বাঁচিয়া থাকাই বিস্ময়কর। তবে ভয়ের কারণ কি ? আর জীবনই কি বড়—হৃদয়ের তৃপ্তি, প্রাণের বন্ধন, কর্ত্তব্যের আহ্বান এ সকল কিছুই নহে ?"

যোগেন্দ্রনাথ নীরব।

রমেশচন্দ্র আবার বলিলেন, "বৌদিদি যদি এখন সংবাদ না পায়েন, কিছুক্ষণ পরে পাইবেনই। কয় দিন গোপন রাখিতে পারিবে ? তুমি যাও; তাঁহাকে সংবাদ দিয়া আইস।"

যোগেন্দ্রনাথ আর কিছু বলিলেন না; উঠিলেন। রমেশচন্দ্র

বলিলেন, "একান্ত সৌভাগ্য যে, সে দিন সব টিকা দিয়াছি। তাহা হইলেও তুমি যেন ছেলেদের বা শৈলকে স্পর্শ করিও না; বৌদিদিকে ডাকিয়া সংবাদ দিও।"

যোগেন্দ্রনাথ যাইয়া কুমুদিনীকে সংবাদ দিলেন, "দাদার জ্বর হইয়াছে। গাত্রে বড় বেদনা। সম্ভবতঃ বসন্ত বাহির হইবে।"

কুমুদিনীর চক্ষের সম্মুখে যেন দিবসের আলোক নিবিয়া গেল। তিনি ভয়চকিত কণ্ঠে বলিলেন, "ঠাকুরপো, কি হইবে?"

যোগেন্দ্রনাথ বুঝাইলেন, "ভয় নাই। রমেশ আসিয়াছে; উপযুক্ত চিকিৎসায় জীবনের আশঙ্কা নাই।"

কুমুদিনী বলিলেন, "আমি যাইব।"

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "সব গুছাইয়া চলুন। আমরা ও বাড়ীতেই থাকিব; নহিলে ব্যাধি ব্যাপ্তির সম্ভাবনা।" যোগেন্দ্রনাথ বুঝেন নাই, কুমুদিনীর তখন আর সব গুছাইবার অবসর ছিল না। স্বামীর বিপৎবার্ত্তা পাইলে সাধ্বী পত্নীর আর কিছু ভাবিবার সময় থাকে না।

কুমুদিনী বলিলেন, "কি আর লইব? চল।"

শৈলবালার মুখে আশঙ্কার ছায়া পড়িল—স্বামী স্পর্শাক্রমক-রোগকাতর জ্যেষ্ঠের শুশ্রূষা করিতে যাইতেছেন।

* * * * * * * *

অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া কুমুদিনী রোগকাতর স্বামীর শয্যাপার্শ্বে

উপস্থিত হইলেন। শোক এক দিন উভয়ের মধ্যে যে ব্যবধান দূর করিয়া দিয়াছিল, আজ রোগ সেই ব্যবধান দূর করিয়া দিল। তাঁহার আর অন্য চিন্তা নাই—হৃদয়ে অন্য চিন্তার স্থান নাই। দীর্ঘকালের বিচ্ছেদের যাতনা যেন মুহূর্ত্তে অপনীত হইয়া গিয়াছে। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যেন মনোমালিন্য-সম্ভাবনা-মাত্র ঘটে নাই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অভাগিনী।

যোগেন্দ্রনাথ ভ্রাতার কক্ষে প্রবেশ করিলে নলিনী পার্শ্বের কক্ষে গিয়াছিল। সেখানে সে ভাবিতে বসিল। সে ভাবনায় কেবল যাতনা; সে ভাবনার অন্ত নাই। অতীতের শত স্মৃতি ও বর্ত্তমানের চিন্তা এসকলের মধ্যে একটি কথা পরিস্ফুট হইয়া উঠিল; একই প্রশ্ন তাহার অনুতাপতপ্ত, দীর্ণ—বিদীর্ণ হৃদয়কে চঞ্চল করিয়া তুলিতে লাগিল—এখন উপায় কি? ক্রমে সেই চিন্তায় তাহার আর সকল চিন্তা নিমগ্ন হইয়া গেল। সে ভাবিতে লাগিল—এখন উপায় কি? কিন্তু সে ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিল না—কেবল ভাবিতে লাগিল।

সহসা সুরেন্দ্রনাথের কক্ষে পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া নলিনী চমকিয়া উঠিল; কক্ষ-দ্বার-প্রান্ত হইতে দেখিল, কুমুদিনী সে কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মুখে ভীতিভাব, নয়নে অশ্রু; কেশবাস একান্ত ব্যস্ততা প্রযুক্ত অমনোযোগের পরিচায়ক। বহুদিন পরে নলিনী ভগিনীকে দেখিল। তাঁহার আননে বিষাদের ছায়া দেখিয়া তাহার হৃদয় ব্যথিত হইল। সে মুখে গাম্ভীর্য্য, নির্ভর ও বিষাদ যেন পুণ্য প্রয়াগক্ষেত্রে একত্র সম্মিলিত, অথচ তিনেরই অবস্থান সুস্পষ্ট। নলিনী ভাবিল, আন্তরিক স্নেহের

প্রতিদানে সে তাঁহাকে কেবল যাতনা দিয়াছে। তিনি স্বেচ্ছায় তাহাকে অকৃত্রিম স্নেহ দিয়াছিলেন—সব দিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন; আর সে সেই স্নেহের অপমান করিয়াছে—সেই বিশ্বাস পদদলিত করিয়াছে—তাঁহার সর্ব্বনাশ করিয়াছে। যে দিন তাহার সংসারে একমাত্র সম্বল জননী কুমুদিনীর হস্তে তাহাকে সমর্পিতা করিয়া জীবন ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেদিন সে মনে করিয়াছিল, সংসারে তিনিই তাহার একমাত্র অবলম্বন; সংসারে তিনি ব্যতীত তাহার আর কেহ নাই। তাহার পর সে তাঁহারই সর্ব্বনাশ করিয়াছে; অকৃতজ্ঞ বিষধরের মত; যে তাহাকে বক্ষে পালন করিয়াছে, তাহাকেই দংশনবিষে জর্জ্জরিত করিয়াছে। তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি?

নলিনীর মানসপটে তাহার জননীর মৃত্যুশয্যার চিত্র পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। মরণাহতা জননীর সেই আনন যেন সে চক্ষের সম্মুখে দেখিতে লাগিল। তাঁহার সেই শেষ কথা তাহার কর্ণে ধ্বনিত হইতে লাগিল,—"ধর্ম্মে মতি রাখিও;—দেবতাকে ভুলিও না।" জীবনের পর-পার হইতে যেন আজ সেই কথা তাহার অনুতাপতপ্ত হৃদয়ে ধ্বনিত হইতে লাগিল। সে বাহ্যজ্ঞানহতা হইয়া সেই কথা শুনিতে লাগিল। সে যেন মৃত্যুরাজ্যের স্পর্শ অনুভব করিতে লাগিল; সেই রাজ্যের পবন-বাহিত হইয়া জননীর সেই শেষ কথা তাহার হৃদয়ে আঘাত করিতে লাগিল। এতদিন যে মোহ হৃদয়-দ্বার রুদ্ধ করিয়া

রাখিয়াছিল, আজ সহসা সে মোহ অপসৃত হইয়া গেল—দ্বার মুক্ত হইল। তাহার অন্ধতম অন্ধকারময় হৃদয়ে ক্ষীণ আলোক প্রবেশ করিল। সেই আলোক-সাহায্যে আপনার হৃদয় দেখিয়া সে আপনি শিহরিয়া উঠিল; এই দানবের লীলাভূমি—এই মর্ম্ম-ব্যথার অন্ধকার—এই অনুতাপের বৃশ্চিকদংশন—এই হৃদয় লইয়া সে জীবন যাপন করিয়াছে! সুখের ছলনা দিয়া দুঃখ আবৃত রাখিতে বৃথা প্রয়াস পাইয়াছে; আপনাকে আপনি ছলনা করিয়াছে! কি মোহাবরণেই সে আপনি আপনাকে অন্ধ করিয়া বাস্তবের মূর্ত্তি দেখিতে দেয় নাই; সে কি করিয়াছে!

তাহার বোধ হইতে লাগিল, যেন জননীর যাতনাপূর্ণ নয়ন তাহার দিকে চাহিয়া আছে। সে মনে মনে বলিল, "মা আমি সব ভুলিয়াছি; তোমাকেও ভুলিয়াছি। কিন্তু আর ভুলিব না।"

বাত্যা-বৃষ্টি-ভয়ঙ্কর অন্ধ অমানিশাশেষে যেমন প্রাচীমূলে অরুণরাগরেখা ফুটিয়া উঠে, তেমনই তাহার অন্ধকার হৃদয়ে আশার আলোক-রেখা ফুটিয়া উঠিল।

নলিনী একবার উঠিয়া দ্বার-প্রান্তে গেল; দেখিল, সুরেন্দ্রনাথ রোগ-যাতনায় শয্যায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন, কুমুদিনী শিয়রে বসিয়া বীজন করিতেছেন। তাঁহার অশ্রুপূর্ণ নয়নের দৃষ্টি পতির মুখসংলগ্ন। সে দৃষ্টিতে ভীতির সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ পরিস্ফুট। তিনি হারানিধি পাইয়াছেন; তৃষ্ণার্ত্ত হৃদয়ের শান্তি-সলিল

পাইয়াছেন কেবল কি হারাইবার জন্য? নলিনীর বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। অভাগিনীর অশ্রুর উৎস বুঝি বিশুষ্ক!

ক্রমে বেলা বাড়িতে লাগিল। নলিনী বসিয়া ভাবিতে লাগিল। সে যেন বাহ্যজ্ঞানহতা। দাসী আসিয়া বলিল, "স্নানের বেলা হইয়াছে।" সে কথা যেন তাহাকে চিন্তালোক হইতে বাস্তব জগতে ফিরাইয়া আনিল। মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া নলিনী বলিল, "আমি স্নান করিব না। তুমি যাও।" দাসী চলিয়া গেল। নলিনী আবার ভাবিতে লাগিল।

নিয়মিত সময়ে দাসী আসিয়া সংবাদ দিল, আহার্য্য প্রস্তুত।

নলিনী বলিল, "যাইতেছি।"

তাহার পর নলিনী আবার ভাবিতে লাগিল। দাসী বহুক্ষণ ভাতের কাছে বসিয়া অপেক্ষা করিল। অন্ন শুষ্ক হইতে লাগিল; মক্ষিকাকুল আসিতে লাগিল। শেষে দাসী আবার আসিয়া বলিল, "ভাত যে শুকাইয়া গেল!" নলিনীর চমক ভাঙ্গিল। সে বলিল, "তুমি যাইয়া স্নানাহার কর। আমি আজ আর আহার করিব না।" দাসী বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে একবার নলিনীর চিন্তাছায়াঙ্কিত মুখের দিকে চাহিল; জিজ্ঞাসা করিল, "কেন শরীর কি ভাল নাই?" নলিনী বলিল, "আমি আহার করিব না।" দাসী তখন মনে করিল, সে আসল ব্যাপার বুঝিয়াছে। মনে মনে আপনার বুদ্ধির প্রশংসা করিয়া সে নলিনীকে বুঝাইতে লাগিল,—"না খাইয়া শরীরপাত করিয়া

কি হইবে? রোগ শরীরের ধর্ম্ম; চিকিৎসায় সারিয়া যাইবে। সে জন্য অত ভাবিয়া কি করিবে? আমার আনন্দের যখন বড় পীড়া, তখন কত ভাবিয়াছি। কিন্তু কিছুতে কিছু হইল না। বাছা আমার তিন দিনের জ্বরে—রাত্রি পোহাইতে না পোহাইতে ফাঁকি দিয়া গেল।" দাসী অঞ্চলে চক্ষু মুছিল।

নলিনী দাসীর কথা শুনিয়াও শুনিতেছিল না। যুবতী যেমন তটিনীনীরে কলস ভাসাইয়া প্রবাসগত পতির কথা ভাবিতে ভাবিতে আর সব ভুলিয়া যায়—তরঙ্গে তরঙ্গে কলস যে দূরে যাইতেছে, তাহা দেখিয়াও দেখে না—সে তেমনই চিন্তাবেশে দাসীর কথা শুনিয়াও শুনিতেছিল না। কাহারও কথা তখন আর তাহার ভাল লাগিতেছিল না। দাসীর কথা শেষ হইলে নলিনী বলিল, "তুমি এখন যাও।"

দাসী আপনাকে বড় অপমানিতা বোধ করিয়া উঠিয়া গেল; মনে মনে বলিল, "গরীব দুঃখীর কথা ভাল লাগে না! অত বাড় ভাল নহে।"

নলিনী ভাবিতে লাগিল।

বেলা বাড়িতে লাগিল। দীপ্ত সূর্য্য দগ্ধ-তাম্র-বর্ণ মধ্য-গগনে উপনীত হইল। তাহার সহস্র কিরণরেখা যেন সহস্র অনল-শিখায় গগন দগ্ধ করিতে লাগিল। ধূলিধূসর মধ্যাহ্নে কর্ম্মকেন্দ্র নগরীর কর্ম্মকোলাহলও যেন শ্রান্ত হইয়া পড়িল। বিবর্ণ গগনে চাতকের দূরাগত ক্ষীণ আর্ত্তস্বর শ্রুত হইতে লাগিল। গৃহে গৃহে

বাতায়ন বদ্ধ ; রৌদ্রতপ্ত রাজপথ বিরলপথিক ; গগনমণ্ডল যেন অনল-তাপে বিবর্ণ ; রাজপথের পার্শ্বে বৃক্ষবীথিকা ম্লানপল্লবা ; বায়সকুল বিরাববিমুখ। নলিনী ভাবিতে লাগিল।

ক্রমে সূর্য্য পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়িল ; অনলবর্ষণ করিতে করিতে ক্রমে চক্রবালরেখায় আসিল। তখনও সঞ্চিততাপা পাষাণনগরীর নিশ্বাস অগ্নিময় ; তখনও তাহার পাষাণবক্ষ তাপতপ্ত। ধীরে ধীরে আবার নগরের কলরব জাগিয়া উঠিল ; রাজপথে ধূলির মত কোলাহল ছড়াইয়া পড়িল। নলিনী ভাবিতে লাগিল।

ধীরে ধীরে দীপ্তিময় সূর্য্যের আলোকোজ্জ্বল দীপ্তির হ্রাস হইল—রক্তোৎপললোহিতবর্ণ সূর্য্য ক্রমে ক্রমে চক্রবালনিম্নে অদৃশ্য হইয়া গেল ; পশ্চিম গগন তাহার অস্ত-রশ্মি-প্রভায় পাটলবর্ণ ধারণ করিল। তাহার পর লজ্জাতুরার মৃদুপদসঞ্চারের মত ধীর নিঃশব্দ গতিতে সন্ধ্যার অন্ধকার দিগন্তে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতে লাগিল ; অন্ধকার শ্মশানে দিবসের শেষ কনক-কিরণ নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। গভীর নীল সাগর-সলিলে শুভ্র ফেনপুঞ্জের মত গগন-প্রাঙ্গণে তারকাপুঞ্জ বিকশিত হইয়া উঠিল। গৃহে গৃহে মুক্ত বাতায়ন-পথে দীপালোক দৃষ্ট হইতে লাগিল। দূরে মন্দিরে আরতির শান্তি শঙ্খ ধ্বনি ধ্বনিত হইল। প্রকৃতির অভিনব মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিল। সে মূর্ত্তিতে গাম্ভীর্য্যের সৌন্দর্য্য—শান্তির লাবণ্যশ্রী। নলিনী ভাবিতে লাগিল।

শেষে বিরক্ত হইয়া নলিনী আপনা আপনি বলিল, "আর ভাবিয়া কি হইবে ? যখন ভাবনার অবকাশ ছিল, তখন ভাবি নাই। অকূলে ঝাঁপ দিয়া এখন কূলের সন্ধান করিয়া আর কি হইবে ? কে কবে অকূলের কূল পাইয়াছে ?" সে উঠিল। তাহার পর বড় ইচ্ছা হইল, একবার ভগিনীর পদপ্রান্তে ক্ষমা ভিক্ষা করিবে। লজ্জা হইল। তাহার মনে হইল, তাহা হইলে আর যাইতে পারিবে না ; সে স্নেহ-বন্ধনে আবার বদ্ধ হইলে, আর সে বন্ধন ছিন্ন করিতে পারিবে না।

নলিনী কয় পদ অগ্রসর হইল। তাহার প্রাণে বাসনা জাগিল, যাইবার সময় একবার সুরেন্দ্রনাথকে দেখিয়া যাইবে। সে ধীরে ধীরে নিঃশব্দ-পদ-সঞ্চারে সুরেন্দ্রনাথের কক্ষদ্বারপ্রান্তে উপনীতা হইল। কক্ষের এক কোণে টেব্‌লের উপর আলোক—মৃদুতেজা। সুরেন্দ্রনাথ তখনও শয্যায় রোগ-যন্ত্রণায় অধীর। কুমুদিনী রোগীর শিয়রে—যোগেন্দ্রনাথ পার্শ্বে। রমেশচন্দ্র কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

মুহূর্ত্ত নিশ্চল হইয়া স্থির দৃষ্টিতে নলিনী সেই দিকে চাহিয়া রহিল। মনে বড় বাসনা হইতে লাগিল, একবার সেই কক্ষে প্রবেশ করে—একবার রোগ-যাতনা-চঞ্চল সুরেন্দ্রনাথকে নয়ন ভরিয়া শেষবার দেখে। সে যেন সবলে আপনাকে সেই দ্বার-প্রান্ত হইতে সরাইয়া আনিল ; তাহার পর যেন ভয়-তাড়িতা হইয়া দ্রুত নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে কক্ষের পর কক্ষ অতিক্রম করিয়া

সোপান সন্নিকটে আসিল। তাহার মস্তক যেন ঘুরিতেছিল; তাহার নয়নে যেন ধাঁধাঁ লাগিতেছিল। সে আর অপেক্ষা করিল না—সোপানশ্রেণী অবতরণ করিয়া গৃহ হইতে রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইল। একজন ভৃত্য তাহাকে বাহির হইতে দেখিল। সে বিস্মিত হইল; একবার ভাবিল; যাইয়া সংবাদ দিব; আবার ভাবিল, বাবুর অসুখ,—আমি বেতনভুক্ ভৃত্য, আমার পরের কথায় থাকিবার প্রয়োজন? বড় লোকের ঘরের কথায় থাকিব না।

নলিনী গৃহদ্বার পার হইয়া আসিয়া রাজপথে দাঁড়াইল। সেই সময় একটি শব বহন করিয়া শববাহীরা সেই স্থান দিয়া যাইতেছিল। শব বসন্তরোগীর। শববাহীরা কেহ কেহ এক হস্তে বস্ত্র দ্বারা নাশাপথ রুদ্ধ করিতেছে; একজন সঙ্গে সঙ্গে করধৃত পাত্রে গন্ধক দাহ করিতেছে। তাহারা নিকটে আসিল। নলিনী সরিল না। শববাহীরা পাশ কাটাইয়া গেল।

নলিনী একবার মুগ্ধনেত্রে গৃহের দিকে চাহিল। সেই গৃহে তাহার সব। সে গৃহ যেন সহস্র আকর্ষণে তাহাকে আকৃষ্ট করিতেছিল। বহুকষ্টে গৃহবদ্ধদৃষ্টি ফিরাইয়া সে আকাশের দিকে চাহিল। কলাপিকলাপে চক্রের মত, নীল গগনে শত তারকার দীপ্তি। আর সেই নীল আকাশের উদার বক্ষে—মাধবের হৃদিবিলম্বিত হারে কৌস্তুভ মণির মত অম্লানোজ্জ্বল চন্দ্র। প্রকৃতি:সুন্দরী।

সহসা নলিনীর মনে হইল, যদি কেহ আমাকে দেখিতে পায়?

যদি যাওয়া না ঘটে? আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া সে চলিতে লাগিল। সে কোথায় যাইবে?—স্থিরতা নাই। সে কথা সে ভাবে নাই। যে বিশাল জগতে ধূলিমধ্যেও সহস্র সহস্র প্রাণীর স্থান আছে, সে জগতে কি তাহারই স্থান নাই?

পথে জনস্রোতঃ। কত লোক চাহিয়া দেখিতে লাগিল। নলিনী যেন লজ্জায় মরিয়া যাইতে লাগিল। সেই পাষাণনগরীর স্বার্থসংঘর্ষতরঙ্গিত জনস্রোতে সে ভাসিল। বেপমান হৃদয়ে—শঙ্কাজড়িত চরণে সঙ্কোচ-সঙ্কুচিতা অভাগিনী আপনার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিতে কৃত-সংকল্পা হইয়া—ভবিষ্যৎ বিবেচনা না করিয়া পথে চলিতে লাগিল। ঘটনার প্রবল স্রোতে লঘু তৃণখণ্ড ভাসিয়া গেল। কোন্ কূলে আশ্রয় পাইবে?

সন্ধ্যার কিছু পরে কুমুদিনী উঠিলেন। তখন নলিনীর কথা মনে পড়িল। নলিনী কোথায়? তিনি সমস্ত দিন তাহার সন্ধান লইতে ভুলিয়াছেন। তিনি এঘর—ওঘর দেখিলেন——নলিনী নাই। তিনি দাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন; তাহারা সন্ধান দিতে পারিল না। কুমুদিনীর মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। তিনি যোগেন্দ্রনাথকে ডাকিলেন। সকল শুনিয়া যোগেন্দ্রনাথ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন। কুমুদিনী বলিলেন, "ঠাকুরপো, এখন উপায় কি?"

যোগেন্দ্রনাথ কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। তিনি কি উত্তর দিবেন?

দুইজনে আবার সন্ধান করিয়া দেখিলেন,—নলিনী নাই; সংবাদ লইয়া জানিলেন, নলিনী পার্শ্বের বাসগৃহে গমন করে নাই। কুমুদিনীর নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল।

তখন দেবরের হস্ত ধারণ করিয়া কুমুদিনী কাঁদিয়া বলিলেন, "ঠাকুরপো, আমার দোষে এ দুর্ঘটনা ঘটিল। আমি সারাদিন তাহার সংবাদ লই নাই, তাহাকে কাছে ডাকি নাই। তাই লজ্জায় সে চলিয়া গিয়াছে। আমি আর কেমন করিয়া এ পোড়ামুখ দেখাইব ?"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রোগী।

অনাহারে অনিদ্রায় আশঙ্কা-বিশীর্ণা কুমুদিনী রোগ-কাতর স্বামীর শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে সুরেন্দ্রনাথের সর্ব্বাঙ্গ বসন্ত-বিস্ফোটক-কণ্টকিত হইয়া উঠিল; দেহে আর স্থান নাই, সর্ব্বাঙ্গে বিষম বেদনা,—যন্ত্রণার সীমা নাই।

চারিদিন পরে রমেশচন্দ্র বলিলেন, "আজ নিশ্চিন্ত হইলাম। আর ভয় নাই।" যোগেন্দ্রনাথ ও কুমুদিনী নিশ্চিন্ত হইলেন।

কুমুদিনী রমণী-সুলভ যত্নে ও সাধ্বী-স্বভাবসিদ্ধ আগ্রহে সুরেন্দ্রনাথের সহস্র-ক্ষত-পূর্ণ দেহে ঔষধপ্রয়োগ করিতে লাগিলেন। সুরেন্দ্রনাথ যখনই চাহিতেন, তখনই দেখিতেন, কুমুদিনী তাঁহার শুশ্রূষানিরতা। তাঁহাকে কোন দ্রব্য চাহিতে হইত না; তিনি চাহিবার পূর্ব্বেই তাঁহার মনোভাব বুঝিয়া কুমুদিনী সে দ্রব্যটি আনিয়া দিতেন। সুরেন্দ্রনাথের মনে হইত, যেন করুণা-দেবী তাঁহার শিয়রে বসিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছেন। সে শুশ্রূষায়, আন্তরিক যত্নে তাঁহার রোগ যাতনাও যেন প্রশমিত হইত; তিনি সে যন্ত্রণা ভুলিতেন।

পীড়ায় কি আছে, জানি না—তাহা দুর্ব্বৃত্তকে শান্ত করে, পাপীকে অনুতপ্ত করে। শারীরিক ব্যাধি অনেক সময়

মানসিক শান্তিলাভের সোপান। রোগে যখন শরীর নিস্তেজ হইয়া আইসে, তখন মানসিক বৃত্তিও কোমল হয়, চাঞ্চল্য দূর হয়, স্নিগ্ধভাব আবির্ভূত হয়। রোগশয্যায় চিন্তা আপনি আইসে। রোগশয্যায় আমরা স্নেহময়ী জননীর স্নেহ, প্রেমময়ী পত্নীর প্রেম, ভালবাসাময়ী ভগিনীর ভালবাসা ও ভক্তিময়ী দুহিতার ভক্তি কত অপরিমেয়, তাহা বুঝিতে পারি। সিন্ধু শান্ত না হইলে তাহাতে চন্দ্রের গোলক সম্পূর্ণ প্রতিবিম্বিত হয় না; হৃদয় সহস্র কর্ম্মের ব্যাকুলতামুক্ত না হইলে তাহাতে স্নেহ-প্রেমাদির অনুভূতি সুস্পষ্ট হইতে পারে না। রোগশয্যায় হৃদয় সেই ব্যাকুলতামুক্ত হয়—সকল শক্তি কেন্দ্রানুগা হয়—মানুষ সমস্ত সংসার ছাড়িয়া আপনার সংসারের হয়; জনস্রোতঃ ত্যাগ করিয়া আপনার স্বজনগণের নিকটে আইসে, আসিয়া হৃদয়ে অননুভূতপূর্ব্ব স্নিগ্ধ শান্তিসুখ লাভ করে। সে সুখ কি কর্ম্মের ফেনিল তরঙ্গতাড়নে প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব?

আবার যে পীড়ায় রোগী শয্যাপার্শ্বে মৃত্যুর ছায়াপাত-সম্ভাবনা অনুভব করে, সে পীড়ায় রোগী আপনার জীবনের কার্য্যাবলীর আলোচনা করে—আপনার ভ্রম বুঝিয়া দুঃখিত হয়—আপনার পাপ স্মরণ করিয়া অনুতাপ করে। যেন অন্ধের দৃষ্টি ফিরিয়া আইসে। তখন কবে, কি ব্যবহারে, কে মনে কষ্ট পাইয়াছে, স্মরণ করিয়া রোগী আপনি মনে কষ্টানুভব করে। যখন মনে হয়, বুঝি জীবনের দোকানপাট গুটাইতে হইল, তখন যাহার প্রাপ্য স্নেহ

হয় নাই তাহার কথা মনে করিলে লজ্জা হয়—আপনাকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছা জন্মে। যখন মনে হয়, বুঝি এইবার জীবনের খেয়া পার হইতে হইবে, তখন জীবনের শত উদ্ধত ব্যবহার একান্ত অনাবশ্যক বলিয়া বোধ হয়; সেই সব তুচ্ছ ব্যাপারের জন্য কাহারও মনে কষ্ট দেওয়া হইয়াছে মনে করিলে, দুঃখ না হইয়া পারে না। রোগে ও অসাফল্যে হৃদয়-বৃত্তি কোমল হয়।

রোগশয্যাশায়ী সুরেন্দ্রনাথ আপনার জীবনের ঘটনাবলীর পর্য্যালোচনা করিতেন; আপনার কার্য্য-সকলের বিষয় চিন্তা করিতেন। তিনি শুশ্রূষানিরতা পত্নীর কথা ভাবিতেন; তাঁহার শঙ্কা-সজল নয়ন, তাঁহার জাগরণ-ক্ষীণ পাণ্ডুর আনন, তাঁহার অক্লান্ত শুশ্রূষা লক্ষ্য করিতেন, তাঁহার প্রতি তিনি যে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিতেন; আর তাঁহার নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিত—ব্রণক্ষতপূর্ণ আনন দিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িত। কুমুদিনী সযত্নে সে অশ্রু মুছাইতেন; ভাবিতেন, বুঝি শারীরিক যন্ত্রণা অত্যধিক হইতেছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন, "কি যন্ত্রণা বোধ হইতেছে?" সুরেন্দ্রনাথের মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইত না। কেবল অশ্রুস্রোতঃ দ্বিগুণ বহিত। অনুতাপের কি দুর্ব্বিসহ বেদনায় সুরেন্দ্রনাথের অশ্রুর উৎস মুক্ত হইয়াছিল, কুমুদিনী তাহা বুঝিতে পারিতেন না। তিনি সযত্নে সে অশ্রুধারা মুছাইতেন।

ধীরে ধীরে সুরেন্দ্রনাথ সুস্থ হইয়া উঠিতে লাগিলেন; ক্ষতমুখ শুষ্ক হইবার সকল লক্ষণ দেখা দিল, বেদনা প্রশমিত হইল।

রোগের যন্ত্রণা প্রশমিত হইতে লাগিল, কিন্তু চিন্তার যাতনা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল; অনুতাপ-ভার-কাতর হৃদয় যেন ক্রমেই ভারাতিশয্য-কাতর হইয়া উঠিতে লাগিল। রমেশচন্দ্র প্রায়ই বলিতেন, আপনাকে একটু প্রফুল্ল হইতে হইবে। মন ভাল না থাকিলে শরীর ভাল হয় না। হায়—চিকিৎসক, অগ্রে আপনি আপনার এই উপদেশ পালন কর।

বাষ্পীয়যানের বাষ্পাধারে সঞ্চিত বাষ্পরাশি বাহির হইবার পথ না পাইলে, যেমন ক্রমে বলসঞ্চয় করিতে থাকে ও শেষে তাহাকে পীড়িত করিয়া তুলে—সুরেন্দ্রনাথের হৃদয়ের ভারও সেইরূপ ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া তাঁহার অনুতাপতপ্ত হৃদয়কে পীড়িত করিতেছিল। ক্রমে তাহা আর মনে রাখা অসম্ভব হইয়া উঠিল।

এক দিন চিন্তা করিতে করিতে সুরেন্দ্রনাথের হৃদয় একান্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। সমস্ত দিন সুরেন্দ্রনাথ একান্ত অস্থিরতা অনুভব করিতে লাগিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা হইল। সুরেন্দ্রনাথ বড় বিষণ্ণ। কুমুদিনী ও যোগেন্দ্রনাথ পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ কি শরীর অধিক অসুস্থ বোধ হইতেছে? কোন যন্ত্রণা বোধ হইতেছে কি?" সুরেন্দ্রনাথ কেবল বলিলেন, "না।" কিন্তু সেই ক্ষুদ্র কথাটি বলিতে যেন তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতেছিল।

ক্রমে রাত্রি গভীর হইয়া আসিল। সুরেন্দ্রনাথের চক্ষে নিদ্রার সর্ব্বযন্ত্রণাহর স্পর্শ পড়িল না। তিনি অনিদ্র হইয়া চিন্তা

করিতে লাগিলেন। মধ্যরাত্রিতে যোগেন্দ্রনাথ পার্শ্বের কক্ষে ঘুমাইয়া পড়িলেন। তখনও কুমুদিনী স্বামীর শিয়রে বসিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছেন। সুরেন্দ্রনাথ একবার কাতর নয়নে পত্নীর মুখে চাহিলেন। নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল। কুমুদিনী ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কষ্ট হইতেছে?"

সুরেন্দ্রনাথের মনের কথা আর লজ্জা-বন্ধন মানিল না। হৃদয়ের সে ভাব আর সহ্য হয় না। তিনি বলিলেন, "আমাকে ক্ষমা কর।"

কুমুদিনী মনে মনে বলিলেন, "আমি কবে তোমাকে অপরাধী মনে করিয়াছি যে, আজ ক্ষমা করিব? তুমি যদি আমাকে ভুলিয়া থাক, আমি কি মুহূর্ত্তেরও জন্য তোমাকে ভুলিতে পারিয়াছি?" কিন্তু মনের কথা মুখে বাহির হইল না। অশ্রুর উচ্ছ্বাসে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইল—বিন্দু বিন্দু অশ্রু স্নিগ্ধ ক্ষমার মত স্বামীর ক্ষতকণ্টকিত আননে পতিত হইল। সে অশ্রুতে নারী হৃদয়ের অভিমান ও অপগত-ভ্রান্তি বাঞ্ছিতকে আবার আপনার পাইবার সুখ প্রকটিত হইল। প্রকৃতির অঙ্গুলি-স্পর্শে কুমুদিনীর আত্মসংযমবন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল—সেই স্তব্ধ নিশীথে—ক্ষীণদীপালোকিত কক্ষে রোগশয্যাশায়ী স্বামীর শিয়রে অনুতাপতপ্ত স্বামীর সামান্য কথায় কুমুদিনীর নারী-প্রকৃতি বালাতপকিরণবিকশিত শুভ্র শতদলের মত আত্মপ্রকাশ করিল।

সুরেন্দ্রনাথ ক্ষমা চাহিবার পূর্ব্বেই ক্ষমা পাইয়াছিলেন। সাধ্বী পত্নী ক্ষমা লইয়াই ঘর করে। সুরেন্দ্রনাথ বুঝিতে পারি-

লেন, কুমুদিনীর দেবী-প্রকৃতি কত উদার। দাম্পত্য প্রেমের একার্দ্ধ পুণ্যপূত, স্বর্গীয়, দিব্যদীপ্তি-সমুজ্জ্বল; অপরার্দ্ধ বাসনা-কলুষিত, পার্থিব, মলিন। এই শেষার্দ্ধ একান্ত ক্ষণভঙ্গুর, সহস্র কারণে, সামান্য আঘাতে তাহা চূর্ণ হইয়া যায়। যে হৃদয়ে তাহাই প্রবল, সে হৃদয়ে দেবত্বের আভাস নাই, সে হৃদয়ে শান্তি-লাভ-সম্ভাবনা অসম্ভব; তাহার পক্ষে পদে পদে ভ্রম ও সেই ভ্রমের ফলে দুঃখ যাতনা একান্ত অনিবার্য্য। কে তাহা না বুঝিয়াছে? রূপজমোহ প্রেমের এই শেষার্দ্ধের অন্তর্গত; কারণ-বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে তাহার বিলোপ। তাহা জীবন-সম্বল হওয়াই সুলভ নহে, মরণ-সম্বল হইতে পারে না। যে দম্পতির হৃদয়ে প্রেমের এই শেষার্দ্ধ প্রবল, তাহাদের সুখ একান্ত ক্ষণস্থায়ী। অত্যল্পকাল পরেই প্রেমের আকর্ষণ একান্ত কঠোর লৌহ-শৃঙ্খল বলিয়া অনুভূত হয়; জীবন দুর্ব্বহ হইয়া দাঁড়ায়। তখন প্রভাত হইতে প্রভাত পর্য্যন্ত সংসারে কেবল মিথ্যার প্রাধান্য হয়। তখন পত্নীর প্রতি পতির প্রেমলীলা অন্তঃসারশূন্য—অভিনয় মাত্র। পতির প্রতি পত্নীর প্রগাঢ়-প্রণয়-প্রদর্শন একান্তই লোকদেখান—মিথ্যা। উভয়ের চেষ্টা—কেবল অপরের চক্ষে ধূলি প্রদান—বুঝি আপনাদিগকেও প্রতারিত করা। পত্নী যখন পুত্রকে বলেন, "তোমার পিতৃদেবতাকে ভক্তি করিও"—তখন তিনি প্রকৃত মনোভাব গোপন করেন। পতি যখন বন্ধুকে বলেন, "আমার স্ত্রী না থাকিলে আমার জীবন দুর্ব্বহ হইত"—তখন তিনি মিথ্যা

কথা কহেন। সে সংসারে আন্তরিকতা থাকে না—কেবল অভিনয় থাকে ; সত্য থাকে না—মিথ্যাই প্রবল হয়। আর যে দম্পতির হৃদয়ে প্রেমের প্রথমার্দ্ধ প্রবল, সে দম্পতির সংসার চিরসুখের আগার—চিরশান্তির পুণ্য নিকেতন—পবিত্রতার স্বর্গ। আজ সুরেন্দ্রনাথ বুঝিলেন, প্রেমের পার্থিব—মলিন—বাসনা-কলুষিত অংশ তাঁহার হৃদয়ে প্রবল হইয়া অপর অংশ আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বুঝিলেন, কুমুদিনীর প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে প্রেমের পুণ্যপূত—স্বর্গীয়—দিব্যদীপ্তি সমুজ্জ্বল অংশই প্রবল। সে হৃদয়ের প্রেম গভীর ও গম্ভীর—চাঞ্চল্যচপলতা-যুক্ত—শান্তিশ্রীসম্পন্ন। আজ তিনি বুঝিলেন, তিনি কত নিম্নে, কুমুদিনী কত উচ্চে! তাহা বুঝিয়া সুরেন্দ্রনাথ সুখী হইলেন। আপনার হীনত্বে তাঁহার হৃদয় আক্রোশচঞ্চল হইল না। তাঁহার হৃদয় শান্ত। আজ তিনি হৃদয়ে যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দসুখ লাভ করিলেন তাহা একান্ত দুর্লভ—সে সুখলাভ সহজে ঘটে না।

সেই দিন হইতে সুরেন্দ্রনাথ দ্রুত আরোগ্য লাভ করিতে লাগিলেন। রমেশচন্দ্র রোগীর অবস্থার এই পরিবর্ত্তনে যেমন সুখী হইলেন, তেমনই বিস্মিত হইয়া ভাবিলেন, মানব হৃদয়ের সহস্র পরিবর্ত্তনের যেমন অন্ত পাওয়া যায় না, মানব দেহেরও তেমনই সহস্র পরিবর্ত্তনের কারণ নির্দ্দেশ করা যায় না। তাঁহার উপদেশে নলিনীর সংবাদ সুরেন্দ্রনাথকে জানান হইল না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

জ্বালা নির্ব্বাণ।

প্রায় মধ্যাহ্ন। দীপ্ত দিবাকর মধ্যগগনবর্ত্তী। বাতাস উষ্ণ—যেন জ্বালাকাতরা ধরণীর উষ্ণশ্বাস। রোগী দেখিয়া হস্‌পিটালের সংক্রামকরোগগ্রস্তদিগের পর্য্যবেক্ষক ডাক্তার বাহির হইয়াছেন। সাধারণতঃ ইহার বহু পূর্ব্বেই কার্য্য শেষ হয়; কিন্তু আজ কাল বসন্ত রোগীর সংখ্যা এতই অধিক যে, বৃহৎ আগার প্রায় পূর্ণ—প্রায় প্রত্যেক রোগশয্যায় রোগী। সেইজন্য—রোগীর সংখ্যা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকেরও কার্য্য বাড়িয়াছে। চিকিৎসক প্রৌঢ়; বরং দেহে আসন্ন বার্দ্ধক্যের ছায়াপাত লক্ষিত হয়। দেহের দৈর্ঘ্য ও বিস্তার অনন্যসাধারণ। বিশাল বপু সুগঠিত। মস্তকের মধ্যভাগ বিরলকেশ। অর্দ্ধ-শ্বেত শ্মশ্রুরাজি কর্ত্তিত। মুখে একটি পুষ্ট বর্ম্মা চুরুট লাগিয়াই আছে। স্বভাব অতি মিষ্ট; মেজাজ বড় ভাল। তিনি রোগী দেখিয়া আসিয়া সোপানে দাঁড়াইয়া আপনার গাড়ী ডাকিতেছেন, এমন সময় একখানি পাল্কীতে একটি রোগী লইয়া একজন কন্‌ষ্টেব্‌ল আসিয়া উপস্থিত হইল। ডাক্তারের সহকারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিসের রোগী?

কন্‌ষ্টেব্‌ল উত্তর করিল, "বাবু, আমি তাহা জানি না।"

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, "এখন রোগী হইলেই আমাদের বিভাগের। ও আর জিজ্ঞাসা করিতে হয় না।"

সহকারী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় পাইলে?"

কনষ্টেব্‌ল বলিল, "গড়ের মাঠে, গঙ্গার ধারে।"

হাঁসপাতালের ভৃত্যগণ রোগীকে পাল্কী হইতে বাহির করিল। রোগিণী যুবতী—সুন্দরী—শারীরিক দৌর্ব্বল্যের চরমসীমাগতা। রোগিণীকে দেখিয়া ডাক্তার সবিস্ময়ে সহকারীর দিকে চাহিলেন। সেরূপ আকৃতি ভদ্রকুলবালা ব্যতীত অন্যে সম্ভব নহে। ভৃত্য-গণ রোগিণীকে কক্ষমধ্যে লইয়া গেল।

সহকারী বলিলেন, "ইহার মূলে—পাপ।"

ডাক্তার বলিলেন, "তোমার রজ্জুতে সর্পভ্রম হওয়াও অসম্ভব নহে। জগতে বহু ভিন্ন ভিন্ন কারণে একই রূপ ফল ফলিতে পারে—ফলিয়াও থাকে। দারিদ্র্য, অভিমান, লজ্জা—এ সকলও ইহার কারণ হইতে পারে।"

উভয়ে রোগী-পরীক্ষা করিতে চলিলেন।

রোগশয্যাশায়িতা রোগিণীর শয্যাপার্শ্বে উপনীত হইয়া ডাক্তার ও সহকারী রোগ-পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। উভয়ের মধ্যে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি-বিনিময় হইয়া গেল।

ডাক্তার ইংরাজীতে বলিলেন, "গুপ্ত বসন্ত। অধিকন্তু অত্য-ধিক দৌর্ব্বল্য—জীবনীশক্তির একান্ত অভাব।"

সহকারী বলিলেন, "বাঁচিবার আশা নাই।"

"আমার তাহাই বোধ হয়।"

সহকারী রোগিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি?"

রোগিণী মুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ করিল, তাহার পর ক্ষীণস্বরে বলিল, "নলিনী।"

"গড়ের মাঠে পড়িয়া ছিলে কেন?"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া রোগিণী বলিল, "আজ তিন দিন আমি পথে পথেই ঘুরিয়াছি।"

"কেন?"

রোগিণী নিরুত্তর।

সহকারী জিজ্ঞাসাকরিলেন, "তোমার বাড়ী কোথায়?"

রোগিণী নীরব।

সহকারী চিকিৎসক বিরক্তি সহকারে পুনরায় বলিলেন, "তোমার বাড়ী কোথায়?"

রোগিণী উত্তর দিল না; কিন্তু ডাক্তার দেখিলেন, সেই বিরক্তি-কঠোর স্বরে তাহার মুখে বেদনার চিহ্ন পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। তাঁহার মনে কষ্ট হইল। তিনি বনিয়াদি ঘরের সন্তান, সহকারীকে বলিলেন, "যদি বলিতে আপত্তি থাকে, তবে তোমার পীড়াপীড়ি করিবার প্রয়োজন নাই।" সহকারী নীরব হইলেন।

ডাক্তার সস্নেহে রোগিণীকে বলিলেন, "তোমার কি আত্মীয় স্বজন কেহ নাই? কাহাকেও কি দেখিতে ইচ্ছা করে? সংবাদ দিতে হইবে কি?"

রোগিণী মৃদুস্বরে বলিল, "না।" কিন্তু তাহার দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল। ডাক্তার আর সে প্রসঙ্গের উত্থাপন করিলেন না।

ব্যবস্থা-পত্র লিখিয়া ও অন্যান্য ব্যবস্থা করিয়া গৃহে যাইবার সময় ডাক্তার বিশেষ করিয়া আদেশ প্রচার করিলেন,—কেহ যেন তাহার ব্যক্তিগত কথা লইয়া রোগিণীকে বিরক্ত না করে। তখন মধ্যাহ্ন অতীত হইয়া গিয়াছে।

পর দিন প্রভাতে আসিয়া ডাক্তার দেখিলেন, নলিনীর অবস্থা আরও মন্দ; বাঁচিবার আর কোন আশাই নাই। তিনি তাহার সহিষ্ণুতা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। সেই বৃহৎ কক্ষ বহু রোগ-কাতরের আর্ত্তনাদে পূর্ণ; সামান্য নড়িতে রোগী কাতর চীৎকারে যাতনা জানাইতেছে। এক এক জন এতই অধিক কাতরতা জ্ঞাপন করিতেছে যে, একান্ত হৃদয়হীনের মত তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়া শান্ত করিবার চেষ্টা করিতে হইতেছে—রোগ-যাতনায় কাতরতাজ্ঞাপক আর্ত্তনাদে আরাম-লাভ-চেষ্টা হইতেও বঞ্চিত করিতে হইতেছে। কেবল নলিনী স্থির। তাহার নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিতেছে, কিন্তু মুখে শব্দমাত্র নাই। সুদীর্ঘ কালের অভিজ্ঞতায় ডাক্তার এরূপ রোগী আর দেখেন নাই। তিনি বুঝিলেন, রোগিণী মরণের কূলেও ভদ্রমহিলাসুলভ লজ্জার আতিশয্যমুক্ত হইতে পারে নাই। তাহার এই সাধারণ চিকিৎসাগারে মৃত্যু কি ঘটনাপরম্পরার ফল—কি রহস্যকুহেলিকান্ধকারাবৃত! এই সকল চিন্তায় আকৃষ্ট-মনোযোগ ডাক্তার বিশেষ যত্নের সহিত রোগিণীকে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু অভিজ্ঞ চিকিৎসক বিশেষ জানিতেন,

চিকিৎসা শরীরের স্বাভাবিক ক্রিয়ার সাহায্যমাত্র করিতে পারে, মৃত্যুর সহিত সংগ্রামে জয়লাভ তাহার সাধ্যাতীত। নলিনী যে রোগে কাতর তাহাতে তাঁহার সহস্র চেষ্টাতেও তাহাকে মৃত্যু-গ্রাসমুক্ত করা সম্ভব হইবে না।

প্রতিদিন প্রভাতে আসিয়া ডাক্তার অগ্রেই নলিনীর অবস্থা পরীক্ষা করিতেন। ডাক্তার প্রতিদিন বহু রোগীর মৃত্যুতে অভ্যস্ত; কিন্তু নলিনীর মুখে আসন্ন মৃত্যুর ছায়া যতই নিবিড় হইতে লাগিল, তিনি যেন ততই কোন স্বজন-বিয়োগ-সম্ভাবনায় ব্যথিত হইতে লাগিলেন। তাহার অকাতর সহিষ্ণুতা ও লজ্জা-নম্র বিনয় তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল। তাই তাহার আসন্ন মৃত্যু-সম্ভাবনায় তিনি ব্যথিত হইলেন।

কয় দিনেই নলিনীর অবস্থা একান্ত শোচনীয় হইয়া আসিল। ডাক্তার বুঝিলেন, মৃত্যু একান্ত নিকট। তিনি তাহার শুশ্রূষার বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া ও একজন শুশ্রূষাকারীকে সর্ব্বদা তাহার নিকট থাকিতে আদেশ করিয়া চিন্তাবিষ্ট হৃদয়ে গৃহে ফিরিলেন।

পরদিন প্রভাতে আসিয়া ডাক্তার শুশ্রূষাকারীকে প্রশ্ন করিলেন, "সে রোগী কেমন ?"

শুশ্রূষাকারী উত্তর করিল, "সে মৃত।"

ডাক্তার আপনা আপনি বলিলেন, "সর্ব্বযন্ত্রণামুক্ত।" তাহার পর শুশ্রূষাকারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি তেমনই শান্ত ভাবে মরিয়াছে ?"

"হাঁ।"

"কোন কথা কহে নাই?"

"মরিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে কেবল অন্যমনস্ক ভাবে কয়বার ক্ষীণস্বরে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিল। আর কিছু বলে নাই।"

"দয়াময় ভগবান তাহাকে ক্ষমা করিবেন।"

শুশ্রূষাকারী সবিস্ময়ে দেখিল, ডাক্তারের আঁখির পাতা ভিজিয়া আসিয়াছে!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রমেশচন্দ্র।

রমেশচন্দ্রের মাতার শ্রাদ্ধের সময় আগত হইল। রমেশচন্দ্র ভাবিলেন—এই আমার শেষ কায, আমি স্বগ্রামে যাইয়া শ্রাদ্ধ করিব। তিনি যোগেন্দ্রনাথকে বলিলেন, "দেশের সহিত সম্বন্ধ প্রায় ঘুচিয়া উঠিয়াছে। এবার দেশে যাইয়া কায করিব।" সুরেন্দ্রনাথের পীড়ার জন্য যোগেন্দ্রনাথ বা শৈল কাহারও গমন সম্ভব হইল না। রমেশচন্দ্র দেশে যাইয়া জননীর শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া আসিলেন।

কলিকাতায় ফিরিয়া রমেশচন্দ্র আবার যোগেন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। যোগেন্দ্রনাথের বোধ হইল, তাঁহার মুখ হইতে চিন্তার নিবিড় ছায়া যেন কিঞ্চিৎ অপসৃত। তিনি ভাবিলেন, শোকের প্রথম প্রবল উচ্ছ্বাস অপগত। প্রকৃত পক্ষে তাহা কৃত-সঙ্কল্পের চাঞ্চল্যাপগমন। যোগেন্দ্রনাথ একদিন রমেশচন্দ্রের নিকট তাঁহার পত্নীকে আনাইবার প্রস্তাব করিলেন। রমেশচন্দ্রের মুখে বিষম যন্ত্রণার চিহ্ন লক্ষিত হইল। তিনি বলিলেন, "না তাহা হইবে না। পরে সব বলিব।"

এদিকে সুরেন্দ্রনাথ ক্রমেই রোগমুক্ত হইতে লাগিলেন। রমেশচন্দ্র বলিলেন, "আর পাঁচ সাত দিনের মধ্যেই সুস্থ হইবেন।"

প্রেমের জয়।

একদিন প্রভাতে রমেশচন্দ্রের দ্বারবান আসিয়া যোগেন্দ্রনাথকে একখানি পত্র দিল। পত্র—সুদীর্ঘ, রমেশচন্দ্রের লিখা। পত্রখানি পাঠ করিয়া যোগেন্দ্রনাথের মস্তক ঘুরিতে লাগিল। তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। কুমুদিনী নিকটে ছিলেন। অমঙ্গল-আশঙ্কায় তাঁহার হৃদয় কম্পিত হইল। তিনি ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ঠাকুরপো, কাহার পত্র ?"

ভগ্নকণ্ঠে যোগেন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন, "রমেশের। সে দেশত্যাগী হইয়াছে।"

কুমুদিনী বিস্ময়-বিস্ফারিতনয়নে বলিলেন, "দেশত্যাগী !"

চিন্তামগ্ন যোগেন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন না। অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়া তিনি রমেশচন্দ্রের সেই সুদীর্ঘ পত্র পুনরায় আগ্যন্ত পাঠ করিলেন। বহুবার সেই পরিচিত হস্তাক্ষরের উপর তাঁহার অশ্রু পতিত হইল।

সেই পত্রে রমেশচন্দ্রের জীবনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ। যে কথা উত্থাপিত হইলে তিনি বন্ধুকে বলিতেন, "আজ থাক। পরে বলিব।"—এই পত্রে তিনি সেই কথা লিখিয়াছেন ; জীবনে তিনি যে তুষানলে দগ্ধ হইয়াছেন, তাহার কথা অকৃত্রিম সুহৃদকে জানাইয়াছেন।

রমেশচন্দ্র লিখিয়াছেন, "জানি না জন্মান্তরের কোন্ অভিশাপ এজন্মে পত্নীরূপে আমার অনুসরণ করিয়াছে। তাই আমার জীবন বিষময়।" যৌবনের অতৃপ্ত আশা বহিয়া তিনি পত্নীর

নিকট কি চাহিয়া, কি আশায় হতাশ হইয়াছেন। যৌবনের শত আশা পত্নী নিষ্ঠুর পদপীড়নে নিষ্পেষিত করিয়াছেন। "আমিও যুবক, আমিও সংসারী। আমি যৌবন-ধর্ম্ম ভুলিতে পারি নাই; প্রেমপিপাসা বিষবৎ পরিত্যাগ করিতে শিখি নাই। আমি কি সাধ করিয়া বিষাদ বরণ করিয়াছিলাম? শত আশা ও বাসনা-মুকুলিত হৃদয়ে আমি আমার পত্নীর নিকটে গিয়াছি, তাঁহার অনলশ্বাসে আমার যৌবন-বসন্ত বিশুষ্ককুসুমশ্রী—বিগত-বিহগ-বিরাব হইয়াছে। আমি সুধার অন্বেষণে গরল পাইয়াছি; সহানুভূতি চাহিয়া তীব্র উপহাসমাত্র লাভ করিয়াছি।" সে জীবনের সহস্র যাতনার কথা পত্রের ছত্রে ছত্রে যেন হৃদয়-শোণিতে লিখিত। "যুবক আমি প্রতিবারই পত্নীর অপরাধ ক্ষমা করিয়াছি; প্রতিবারই আশা করিয়াছি, তাঁহার ভ্রম অচিরে দূর হইবে। জীবনের বিকাশকালে—সংসারের সহিত নূতন পরিচয়ে কে আশা না করিয়া থাকিতে পারে? কে মনে করিতে পারে, তাহার ভাগ্যে সংসার-সমুদ্র-মন্থনে কালকূট ব্যতীত আর কিছুই উঠিবে না?" সে পত্র রমেশচন্দ্রের জীবনের জীবন্ত যাতনার ইতিহাস। "আমার যৌবন-লালসাময় অতৃপ্ত অধরের তপ্ত চুম্বন যেন প্রাণহীন পাষাণ-মূর্ত্তির শীতল অধর স্পর্শ করিত। তাঁহার বিশ্বাস, যেন তিনি ও আমি ভিন্ন-জগৎবাসী; তাঁহার জগৎ বহু উচ্চে—আমার জগৎ বহু নিম্নে; তিনি স্বর্গে—আমি নরকে। তিনি যেন পতিতের উদ্ধারকল্পে সহস্র কষ্ট স্বীকার

করিতেছেন—আমার জন্য সুখের জীবন দুঃখময় করিয়াছেন—হাসির স্থানে অশ্রু বরণ করিয়াছেন—সিংহাসন ত্যাগ করিয়া কণ্টক-মুকুট পরিধান করিয়াছেন। তাই তাঁহার মুখে প্রফুল্ল ভাব ছিল না। যে গৃহিণী, সচিব, সখী, শিষ্যা হইবে, আশা করা যায়, সে এরূপ মনে করিলে কি কষ্ট হয়, তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত কেহ বুঝিতে পারে না। সেই জন্যই আমি একথা কাহাকেও বলি নাই; কেবল আপনি তুষানলে দগ্ধ হইয়াছি;—তোমাকেও বলি নাই। কেবল একজন আমার দুঃখের কথা জানিতেন; জানিয়া বুঝি আমার অপেক্ষাও অধিক কষ্ট পাইয়াছেন। আমার সেই চিরস্নেহময়ী জননী আজ স্বর্গে।”

রমেশচন্দ্র লিখিয়াছেন, “ক্রমাগত আশায় হতাশ হইলে জীবন দুর্ব্বহ হয়; ক্রমে ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রান্ত হইয়া যায়। কাযেই ক্রমে কথায় কথায় অসন্তোষ প্রকাশ পাইত। ফলে আমিই কষ্ট পাইতাম। তিনি কাঁদিতেন, আর বৃষ্টি-বারি-স্নাতা প্রকৃতির মত অপগততাপ—স্নিগ্ধ হইতেন। আমার হৃদয়ের দুর্ব্বিষহ যাতনা বাহির হইবার পথ পাইত না, কেবল আমাকেই ক্লেশ দিত।” এমনই করিয়াও অনেক দিন কাটিয়াছিল। জননীর গুণে উভয়ের মধ্যে কোন প্রকাশ্য বিবাদ ঘটে নাই। কিন্তু আসন্ন ঝটিকার বেগ কি রুদ্ধ করা যায়? একদিন আর সহিল না। “আমি সব সহিয়াছিলাম; কিন্তু আর পারিলাম না। এই সংসার-মরুতে যিনি আমার পক্ষে সদাবাহিত অমৃত

প্রস্রবণ, যে প্রস্রবণের অমৃত ধারায় আমি জীবিত ছিলাম, সেই জননীর কথায় তুচ্ছভাব প্রকাশে আমার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। সে দিন আমি মা'র আজ্ঞাও মানিলাম না—তাঁহাকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলাম। তাহার পর মা মৃত্যুশয্যায় একাধিকবার তাঁহাকে আনিতে পাঠাইয়াছিলেন। প্রতিবারই তিনি অপমানিতা হইয়াছেন। সে অপমান যেন এখনও দীপ্ত অঙ্গারের মত আমার হৃদয় দগ্ধ করিতেছে।"

জননীর জীবনের সঙ্গে সঙ্গে রমেশচন্দ্রের সংসারে আকর্ষণ গিয়াছে। "যত দিন মা ছিলেন, তত দিন সংসারে আমার সব ছিল। আজ তিনি নাই। তিনি বংশের নিন্দাকে বড় ভয় করিতেন। আমি আর এখানে থাকিয়া সে নিন্দা শুনিব না, শুনাইব না। আমি চলিলাম। বড় ইচ্ছা ছিল, যাইবার সময় তোমাকে ও শৈলকে দেখিয়া যাইব। কিন্তু তাহা হইল না। তোমরা জানিতে পারিলে আমার যাওয়া হইবে না। তুমি দাদাকে লইয়া ব্যস্ত না থাকিলে, আমার যাওয়া ঘটিয়া উঠিত না। আমার শেষ অনুরোধ, আমার সন্ধান করিও না। যদি উভয়ে বাঁচিয়া থাকি, হয় ত কখন সাক্ষাৎ হইবে; কিন্তু সেজন্য কোনরূপ চেষ্টা করিও না।"

ইহার পর সম্পত্তি প্রভৃতির ব্যবস্থা। "ভৃত্যবর্গকে আমি অর্থ দিয়াছি, তাহাদিগকে বিদায় দিও। বুড়াঝি আমাকে মানুষ করিয়াছিল। এই বৃদ্ধ বয়সে সে আর কোথায় যাইবে? কয়-

দিন বুঝাইয়া তাহাকে কাশীবাসে সম্মতা করিয়াছি। তাহাকে গত রাত্রে কাশী পাঠাইয়াছি। সেখানে যাহাতে জীবনের অবশিষ্ট কয়দিন তাহার অর্থকষ্ট না হয়, তাহারও ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছি। প্রথমে মনে করিয়াছিলাম, গৃহখানি বিক্রয় করিব। কিন্তু তাহা ভাবিতে বড় কষ্ট হইল। আমার পুত্র নাই, তোমার পুত্রদের কেহ যদি আমার গৃহে আসিয়া বাস করে; আমার শূন্য গৃহ তাহার সন্তানদিগের কলহাস্যমুখরিত হয়—সে কথা ভাবিতেও আমার হৃদয় আনন্দে চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে। যে আমার গৃহে বাস করিবে, সে যেন চিকিৎসাব্যবসায়ী হইয়া দরিদ্রের বন্ধু হয়। চিকিৎসকের অভাব নাই। কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে কয়জন দরিদ্রের বন্ধু? কয়জনের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা দরিদ্রের উপকারার্থ অর্পিত? গৃহ আমি তোমাকে দিলাম। আমার পত্নীর জন্য মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া তদুপযুক্ত অর্থ ব্যাঙ্কে দিয়াছি। কাগজপত্র সমস্তই আমার বাক্সে পাইবে। চাবি এই পত্র-মধ্যে। আমার স্ত্রীর দ্রব্যাদি সমস্তই তাঁহাকে পাঠাইয়া দিয়াছি; কণামাত্র আমার গৃহে নাই। লৌহ সিন্দুকে মার অলঙ্কারগুলি আছে। সেগুলি আমি বহু যত্নে রক্ষা করিয়াছি। সেগুলি শৈলকে দিও। শৈল ব্যতীত আর কাহাকেও দিও না। অবশিষ্ট দ্রব্যাদির বিষয় সমস্ত দানপত্রে পাইবে। সব তোমার। তুমি যদি আমার অভিপ্রায়মত দ্রব্যাদি না লও, তবে আমি বড় ব্যথা পাইব। আশা করি লইতে অন্যমত করিবে না।"

দ্রব্যাদির ব্যবস্থার পর রমেশচন্দ্র লিখিয়াছেন, "তুমি আমার ভ্রাতার অধিক। আমার শেষ অনুরোধ রাখিও—আমার সন্ধান করিও না। শৈলকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইও। বিদায়।"

পত্র পাঠ করিয়া যোগেন্দ্রনাথ রমেশচন্দ্রের গৃহে গমন করিলেন; বিশেষ অনুসন্ধানেও রমেশচন্দ্র কোথায় গিয়াছেন, তাহার কোন সন্ধান পাইলেন না। অগত্যা সাশ্রুলোচনে সে চেষ্টা ত্যাগ করিতে হইল।

যোগেন্দ্রনাথ বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, তিনি না লইলে রমেশচন্দ্রের সম্পত্তির অপব্যয় অনিবার্য্য। তিনি রমেশচন্দ্রের শ্বশুরালয়-সম্পর্কীয়দিগের কথা জানিতেন; বরং তিনি লইয়া সম্পত্তির সদ্ব্যবহার করিতে পারিবেন। দরিদ্রের দুঃখমোচনে, রোগকাতরের চিকিৎসার ব্যবস্থায় অনাথের অশ্রু মুছাইতে অর্থ ব্যয়িত হইতে পারিবে। তিনি রমেশচন্দ্রের দানপত্রের নির্দ্দেশানুসারে সম্পত্তি লইলেন।

যোগেন্দ্রনাথ সেই দিনই রমেশচন্দ্রের শ্বশুরমহাশয়কে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। অপরাহ্ণে যোগেন্দ্রনাথের গৃহদ্বারে তাঁহার গাড়ী দাঁড়াইল। যোগেন্দ্রনাথ তখন জ্যেষ্ঠের নিকট ছিলেন। ভৃত্য যাইয়া সংবাদ দিলে তিনি আসিলেন; আসিয়া দেখিলেন, আগন্তুক প্রকৃতিস্থ নহেন,—তখনও নেশার ঘোর রহিয়াছে। যোগেন্দ্রনাথ তাঁহাকে রমেশচন্দ্রের দেশত্যাগের কথা জানাইলেন।

শুনিয়া আগন্তুক রমেশচন্দ্রকে যে সকল কটূক্তি করিলেন, তাহা সদ্য সুহৃদ্‌বিরহকাতর যোগেন্দ্রনাথের কাছে ভাল লাগিল না। তিনি বলিলেন, "সে আলোচনায় আর ফল কি? সে আমার বন্ধু, তাহার নিন্দা আমার পক্ষে কষ্টকর।

তাহার পর যোগেন্দ্রনাথ রমেশচন্দ্রের পত্নীর মাসহারার কথা বলিলেন। শুনিয়া আগন্তুক রক্তচক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, "সে—কি? আমার কন্যাই সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী।"

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "রমেশ অন্যরূপ ব্যবস্থা না করিলে তাহাই হইত, কিন্তু রমেশ অন্যবিধ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।" তিনি রমেশচন্দ্রের শ্বশুর মহাশয়কে দানপত্রের সর্ত্তাদির কথা বলিলেন।

আগন্তুক বলিলেন, "এসব কোন কাযের কথা নহে। আমি তাহা শুনিব না।"

যোগেন্দ্রনাথ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তিনি ইচ্ছা করিলে নির্দ্দিষ্ট মাসহারা লইতে পারেন। তদ্ভিন্ন গত্যন্তর নাই।"

যেন বারুদের স্তূপে অগ্নিকণার স্পর্শ হইল; আগন্তুক একান্ত ক্রোধভরে বলিলেন, "এসব জুয়াচুরী আমি বুঝি। ভালয় ভালয় সব দাও—ভাল। নহিলে আমি আদালত করিব। ওসব চালাকি আমার কাছে খাটিবে না।"

যোগেন্দ্রনাথ কক্ষের দ্বারের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "সেই ভাল। আদালতের দ্বার মুক্ত; আপাততঃ

আমাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবার পূর্ব্বে আপনি অনুগ্রহ করিয়া গৃহে গমন করুন। আদালতে যাহা হয়—তাহাই হইবে।”

আগন্তুক ক্রোধভরে কটূক্তি করিতে করিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া প্রস্থান করিলেন। যোগেন্দ্রনাথ কিছুক্ষণ একান্ত বিস্মিত হইয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। শেষে আপনা আপনি বলিলেন: “এই পিতৃআদর্শে গঠিতা দুহিতাকে লইয়া রমেশ বড় কষ্টই পাইয়াছে।” গৃহত্যাগী সুহৃদের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার চক্ষের পাতা ভিজিয়া আসিল।

রমেশচন্দ্রের গৃহত্যাগের কথা শুনিয়া শৈল বড় কাঁদিল। রমেশচন্দ্র তাহার সহোদর নহেন, কিন্তু সোদরাধিক। বিবাহের পর নূতন জীবনে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে রমণীর পিতৃগৃহের সহিত ঘনিষ্ঠতার হ্রাস হইতে থাকে। কিন্তু নূতন জীবনে রমেশচন্দ্রের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতা বর্দ্ধিতই হইয়াছিল। স্বামীর সুহৃদ্ সেজদাদার জন্য সে একদিনও মনে করিতে পারে নাই যে, শ্বশুরালয়ে আসিয়া পিতৃগৃহের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতার হ্রাস হইয়াছে। আজ তাহার বোধ হইল, যেন এত দিনে সত্যই পিতৃগৃহের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতার শেষ হইল।

সুরেন্দ্রনাথ রমেশচন্দ্রের দেশত্যাগের কথা ও কারণ শুনিলেন, দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, “জগতে মানব কি ভ্রান্ত! কেহ দেবীতুল্যা পত্নী পাইয়া তাহার আদর করিতে জানে না, কেহ দেবোপম পতি পাইয়া চিনিতে পারে না। এই ভ্রান্তিই জগতে

অনেক কষ্টের মূল।” অনুতাপ-দীর্ণ-হৃদয় সুরেন্দ্রনাথের মনে সর্ব্বদাই আত্মদোষের কথা জাগিতেছিল।

* * * * *

সেইদিন সুরেন্দ্রনাথ প্রথম নলিনীর সংবাদ শুনিলেন। তাঁহার দুই চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া আসিল। কুমুদিনী কাঁদিয়া বলিলেন, “আমারই দোষে সে সর্ব্বত্যাগী হইল। দোষ আমার।”

সুরেন্দ্রনাথ বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, “আমার পাপের জন্য সে প্রায়শ্চিত্ত করিল। সে আত্মদান করিয়াছে।”

পতিপত্নীর একের অশ্রুতে অপরের অশ্রু মিশিল।

উপসংহার

বানের পর।

উপসংহার।

কালস্রোতে।

যথেষ্ট অনুসন্ধানেও নলিনীর সন্ধান মিলিল না। যোগেন্দ্রনাথ বুঝিলেন, সন্ধান মিলিবার সম্ভাবনা অল্প। কুমুদিনীর তখনও মনে হইত, একদিন নলিনীকে পাওয়া যাইবে। অভাগিনী যে ইহলোকের সর্ব্ব-যন্ত্রণামুক্ত হইয়া সর্ব্ব-প্রলোভন-শূন্য পরলোকে গিয়াছে, সে সম্ভাবনার কথা তাঁহার স্নেহশীল হৃদয়ে স্থান পাইত না। তাঁহার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে যোগেন্দ্রনাথ বহু বার বহু স্থানে তাহার সন্ধান করাইয়াছেন—অন্বেষণ নিষ্ফল হইয়াছে।

দেখিতে দেখিতে দশ বৎসর কাটিয়া গেল। শৈলবালা বয়সের যৌবন সীমা অতিক্রম করিয়াও কখনও প্রৌঢ়াসুলভ গাম্ভীর্য্যগর্ব্বমণ্ডিতা হইতে পারিল না। সে অনেকবার "গিন্নি-বান্নি" হইবার জন্য কৃতসঙ্কল্পা হইয়াছে; কিন্তু প্রতিবারই যোগেন্দ্র-নাথের সামান্য বিদ্রূপে—সস্নেহ করস্পর্শে তাহার কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য ভাসিয়া গিয়াছে; গম্ভীর মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে যখন দেখিল যে, সে গম্ভীর হইতে চেষ্টা করে, কিন্তু যোগেন্দ্রনাথ গম্ভীর হইলে তাহার নয়নে জল আইসে; সে যৌবনসুলভ চাপল্যের পরিহার করিবে মনে করে, কিন্তু যোগেন্দ্রনাথের আদর-সোহাগের স্রোতে ভাঁটা পড়িলে হৃদয় ব্যথিত হয়, তখন সে আপনা-

আপনি বলিল, "দূর হউক ছাই, ও আমাকে সাজে না। যাহা আমার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ, তাহা আমি করিব কেমন করিয়া?" যোগেন্দ্রনাথের প্রগাঢ় প্রেম তাহার হৃদয়নন্দনে যৌবনবসন্তশ্রী মলিন হইতে দিত না। হৃদয়ের যৌবন বয়সের সঙ্গে যায় না।

রমেশচন্দ্রের গৃহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে যোগেন্দ্রনাথের সহিত বাহিরের জগতের সম্পর্ক একান্তই সামান্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আপনার স্ত্রী, পুত্র, পুস্তকাদি লইয়া তিনি সময় কাটাইতেন। সংসারের শৃঙ্খলার জন্য তাঁহাকে চেষ্টা করিতে হইত না। বিশেষ কুমুদিনীর জন্য সন্তানদের ভাবনা—তাঁহাকে দূরে থাকুক—শৈলকেও ভাবিতে হইত না।

এই দশ বৎসরে শৈলবালার আর একটি পুত্র ও দুইটি কন্যা হইয়াছে। কিন্তু সন্তানদিগের ভার পূর্ব্বেও যেমন এখনও তেমনই কুমুদিনীর। সে ভাবনা শৈলবালার নহে। সন্তানগণ মা'র অপেক্ষা জ্যেঠাইমার অধিক বাধ্য; মা'র অপেক্ষা জ্যেঠাইমার কাছে ভাল থাকে। তাহাদের আদর আব্‌দার তাঁহারই কাছে। আবার তাহাদের আব্‌দারের অত্যাচার নহিলে যেন কুমুদিনী থাকিতে পারেন না। তিনি আবার পূর্ব্বের মত দেবরের সন্তান-দিগকে লইয়া সর্ব্বদাই ব্যস্ত। কেবল মধ্যে মধ্যে নিরুদ্দিষ্টা ভগিনীর কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার বেপমান হৃদয় হইতে দীর্ঘশ্বাস উত্থিত হয়।

যোগেন্দ্রনাথের সন্তানদিগের পালনে আর একজন এখন

কুমুদিনীর সহকর্ম্মী হইয়াছেন। সুরেন্দ্রনাথ আফিসের চাকরী ত্যাগ করিয়াছেন। মোহিনীমোহন ও তাহার কনিষ্ঠ এখন তাঁহারই কাছে বিদ্যাশিক্ষা করে। যোগেন্দ্রনাথের অন্য সন্তানগুলি তাঁহার সহিত খেলা করে। প্রভাতে ও সন্ধ্যায় তাহারা জোঠামহাশয়ের সহিত বেড়াইতে যায়। গৃহে তিনি তাহাদের খেলার সাথী। হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইতে শিশুর মত সহচর আর নাই। তাহাদের নিষ্পাপতা পাপীর হৃদয়েও শান্তিদান করে। তাহাদের সহিত সময় যাপন করিয়া সুরেন্দ্রনাথ স্বর্গসুখ লাভ করেন। পত্নীর প্রেম, ভ্রাতার ভক্তি, এই সকল বালকবালিকার ভালবাসায় সুরেন্দ্রনাথের অনুতাপতুষানলদগ্ধ হৃদয় যেন শান্তিসলিলসেচনস্নিগ্ধ হইতেছে। হয়ত কালবশে তাঁহার একান্ত কাতর হৃদয় নিবৃত্তি লাভ করিতে পারিবে—তিনি শান্তি পাইবেন।

* * * * * * * *

যোগেন্দ্রনাথ দেশভ্রমণ করিয়া গৃহে ফিরিতেছেন। যাইবার সময় কুমুদিনী বলিয়া দিয়াছিলেন, "ঠাকুরপো, পথে অনেক তীর্থস্থান পড়িবে। শুনিয়াছি, অনেকে মনোবেদনায় সংসার ত্যাগ করিয়া তীর্থস্থানে দেবসেবায় জীবনযাপন করে। দেখিও, যদি কোথাও নলিনীকে দেখিতে পাও।" তখনও তাঁহার হৃদয় সেই নিরুদ্দিষ্টা ভগিনীর জন্য ব্যাকুল!

শীতকালে নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া—হিমালয়ের অঙ্কে বসন্ত যাপনান্তে বর্ষার পূর্ব্বে যোগেন্দ্রনাথ গৃহে ফিরিতেছেন। পথে

দ্রষ্টব্য-দর্শন-বাসনায় তিনি একটি সহরে নামিয়াছেন। অপরাহ্ণে সহর দেখিয়া ফিরিতে বিলম্ব হইল। প্রত্যাবর্ত্তন-পথে তিনি দেখিলেন, একটি দরিদ্রের কুটীর হইতে বাহির হইয়া এক ব্যক্তি গাড়ীতে উঠিলেন। দশ বৎসরে মানুষের কত পরিবর্ত্তন হয়! কিন্তু যোগেন্দ্রনাথ তাঁহাকে চিনিলেন; চিনিয়া কুটীর-স্বামীর নিকট তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। দরিদ্র বলিল, "ডাক্তার বাবু দয়াময়। তিনি দীন দুঃখীর মা বাপ। ধনীর অর্থ ত্যাগ করিয়া তিনি বিনামূল্যে দরিদ্রের চিকিৎসা করেন। এই তীর্থে বহু রোগী রোগ-মুক্তির আশায় আসিয়া থাকেন। শীতের হিমে, বর্ষার ধারায়, নিদাঘের খররবিকরে তাহাদের কষ্টের সীমা থাকে না। ডাক্তার বাবু নিজব্যয়ে দরিদ্র রোগীর জন্য একটি চিকিৎসালয় সংস্থাপিত করিয়াছেন। ভগবান্ ডাক্তার বাবুর মঙ্গল করুন।" যোগেন্দ্রনাথ মনে মনে বলিলেন, "রমেশ তুমিই ধন্য।"

যোগেন্দ্রনাথ কোচম্যান্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি ঐ ডাক্তার বাবুর বাড়ী চিন?"

সে উত্তর করিল,—"ডাক্তার বাবুর বাড়ী এ সহরে অন্ধও চিনে।"

যোগেন্দ্রনাথ রমেশচন্দ্রের গৃহে উপস্থিত হইলেন। তখন সন্ধ্যা হয় হয়। তখনও রমেশচন্দ্র রোগী দেখিয়া ফিরেন নাই। যোগেন্দ্রনাথ অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার পর রমেশচন্দ্র

ফিরিলেন। তিনি বারান্দায় উঠিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। যোগেন্দ্রনাথ বারান্দার একপার্শ্বে বসিয়া ছিলেন; রমেশচন্দ্র তাঁহাকে দেখিতে পায়েন নাই। ভৃত্য যাইয়া সংবাদ দিলে রমেশচন্দ্র বারান্দায় ফিরিয়া আসিলেন। সুদীর্ঘ দশ বৎসর পরে সুহৃদ্‌কে দেখিয়া রমেশচন্দ্রের নয়ন প্রথমে বিস্ময়বিস্ফারিত হইল; মুহূর্ত্ত মধ্যে অপগতবিস্ময়দৃষ্টি নয়ন হর্ষদীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি বন্ধুকে আলিঙ্গনবদ্ধ করিলেন।

রমেশচন্দ্র যোগেন্দ্রনাথকে লইয়া তাঁহার বাসায় উপস্থিত হইলেন ও তাঁহার দ্রব্যাদি আপনার গৃহে আনিলেন। দুইবন্ধু একত্র আহার করিলেন। রমেশচন্দ্রের ভাগ্যে এমন সুখলাভ দশ বৎসর ঘটে নাই।

রমেশচন্দ্র বন্ধুকে স্বীয় গৃহ দেখাইলেন। গৃহ সুন্দর ও সুসজ্জিত, উদ্যান সুরক্ষিত। কিন্তু যে গৃহে রমণীর নিপুণ হস্তের স্পর্শ অনুভূত না হয়, সে গৃহে সৌন্দর্য্য থাকিতে পারে, লাবণ্যশ্রী থাকে না; যে গৃহে বালকণ্ঠধ্বনি ধ্বনিত না হয়, সে গৃহে আনন্দ থাকিতে পারে, সুখ থাকে না। সে গৃহ অন্ধ সুন্দরীর সহিত উপমেয়। যোগেন্দ্রনাথ সে কথা বলিলেন। রমেশচন্দ্র কেবল ম্লান হাসি হাসিলেন।

দুই বন্ধু আসিয়া বারান্দায় বসিলেন। তখন জ্যোৎস্নালোকে গৃহ-প্রাঙ্গণে সযত্ন-সজ্জিত উদ্যান প্রফুল্ল; গৃহ কুসুমবাসামোদিত। উদ্যান-সীমায় শ্রেণীবদ্ধ যূথীর গাছ শুভ্র কুসুমহাস্যময়—তাহার

মধুর সৌরভ পবনে ভাসিয়া আসিয়া যেন মায়ালোকের আভাষ জানাইতেছে। দুই বন্ধুতে কত কথা হইতে লাগিল। এত দিন পরে সাক্ষাৎ—কথা কি ফুরায়?

রমেশচন্দ্র সকলের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, কেবল একজনের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন না। সসঙ্কোচে যোগেন্দ্রনাথ তাঁহার পত্নীর কথা তুলিলেন। রমেশচন্দ্র বলিলেন, "ভাই, ও প্রসঙ্গে কায নাই। একবার তোমাদের সকলকে ছাড়িয়া এখানে আসিয়াছি। আবার পীড়াপীড়ি করিলে এস্থান হইতে দোকান পাট গুটাইয়া প্রস্থান করিব। সহজে আমার সন্ধান পাইবে না।

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কিন্তু তাহাকে ভুলিতে পারিয়াছ কি?"

দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া রমেশচন্দ্র বলিলেন "না।"

যোগেন্দ্রনাথেরও বিশেষ কিছু বলিবার ছিল না। রমেশ-চন্দ্রের পত্নীর যে পরিবর্ত্তন হয় নাই, এমন নহে; কিন্তু সে কথা কেহ জানিতে পারে নাই। রমেশচন্দ্রের দেশত্যাগে প্রথমে সে আপনাকে একান্ত অপমানিতা ও অত্যাচার-পীড়িতা মনে করিয়াছিল এবং সেই ক্রোধে পিতার পরামর্শে যোগেন্দ্রনাথের নামে নালিশ করিতেও উদ্যত হইয়াছিল। তখন সে মনে করিয়াছিল, রমেশচন্দ্র আসিয়া পদে ধরিয়া সাধিলেও সে আর তাঁহার কাছে যাইবে না। বৎসরের পর বৎসর কাটিতে লাগিল, পতির পদে ধরিয়া সাধিবার কোন সম্ভাবনাই দেখা গেল

না—তাঁহার সংবাদও পাওয়া গেল না। তখন কালের ঔষধে তাহার ক্রোধ মন্দীভূত হইল; সে মনে করিল, স্বামী যাইতে অনুরোধ করিলে সে যাইতে পারে। কিন্তু স্বামীর সে অনুরোধ করিতে আসিবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। তখন তাহার মনে হইতে লাগিল, সে আপনার কর্ম্মদোষেই নারীজন্মের সকল সুখ হইতে বঞ্চিতা হইয়াছে। নারীজন্মের সহস্র অলব্ধসুখলাভবাসনার আঘাতে তাহার প্রবল ভ্রান্তির কমঠকঠোর আবরণ ভগ্ন হইয়া গেল। কালের মত শিক্ষক আর নাই। কিন্তু তখন আর উপায় কি? গর্ব্বিতা মনে করিল, যখন নত হইয়া ফল নাই—তখন নত হইব কেন? যখন কাঁদিয়া বাঞ্ছিতলাভ ঘটিবে না, তখন বৃথা অশ্রুজলে আপনার দারিদ্র্য ঘোষণা করিবার প্রয়োজন কি? বৃথা আপনার বেদনা জানাইয়া কাহারও সহানুভূতি—কাহারও উপহাস লাভ করা অপমান। সে আপনার অভিমানের আশ্রয় ত্যাগ করিল না; তাহারই কেন্দ্রস্থলে বসিয়া আপনি হৃদয়ের বেদনার দংশন সহ্য করিতে লাগিল। তাহার হৃদয়ের কথা হৃদয়েই নিবদ্ধ রহিল—প্রকাশ পাইল না। যোগেন্দ্রনাথ মাসহারা পাঠাইলে উত্তর আসিল, "দয়া-দত্ত ভিক্ষায় আমার কায নাই।"

নলিনী ফিরিয়া আসিবে, স্নেহশীলা কুমুদিনী এখনও তাহা আশা করেন, শুনিয়া রমেশচন্দ্র বলিলেন, "বৌদিদির শত গুণ যে মানুষে সম্ভব, ইহা আমি তাঁহাকে না দেখিলে বিশ্বাস করিতে পারিতাম না—তিনি দেবী।"

দুই দিন বন্ধুগৃহে থাকিয়া যোগেন্দ্রনাথ গৃহে ফিরিলেন। আসিবার সময় রমেশচন্দ্র বলিয়া দিলেন, "শীঘ্রই শৈলকে ও ছেলেদের লইয়া আসিও। দশ বৎসর তাহাদের দেখি নাই। দাদাকে ও বৌদিদিকেও আনিতে চাহ। বৌদিদিকে বলিও, আমি জিদ করিতেছি,—তাঁহাকে আসিতেই হইবে। তাঁহাকে আমার প্রণাম জানাইও। তাঁহার স্নেহ জীবনে ভুলিতে পারিব না।"

*   *   *   *   *

রমেশচন্দ্রের সংবাদ পাইয়া কুমুদিনী ও শৈল উভয়েরই চক্ষু আনন্দাশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল।

তখন হইতে সুরেন্দ্রনাথ ও যোগেন্দ্রনাথ প্রতিবৎসর সপরিবারে রমেশচন্দ্রের নিকট যাইয়া কিছু দিন কাটাইতেন। সে সময় সকলেরই সুখে কাটিত। আর সেই কয়দিন রমেশচন্দ্রের গৃহ বাল-কণ্ঠ-কাকলীপূর্ণ হইয়া উঠিত। তাঁহাদিগকে ট্রেণে তুলিয়া গৃহে ফিরিবার সময় রমেশচন্দ্র হৃদয়ে শূন্যভাব অনুভব করিতেন; ভাবিতেন, তাঁহার জীবন একান্ত নিষ্ফল।

তৃতীয় বৎসর আসিবার সময় কুমুদিনী আর একজনকে সঙ্গে আনিলেন। কুমুদিনী কাহাকেও অসুখী দেখিলে আপনি ব্যথিতা হইতেন। তাঁহার দুই বৎসরব্যাপিনী চেষ্টার ফলে রমেশচন্দ্রের পত্নী পতির পদপ্রান্তে ক্ষমা চাহিতে আসিয়াছে। তাঁহার স্নেহ-সেচনে যখন তাহার কঠিন অভিমানের আবরণ কোমল হইয়া গেল, তখন অনুতাপদীর্ণ—পতিপ্রেম-পিপাসিত

নারী হৃদয় আত্মপ্রকাশ করিল। তাই আজ অপগত-গর্ব্ব পত্নী পতির কাছে আত্ম-দোষ স্বীকার করিয়া ক্ষমা চাহিতে আসিয়াছে। একদিন সে স্বেচ্ছায় যে অধিকারে পদাঘাত করিয়া গিয়াছিল, আজ সেই অধিকার ভিক্ষা চাহিতে আসিয়াছে। আজ তাহার হৃদয় ঔদ্ধত্য-বর্জ্জিত—নত। তাই একদিন সে যে স্বেচ্ছাপ্রদত্ত প্রেমের দারুণ অপমান করিয়া গর্ব্ব অনুভব করিত, আজ সেই প্রেমের কণামাত্র-প্রত্যাশিনী হইয়া আসিয়াছে। আজ সে অশ্রুবিপ্লুতা—অনুতাপ-জর্জ্জরিতা—কোমলা। কুমুদিনী অসাধ্য সাধন করিয়াছেন।

একদিন রমেশচন্দ্র বলিয়াছিলেন, কুমুদিনীর প্রেমের জয় হইবে। তাঁহার ভবিষ্যৎবাণী সফল হইয়াছে। আজ রমেশচন্দ্রের প্রেমের জয় হইল।

সম্পূর্ণ

উপক্রমণিকা।

নদীপথে।

"মা, ঔষধটুকু খাও।

"মা!"

"তুই রাখ। আমি ও ছাইপাঁশ আর খাইব না।"

"এইটুকু খাও।"

"তুই ও ছাই ফেলিয়া দে। আমার আর ঔষধ খাওয়া কেন!"

"ইচ্ছা করিয়া মরিতে চাহ কেন?"

কথাটা বলিয়া যুবতী আপনিই যেন সঙ্কুচিতা হইলেন। জননী কি উত্তর দিবেন, তাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন।

জননী বলিলেন, "কি সুখে আর এ পোড়া প্রাণ রাখিব? মনুষ্য-জন্মের সব সুখই ত হইল! এখন মা গঙ্গা সব জ্বালা জুড়াইলেই বাঁচি। তোদের দু'টাকে পেটে ধরিয়াছিলাম; তাও আমার পোড়া অদৃষ্টে সব সাধই ত পূর্ণ হইল! আর—"

জননীর কণ্ঠস্বর অশ্রুবাষ্পে জড়িত হইয়া আসিল। তিনি চক্ষু মুছিলেন।

মাতা ও পুত্রীতে এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল। বয়সে

ও রোগে প্রকৃতিদত্ত সম্বন্ধ যেন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে—এখন পুত্রী মাতা হইয়া যেন অবোধ-শিশুর পালনভার লইয়াছেন।

জননীর বয়স পঞ্চাশের উপর। ধ্বংস-সহচর জরা ও দীর্ঘকাল-ব্যাপী রোগ-ক্লেশ এখনও তাঁহার শীর্ণ, পাণ্ডুর আনন হইতে রূপচিহ্ন মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই। কেবল স্বভাবতঃ শান্ত প্রকৃতি দীর্ঘকাল রোগভোগ-ফলে চঞ্চল হইয়াছে। কন্যার বয়স পঁচিশ বৎসর; তিনি বাল-বিধবা। সে দেহে রূপরাশি ভরা জোয়ারের জলরাশির মত কূলে কূলে উচ্ছ্বসিত। অসামান্যরূপভারে তনু দেহ ভ্রমর-ভারে ভগ্নোন্মুখ মঞ্জরীর মত সুন্দর। ললিত-লাবণ্য-সমাবেশে সে রূপরাশি প্রভাত-শিশির-সিক্ত পুষ্পের শোভা ধারণ করিয়াছে। অযত্নরক্ষিত, দীর্ঘ, তরঙ্গিত কেশরাশি স্বভাবসুন্দর। অন্ধকার অম্বরে চন্দ্রের মত, সে কেশরাশি মধ্যে সৌন্দর্য্য-বিভাসিত দেহ সুন্দরতর দেখাইতেছে। যুবতীর বেশ মলিন। সেই মলিন বেশে রূপরাশি নিদাঘ-দিনান্তে পশ্চিম-দিগন্ত-বিলম্বী কৃষ্ণমেঘে বিলয়-ভূয়িষ্ঠ বিজলীর মত উজ্জ্বল প্রতীয়মান হইতেছে।

রোগাতুরা জননীকে লইয়া যুবতী কলিকাতায় জ্যেষ্ঠা ভগিনীর কাছে যাইতেছেন। নৌকা কেবল ছাড়িয়াছে। তখন ১২৮৬ বঙ্গাব্দের প্রবল বন্যার জল আসিয়া গ্রামের

স্বল্পতোয়া নদীতে প্রবেশ করিতেছে। শীর্ণা নদী নিদাঘে প্রচুরপয়ঃপানপুষ্টা সর্পিণীর মত পুষ্টা হইয়া উঠিতেছে। কূলে জলজ গুল্মাদি জলমগ্ন। হরিৎ বস্ত্রের মত বিস্তৃত পানার রাশি স্রোতে পড়িয়া বহুকালের সঞ্চিত-আবর্জ্জনা-মুক্ত নদীতে নবীন শ্রীর আবির্ভাবের অবকাশ দিতেছে। নদীর তীরে ক্ষেত্রে এরণ্ড ও চিতার বেড়ার মূল জলে ঢাকিয়া গিয়াছে। গ্রামের চৈত্যদ্রুম-মূলেও বন্যার জল সফেন আবেগে স্পর্শ দিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে; সঙ্গে সঙ্গে কঠিন মূলরাজির মধ্য হইতে মৃত্তিকা ধৌত করিয়া লইয়া যাইতেছে। সেই দ্রুমের ঘনচিক্কণ-পত্র-বহুল শাখায় বসিয়া এক ঝাঁক শালিক অন্তর্ব্বিদ্রোহের কলরবে চারিদিক্ শব্দিত করিয়া তুলিতেছে।

শরতের রৌদ্রকরোজ্জ্বল অম্বরতলে তরণী যখন সেই বিহগ-বিরুত চৈত্যদ্রুমের নিকটে আসিল, তখন যুবতী একবার পশ্চাতে অদৃশ্যমান গ্রামের দিকে চাহিলেন। যেন তাঁহারও অজ্ঞাতে একটি দীর্ঘশ্বাস বাহির হইল। বিদায়ে মরণের ছায়া আছে;—বিদায় বিষাদময়। তাই বিদায়ে হৃদয় ব্যথিত হয়। মৃত্যু পরিবর্ত্তনের চরম;—বিদায়ে পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী।

নৌকা গ্রাম ছাড়াইল। সেই সময় শরতের একখানি বর্ষণলঘু শ্বেত অভ্র আকাশের নীলিমা সমুদ্রে ভাসিয়া যাইতে

প্রেমের জয়।

মুহূর্ত্তের জন্য রবিকর অপসারিত করিয়া নৌকার উপর আপনার ছায়া দিয়া গেল।

একদিনের পথ যাইয়া মাঝিরা আরোহিণীদিগের সহযাত্রী পুরুষকে বলিল, "বাবু, জলের আমদানী ক্রমেই বাড়িতেছে। এ জল 'ঘোলা' নহে 'কাজলা'; ভয় হয়, বড় বন্যা নামিয়াছে।"

পুরুষ বলিলেন, "তাহা হউক। যখন বাহির হইয়াছি, আর ফিরা নহে। যাইতেই হইবে। এ রোগী লইয়া আর বাড়ী ফিরা কর্ত্তব্য নহে।"

মাঝিরা আর কিছু বলিল না। তাহারা জলকে ভয় করে না। নৌকা মজবুত। পিতা যেমন পুত্রের ক্ষমতা জানেন, তাহার দুর্ব্বলতা, তাহার বল সকল বিষয়েই অভিজ্ঞ—তাহারা তেমনই নৌকার সব জানে। ভয় নাই।

ক্রমে দুই পার্শ্বে কেবল জল; ক্ষেত্র, মাঠ, গ্রাম সবই জলময়। মাঠের উপর, ধান্যক্ষেত্রে, গৃহের প্রাঙ্গণে কল কল করিয়া জলস্রোতঃ বহিতেছে। মাঠের মধ্যে এক একটা গাছ সেই জলরাশির মধ্যে নিঃসঙ্গ প্রবাসে দাঁড়াইয়া আছে। গাছতলা দিয়া নৌকা লইয়া যাওয়া বিপজ্জনক,—রাশি রাশি সর্প জল-প্লাবিত বিবর ত্যাগ করিয়া বৃক্ষে আশ্রয় লইয়াছে; তাহারা নৌকার উপর লাফাইয়া পড়ে। মাঠের উপর যে সকল স্থানে জলরাশি অগভীর, সে সকল স্থানে নিম্নে

তৃণরাজি দৃষ্টিগোচর হইতেছে। যে স্থানে জল অনেকদিন আসিয়াছে, সে স্থানে তৃণরাজি মৃত্তিকায় মিশাইতেছে; অন্যত্র সে হরিৎশয্যা কেবল হরিদ্রাভ হইয়া আসিয়াছে। কোন কোন গ্রাম পরিত্যক্ত; গ্রামবাসীরা ভয়ে অন্যত্র গিয়াছে। যে সকল জলপ্লাবিত গ্রামে গৃহবাসীরা গ্রাম ত্যাগ করে নাই, সে সকল স্থানে তাহারা ঘরের দাওয়ায় আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে, পাছে সিক্ত গৃহ-প্রাচীর পড়িয়া যায়। সেই স্বল্প-পরিসর দাওয়ায় গৃহবাসীরা আসিয়াছে; গাভীগুলিকেও একপার্শ্বে স্থান দিতে হইয়াছে, কয় দিন আর তাহাদের আহার জুটে নাই, তাহারা কোমলদৃষ্টিপূর্ণ নয়নে প্রাঙ্গণে জলস্রোতঃ দেখিতেছে। গৃহপালিত কুক্কুরও আসিয়া সেই দাওয়ায় দাঁড়াইয়াছে, এ বিপদের দিনে তাহাকে তাড়াইতে আর মন সরে না।

ঐ জলস্রোতে একরাশি বিচালী ভাসিয়া যাইতেছে। কয়টি ছাগ ও কুক্কুট তাহার উপর আশ্রয় লইয়াছে। একপার্শ্বে একটি কুক্কুর দাঁড়াইয়া আছে। এই আকস্মিক বিপৎপাতে তাহার নয়নে হিংস্রদৃষ্টি বিলুপ্ত; প্রকৃতি যেন আপনার কার্য্য স্থগিত রাখিয়াছে।

সমস্তদিন নৌকা চলিত। শেষে যখন পশ্চিম দিগন্ত-শ্মশানে সূর্য্যের চিতাগ্নি জ্বলিয়া উঠিত—সেই শ্মশান-বহ্নি-শিখার আলোকে মেঘমালা রঞ্জিত হইয়া উঠিত, তখন

নৌকা স্থির করিতে হইত; তখন শরতের মেঘমুক্ত আকাশে একে একে তারকারাজি ফুটিয়া উঠিত, যেন দেবকন্যারা গগন-প্রাঙ্গণে নন্দনের কুসুম ছড়াইয়া খেলা করিতেছে। চারিদিকে কেবল জলের অবিরাম কলকল নাদ, আর বৃক্ষপত্র মধ্যে পবনের গমনজনিত শব্দ।

নৌকাযাত্রীরা নৌকাতেই রন্ধন করিয়া আহার করিতেন। কেবল যে দিন সমস্ত দিন তরী কোথাও শুষ্ক ভূমিতে না ভিড়িত, সে দিন আর বিধবা যুবতীর রন্ধন হইত না।

এই জল বিস্তারে দিগ্‌ভ্রম একরূপ অবশ্যম্ভাবী। তাই অতি সাবধানে পথে চলিতে হয়, প্রকৃত পথের নির্ণয় অনেক স্থলেই দুঃসাধ্য। তদ্ভিন্ন নদীতে কোথাও জলবেগে ঘূর্ণাবর্ত্ত সৃষ্ট হইয়াছে, কোথাও বৃক্ষাদির পতনে পথ ভয়ঙ্কর হইয়াছে; রাত্রিকালে নৌকা-চালন একেবারেই অসম্ভব।

গ্রাম হইতে ষ্টেসন নদীপথে দুইদিনের পথ। কিন্তু এখন চারিদিন দিবাভাগে নৌকা চালাইয়াও গন্তব্যস্থান প্রাপ্ত হওয়া গেল না। মাঝিরাও একটু ব্যস্ত হইয়া উঠিল। যাত্রীরা সকলেই উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। বিশেষতঃ যুবতী রুগ্না জননীকে লইয়া যেন একান্ত বিপন্না বোধ করিতে লাগিলেন। কয়দিনের পথ-কষ্টে ও শীকরশীতল সমীরণে রোগিণীর কাশি দেখা দিয়াছে। যুবতীর আশঙ্কা,—পাছে জননীর শেষ সাধও অপূর্ণ রহিয়া যায়—কলিকাতায় পৌঁছিবার পূর্ব্বে,

জ্যেষ্ঠা দুহিতাকে দেখিতে পাইবার পূর্ব্বেই পথিমধ্যে তাঁহার নির্ব্বাণোন্মুখ জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হইয়া যায়।

জননীও বড় ব্যস্ত হইয়া উঠিতেছিলেন। কনিষ্ঠা দুহিতা বালবিধবা। সে বিবাহের সাতদিন পরেই বিধবা, তাই অলক্ষ্মী বলিয়া তাহার শাশুড়ী তাহাকে গৃহে লয়েন নাই। জননীর অঙ্ক ব্যতীত তাহার আর আশ্রয় ছিল না। শৈশব হইতে সুখে, দুঃখে, বিপদে, বিষাদে সে যে অঙ্কে ছিল, এখন মৃত্যু তাহাকে সে অঙ্কচ্যুত করিতেছে। কিন্তু তাঁহার অঙ্কচ্যুত হইয়া সেই অসহায়া যুবতীর পক্ষে একাকী পিতৃগৃহে বাস করা সম্ভব হইবে না। তাই তিনি আরও ব্যস্ত হইয়া কলিকাতায় জ্যেষ্ঠা দুহিতার কাছে যাইতেছেন। কনিষ্ঠাকে জ্যেষ্ঠার হাতে দিয়া জীবনের খেয়া পার হইবেন।

পঞ্চম দিন মধ্যাহ্নের পরই একজন মাঝি বলিল, "ঐ যে ষ্টেসনের পাখা!"

সহযাত্রী পুরুষ সাগ্রহে বলিলেন, "কৈ রে?"

সত্যই দূরে জলবিস্তারমধ্যে ডিস্‌টাণ্ট সিগ্‌নালের পক্ষ দেখা যাইতেছিল। তাহা দেখাইয়া মাঝিরা বলিল, "রাম বল, বাঁচা গেল।"

বাহিরে এই কথা শুনিয়া নৌকার মধ্যে জননী কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নলিনী, কি রে?"

নলিনী সহযাত্রী পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুরেশ্বর কাকা, কি?"

প্রেমের জয়।

সুরেশ্বর কাকা যখন বলিলেন যে, তাঁহারা ষ্টেসন হইতে অনতিদূরে, তখন জননীর কোটরগত নয়নদ্বয় আনন্দাশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি শীর্ণ হাত দুইখানি জুড়িয়া উদ্দেশে দেবতাকে প্রণাম করিলেন।

অল্পক্ষণ পরেই নৌকা আসিয়া ষ্টেসনের পার্শ্বে লাগিল। ষ্টেসন একটু উচ্চস্থানে অবস্থিত। চারিদিকে জলের মধ্যে ষ্টেসনঘর জাগিয়া আছে বটে,কিন্তু তাহার দুইপার্শ্বে অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমিতে কর্ম্মচারীদিগের বাসগৃহের প্রাঙ্গণে জল প্রবেশ করিয়াছে। সেই জলপ্লাবিত ভূমিতে ষ্টেসন গৃহ যেন চিত্রে অঙ্কিত বোধ হইতেছে। গৃহপ্রাচীরের বর্ণ ধূসর ; প্লাটফর্ম্মে লোহিত সুরকি ঢালা, আর তাহারই এক পার্শ্বে গোটাকতক পাতা বাহারেগ গাছ, আর গোটা দুই কুসুম-সুষমা-সম্পন্ন রক্তজবাতরু।

সুরেশ্বর যাইয়া টিকিট ঘরে সিন্দুকের উপর বসিলেন। তখন ষ্টেসন-মাষ্টার একখানি অতি মলিন চেয়ারে বসিয়া ধূম-পান করিতেছিলেন। সুরেশ্বরের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। ষ্টেসনে চাকরী অনেক স্থানেই প্রায় বনবাস। মাঠের মধ্যে ষ্টেসনে যাত্রী ব্যতীত আর প্রায় কাহারও গতায়াত থাকে না। তাই যে সকল ভদ্রলোক যাত্রী ষ্টেসন দিয়া গতায়াত করেন, তাঁহাদের সহিত ষ্টেসনের বাবুদের সহজেই ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইয়া যায়। ষ্টেসনের বাবুরা আবশ্যক

হইলে তাঁহাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্যদানেও কুণ্ঠিত হয়েন না। নমস্কার ও প্রতিনমস্কারের পর ষ্টেসন-মাষ্টার সুরেশ্বরকে হুঁকাটি দিলেন। তাঁহার নিকট সুরেশ্বর অবগত হইলেন, স্থানে স্থানে রেলপথের উপর জল উঠিয়াছে।

মধ্যরাত্রিতে ট্রেণ আসিল। মাতা পুত্রী তাহাতে আরোহণ করিলেন। অন্ধকার সমুদ্রে আপনার গর্ব্বে আপনি গম্ভীর ট্রেণ গন্তব্যস্থানাভিমুখে ছুটিয়া চলিল।

প্রথম খণ্ড

বান ডাকিল।

প্রেমের জয়

উপন্যাস

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

প্রণীত।

হেয়ার প্রেস—কলিকাতা।

১৩০৯।

কলিকাতা, ৪৬নং, বেচুচাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, হেয়ার প্রেসে
শ্রীরাধিকাপ্রসাদ দত্ত দ্বারা মুদ্রিত
ও
২০১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরি হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

উপক্রমণিকা

নদী স্থির।